সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ

২য় খণ্ড

সম্পাদনা : দিলীপ মজুমদার

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০০০৭

মুদ্রক
শ্রীরাধাশ্যাম রায় কোঙার
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রেস
৯-এ রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

'কবিদের আপন জন'—
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রকাশকের নিবেদন

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সোমেন চন্দের রচনাবলী প্রকাশের ভরসা পেয়েছিলাম। আজ উক্ত রচনাবলীর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে তাঁরই জন্মদিনে। গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে ধন্য বোধ করছি। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে তাঁর শুভেচ্ছা কার্যকরী হয়েছে; এদেশে সোমেন জনপ্রিয় হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে সোমেন স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সোমেন সাহিত্যপাঠে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। আসলে সোমেন তো একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক নামমাত্র নয়; একটি আন্দোলনের ধারা। প্রগতিশীল মানুষ সোমেনের নাম নতুন করে স্মরণ করে উদ্বুদ্ধ হোন, এই কামনা করি।

৫ই আগষ্ট, ১৯৭৭ — মজহারুল ইসলাম

দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত

পরবর্তী গ্রন্থ

ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন

সম্পাদকের নিবেদন

'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ' ২য় খণ্ড প্রকাশিত হল। যাঁর ছাড়পত্র হাতে নিয়ে সোমেনের প্রায়-লুপ্ত স্মৃতি এ দেশের প্রগতিপরায়ণ জনমানসের সম্মুখে হাজির করা হয়েছিল, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং কবিদের আপনজন সেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কথা আজ বড় বেশী মনে পড়ছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সোমেনের 'ইঁদুর' গল্পের ভিন্নভাষায় অনুবাদ সম্পর্কিত তাঁর কৌতূহলের কথা উল্লেখ করেছিলাম, বর্তমান খণ্ডে আংশিকভাবে তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পেরে সান্ত্বনা পেয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থটিও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

২য় খণ্ডের প্রকাশে যাঁরা উৎসাহিত ও আনন্দিত হতেন, সোমেনের সেই দু'জন বিশিষ্ট বন্ধুও এই সময়সীমার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের একজন হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শ্রীসরলানন্দ সেন এবং অন্যজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও লেখক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ। সরলানন্দ প্রথম খণ্ডের প্রচারে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমালোচনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। নির্মলকুমার ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে 'বালিগঞ্জ,' 'সবুজ বাংলার কথা,' 'অগ্রগতি' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন; এগুলি থেকে সোমেনের 'বন্যা' উপন্যাস এবং অন্য চারটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ নির্মলকুমার ঘোষের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ২য় খণ্ডের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ও সার্থকতামণ্ডিত হতে পারত না।

১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশের মধ্যবর্তীকালে সোমেন সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সোমেন স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠন ও সোমেন স্মৃতিসভার আয়োজন। এ ব্যাপারে যে সব নিষ্ঠাবান্ বন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন: সুদর্শন রায় চৌধুরী, নীতীশ বিশ্বাস, তাপস ঘোষ, তপন মজুমদার, মুস্তফা কামাল, মুঃ সাদিকুজ্জমান, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, রাসবিহারী দাস, রণজিৎ মাইতি, শুভাশিস্ চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর রায়, নকুল দাস প্রভৃতি।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতিও প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। 'সত্যযুগ', 'বাঙলাদেশ,' 'গণশক্তি', 'দর্পণ,' 'কালান্তর,' 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকাও সংবাদাদি প্রকাশ করে এর প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দেশের খ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। সভায় বিশিষ্ট বক্তা ও অতিথিদের মধ্যে ছিলেন: মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, নারায়ণ চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেনের ভ্রাতা কল্যাণ চন্দ প্রমুখেরা। কার্যব্যপদেশে সভায় উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে এবং সভার সাফল্য কামনা করে লিখিত বক্তব্য পাঠান অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, ডঃ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনয় ঘোষ।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সোমেন স্মৃতিসভার পূর্বে প্রকাশক প্রদত্ত ব্যাপক বিজ্ঞাপন ও পত্রপত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনার মাধ্যমে সোমেনের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখা গিয়েছিল। প্রায়-ব্যক্তিগত সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে সোমেন স্মৃতি সমিতির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, প্রগতিপরায়ণ ও প্রগতিশীল ঐতিহ্যের সংরক্ষণপ্রয়াসী সদস্যদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে সোমেন সাহিত্যের প্রচারকে একটি সংহত, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক রূপ দান করেছে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি: এই সমষ্টিগত প্রচেষ্টার পরিসর আরো বর্ধিত হোক।

সোমেন স্মৃতিরক্ষা সমিতি সোমেন সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস, ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। আশা করি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোমেনের নাম সংযুক্ত কারার প্রশ্নটি তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবেন।

'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহে'র বর্তমান খণ্ডে 'বন্যা' উপন্যাস ও ৪টি গল্প সংকলিত হল। শ্রীঅশোক মিত্র ও শ্রীমতী লীলা রায় কর্তৃক অনূদিত সোমেনের ২টি গল্পও ঐতিহাসিক কারণে বর্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্টাংশ আকারে ঈষৎ বর্ধিত হয়েছে: সোমেন ও সমকাল সম্বন্ধে যাঁরা

জানতে উৎসাহী ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশ মিলিয়ে পাঠ করলে তাঁরা একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে পারেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য খণ্ডটি প্রাথমিক পরিকল্পনার অন্তর্গত না থাকায় পরিশিষ্টের তথ্যসন্নিবেশে ক্রমসজ্জাগত কিছু অসংলগ্নতার প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে। এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়। কোন কালে একই সময়ে দুটি খণ্ডের সংস্করণ নিঃশেষিত হলে তবেই এই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব। প্রকাশক বন্ধুও এ বিষয়ে সজাগ ও যত্নবান্।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আমার ভীতি ছিল: বিস্মৃতির গর্ভে প্রায়-নিমজ্জিত একজন জীবনসংগ্রামী জীবনশিল্পীকে মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবেন! আজ আনন্দের সঙ্গে বলি: আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রগতিপরায়ণ মানুষ ক্রমশঃ সোমেনানুরাগী হয়েছেন এবং সোমেনানুরাগী মানুষ সোমেন সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সোমেনের অনুপ্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অব্যাহত থাকুক শিল্পীর সংগ্রাম এবং সৃষ্টি হতে থাক সংগ্রামের শিল্পী।

৫ই আগষ্ট, ১৯৭৭ — দিলীপ মজুমদার

সোমেন চন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঢাকা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯২০ সালে সোমেন চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন। এই সময়ে প্লুরিসি বা ব্রঙ্কাইটিস জাতীয় কঠিন অসুখে তিনি ভুগেছিলেন। সেইজন্য এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁকে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

সোমেন চন্দের বয়স যখন ১৭ বছর তখন তাঁরা ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে বসবাস করতেন। ঢাকা শহরে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের ছোটবড় অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘ ছিল। কিন্তু সোমেন ও তাঁর তখনকার বন্ধুরা এঁদের কর্মসূচীতে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না বলেই এইসব সংঘে যোগদান করেননি। সোমেন ছিলেন সাহিত্যসেবী। ঢাকার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে তাঁর গল্প প্রকাশিত হোতো। শ্রীহট্টের একটি মাসিকপত্রে এবং কলকাতার 'দেশ' প্রভৃতি কোন কোন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাতেও তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সোমেনের সঙ্গে সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ আন্দামান ফেরৎ মার্কসবাদে দীক্ষিত বিপ্লবীদের পরিচয় হয়। সোমেনের জীবনে এঁদের গভীর প্রভাব পড়ে। সোমেনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা এই প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে নূতন পথে মোড় ফেরে। স্পেনের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী ও লেখকদের গৌরবময় আত্মত্যাগের ইতিহাস শ্রবণ করার পর সোমেনও দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জনগণের আশা ও উদ্যমহীন জীবনের কাহিনী অবলম্বন করে জীবন্ত গণসাহিত্য রচনা করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

দক্ষিণ মৈশুণ্ডির জোড়পুল লেনে ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে মার্কসবাদীদের একটি অফিস ছিল। এখানে প্রায় প্রতিদিনই শ্রমিকদের বৈঠক এবং আলোচনা সভা হোতো। এই আলোচনা সভায় একটি বেঁটে-খাটো চেহারা, গোলগাল মুখ ও লাজুক ও সরল প্রকৃতির কিশোরকে প্রায়শঃই তন্ময় হয়ে আলোচনা শুনতে দেখা যেতো। বলা বাহুল্য এই কিশোরটির

নামই সোমেন চন্দ। আগ্রহ ও নিষ্ঠার ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি মার্কসবাদী নেতা ও কর্মীদের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠেন। এখন থেকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির সংগে সংগে মানবমুক্তির জন্য সামাজিক বিপ্লবের একজন কর্মীর ভূমিকাও গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন দক্ষিণ মৈশুণ্ডি পাঠাগারে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। নিরহংকারী এই কিশোরের উৎসাহ এবং কর্মদক্ষতা দর্শন করে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতারা তাঁকে দক্ষিণ মৈশুণ্ডি প্রগতি পাঠাগার পরিচালনার ভার দেন। পাঠাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সোমেন যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন তা তাঁর সুহৃদদের মুখে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রগতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরেই সোমেন ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি তখন নবাগত, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাংগঠনিকগুণ, মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা, অমায়িক ব্যবহার এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে বোধ হয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এই সময় সোমেন পার্টির নেতাদের কাছে ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে সাংগঠনিক কাজের মারফৎ শ্রমিকের জীবনের সংগে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নেতারা সঠিকভাবেই তাঁকে পার্টির স্বার্থে লেখক সংঘে রাখা অপরিহার্য মনে করেছিলেন। পার্টির নেতাদের নিকট সোমেনের এই আবেদনের মর্ম থেকে একথা অনুধাবন করা যায় যে, লেখক হিসেবে তিনি গজদন্তমিনারবাসী হয়ে থাকতে চাননি। বাস্তবিক তাই। ঢাকা শহরের আশেপাশে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ একঘেঁয়ে জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করতেন। মজুর কৃষকের লাঞ্ছিত অনাদৃত জীবন থেকে তিনি গণসাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে সাহিত্যকে শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হতে হবে।

১৯৪০-৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে এল প্রচণ্ড সরকারী আঘাত। অনেক কমিউনিস্ট জেলে গেলেন, অনেকে গোপনে কাজ করার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সোমেন তখন বৈপ্লবিক কাজে আরও তৎপর হয়ে উঠলেন। সাহিত্য চর্চার বড় একটা অবসর থাকলো না। শক্তিশালী রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে তখন কাজ করা লোকের অভাব ঘটে। রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজের পরিধিও তখন বেশ বিস্তৃত ছিল—নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরঘাট, জগন্নাথ ঘাট থেকে ভৈরব স্টেশন পর্যন্ত। দিনরাত সোমেন পড়ে থাকেন শ্রমিকদের ভেতর, বুঝতে চেষ্টা করেন তাদের সমস্যা, ইউনিয়নের

কর্মপদ্ধতিকে আয়ত্ত করার জন্য নিয়োগ করেন সবশক্তি। দুমাস কাজ করার পর অসংখ্য বিচিত্র শ্রমিকের নিকট তিনি অত্যন্ত আপনার লোক হয়ে দাঁড়ান। ১৯৪১ সালে তিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন সর্বসম্মতিক্রমে। এত অল্পবয়সী যুবকের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এই নিষ্ঠা ও কর্মোৎসাহের গুণে সোমেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদও লাভ করেন।

এ সময়টাতে তিনি লেখার দিকে জোর না দিয়ে তাঁর তত্ত্বগত বুনিয়াদ গড়ে তোলা এবং জনজীবনের নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ওপরেই বেশী জোর দেন। অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাথে রাত জেগে অথবা যে কোন অবকাশ সময়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং শ্রমিক পরিবারগুলি ও তাঁদের দৈনন্দিন জীবন এবং আশা আকাংখার সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েতভূমি আক্রান্ত হলে সোমেনের কাজের পরিধিও বেড়ে যায়। এ সময়ে বিশেষ প্রয়োজন ছিল প্রচারের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা এবং যুদ্ধের তাৎপর্য জনগণকে বোঝানো। এজন্য প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মার্কসবাদীরা সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সোমেন রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজে কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও এই বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য উপরিউক্ত দুই সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যদিও এসময় তিনি সাধারণতঃ কোন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বিশেষ প্রকাশ করতেন না, তবু তাঁর কলম একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। প্রকৃত গণসাহিত্য সৃষ্টির কাজে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন রচনাগুলির মধ্যে তিনি তা পরীক্ষা করে দেখতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সোমেনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। তাছাড়া তিনি রুগ্ন-স্বাস্থ্য ছিলেন। তাই তাঁর স্নেহশীল পিতা কিছুতেই তাঁকে চাকরি করতে মত দিতেন না। কিন্তু সোমেন তাঁর বাবার কষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষের দিকে বন্ধু সরলানন্দ সেনকে তিনি বলেছিলেন, 'একটা কাজ ঠিক করে দিন, নয়তো Morale ভেঙে যাবে।' সাময়িকভাবে সোমেন কোথাও কোন কাজে ঢুকেছিলেন কিনা তা অবশ্য এখনও জানা যায় না।

প্রগতি লেখক সংঘ থেকে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে ক্রান্তি নামে একটি সংকলনগ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয়। ক্রান্তি প্রকাশের জন্য সোমেনের

উদ্যোগ ছিল প্রধান এবং এই সংকলনগ্রন্থে তাঁর অভিনব আঙ্গিকে লেখা 'বনস্পতি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সমসাময়িককালে ঢাকায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রাজপথ দিনে-দুপুরে জনশূন্য, মানুষের গা ঘেঁষে চলতে মানুষ ভয় পায়, কিন্তু সোমেনের ছুটি নেই। বিপদসংকুল অঞ্চলেও সোমেন চলেছেন দেশের কাজ করতে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনতে। এই পটভূমিকায় সোমেনের লেখা একটি অসাধারণ গল্পের নাম 'দাঙ্গা'। এর অল্প কিছু পরেই রচিত হয় তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ইঁদুর'।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে মার্কসবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ মার্কসবাদীরা ঢাকাতে ফ্যাসি-বিরোধী কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সূত্রাপুরে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে। কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জি এবং স্নেহাংশু আচার্য সম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসেন। কিন্তু এই সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য জাতীয়তাবাদীরা অস্ত্র-শস্ত্রসহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে, বেলা আড়াইটার সময় রক্তপতাকা হাতে সোমেন চন্দ রেলশ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলনে যোগদানের জন্য রেলওয়ে কলোনী থেকে রওনা হন। প্রায় তিনটার সময় ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রাটি লক্ষ্মীবাজার হৃষীকেশ দাস রোডের মোড়ে এসে পৌঁছায়। তখন ছোরা, ভোজালি, লোহার ডাণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে জাতীয়তাবাদীদের একাংশ শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করে। শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তখন তারা বেছে নেয় সোমেনকে। ভোজালি নিয়ে পর পর আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়, চোখ দুটি উপড়ে ফেলে, জিভ টেনে বের করে এবং কেটে ফেলে, পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয় এবং অট্টহাস্য করে পশুর মতো তারা তাঁর ছিন্ন-ভিন্ন দেহের উপর নাচতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ সোমেন শ্লোগানের পর শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে রক্তপতাকা কেড়ে নেওয়া শত্রুদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এভাবেই সোমেন চন্দ শহীদের মৃত্যুবরণ করেন নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাঁর রক্ত মিশে যায় দুনিয়াব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে। ঢাকায় সংগ্রামী প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যান তিনি একটি মহান আত্মার বিনিময়ে।

সূচীপত্র

উপন্যাস

॥ এক ॥

সন্ধ্যার আগে তালবনের নীচে বর্ষার জল দেখিয়া রাতে মালতী নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছিল : গাছ আর ঝোপের ছোট-বড়ো ছায়া জলে কাঁপিতেছে।

খুব ভোরে, তখনো পশ্চিমের আকাশে খানিকটা অন্ধকার, মালতীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাশেই ধনুকের মতো বাঁকিয়া দয়াময়ী ভোরের বাতাসে বেঘোরে ঘুমাইতেছে। মালতীর কাপড়ের আঁচলটা তাহার হাতের নীচে আটকাইয়া ছিল, আস্তে আস্তে সেটা খসাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর বাহিরে আসিয়া একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া সম্মুখের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল।

আশ্চর্য, একটি রাতেই আষাঢ়ের জলের পরাক্রমের আর অন্ত নাই; তালবন, ঝোপঝাড় ছড়াইয়া উঠানের নীচে সমস্ত মাঠটিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে!

মালতীর দুটি গভীর কালো চোখ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বাঁ হাতে শাড়িটা ধরিয়া হাঁটু অবধি উঠাইয়া জল মাড়াইতে লাগিল। সমস্ত মাঠ জলে ভরিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও হাঁটুর নীচে পা'র অর্ধেকের বেশী ভিজে না। মাটিতে নতুন জল লাগার গন্ধ, পায়ের নীচে মাঠের নরম তৃণশয্যা কেমন ভাল লাগে! মালতী স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চারদিকে চাহিয়া চাহিয়া নিরলস গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—সঙ্গে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ, অগভীর জলে পাতলা ঢেউ।

কিন্তু একসময় সূর্য উঠিয়া গেল, তির্যক রৌদ্রে জল-স্থল রঙিন হইয়া উঠিল। এখন লোকের যাতায়াত বাড়িবে, তাহারা দেখিবে বাঁ'হাতে কাপড় হাঁটুতে উঠাইয়া রায়দের মেয়ে মালতী একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অবজ্ঞায় একবার ভাবী পথচারীদের পানে চাহিয়া সে উঠিয়া আসিল। নারায়ণ তখনও ঘুমাইতেছিল, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলিল, কাল সন্ধ্যেয় তোকে বলেছি না, দেখিস ভোরেই আমাদের বাড়ীর সুমুখের মাঠ সমুদ্দুর হবে—যা এখন দেখে আয়, সত্যি কি মিথ্যে।

নারায়ণ একলাফে উঠিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

এই ঘরের পেছনে বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল বৃদ্ধা দয়াময়ী। গলা অনুমান করিয়া ডাকিল, লতি?

মালতী কাছে গিয়া চেঁচাইয়া বলিল, কী গো?

দয়াময়ী মনে মনে হয়তো এই ধারণা পোষণ করে, আশে পাশে যে যা বলে সবই শুনিবার ইচ্ছা এবং অধিকার তাহার ন্যায্য, যদিও যে কোনও কথা প্রথমে খুব জোরে না বলিলে সাধারণত তাহার মগজে গিয়া পৌঁছায় না। যে মানুষটি তাহার কথা শুনিতেছে সেও যেন তাহারই মতো কানে খাটো; তাই দয়াময়ীও খুব জোরে বলিল, কী হয়েছে রে?

অন্য সময় হইলে হয়তো মালতী এক ঝামটা দিয়া চলিয়াই যাইত, কিন্তু এবার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, আপনার সেই জলদেবতা দেখা দিয়েছে গো!

দয়াময়ী অহংকারে হাসিয়া বলিল, তার কি আর বাকি আছে! হ্যাঁরে, আজ ভোরের আলোয় কেমন দেখ্‌লি?

তাহার পাশে বসিয়া মালতী বলিল, সব সোনা গো সোনা! মাথার মুকুট চুল পোষাক গায়ের রঙ্‌ সোনায় ঝলমল করে আর এই মাত্র জল থেকে উঠলো কিনা, গা থেকে জল বেয়ে পড়ছে!

—আর?

মালতী পূবের আকাশে নতুন সূর্যের কথা কল্পনা করিয়া বলিল, আর হাস্‌লো।

—এই? আর কি আছে বল?

—আবার কী থাকবে গো!

—বন্যা হলে তোর মনে খুব সুখ হয়, না? দয়াময়ী চেঁচাইয়া উঠিল, হারামজাদী, তুই খুব সুখ পাস না?

এক মুহূর্তে তাহার পাশ হইতে সরিয়া মালতী বলিল, বুড়ী! এই জন্যেই তো কিছু বলিনে। কানের কাছে গিয়ে অত কষ্ট করে চেঁচিয়ে বলো, তার ওপর রাগ! শুনতে চেয়েছিলে কেন শুনি?

কিন্তু কানে খাটো দয়াময়ী এসব শুনলে তো! সে তখন নিজের মনে একই সুরে বলিতেছিল: অত বড়ো ধিঙ্গী মেয়ে, এখনও জল দেখে সুখ! আরে বাপু, এই জল যখন উঠবে ঘরে, তখন কি খেয়ে বাঁচবি, কি পরবি, কিসে শুবি? আরে হারামজাদী, এ যে বন্যা, এর নাম বন্যা! আমার

এই চার কুড়ি-পাঁচ বছর বয়সে একবার মাত্তর দেখেছি। লোকে মরে ভেসে ভেসে যায়, গরু মোষ বোবা-পরাণরা ডাক ছেড়ে কেঁদে কেঁদে মরে, সাপ এসে কামড়ায়,—আর তোর মনে সুখ? এমনি দু'বেলা ভাত জোটে না ভালো করে, পেটের ক্ষিদেয় হাহা করিস, তবু জল দেখে সুখ! বয়েস তো আর কম নয়, আমাদের সময় ও বয়সে আমরা ছেলের মা!

দয়াময়ী একবার আরম্ভ করিলে কখন থামে তা কেউ বলিতে পারে না।

গোলমাল শুনিয়া লীলাবতী আসিল। বলিল, কী হয়েছে, মা?

—ভাত হয়ে এসেছে? তা' হলে তরকারি কুটে দিই, দাও।

কোন্ জিজ্ঞাসায় কী বলে! মালতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। লীলাবতীও হাসি চাপিতে পারিল না। ইহাতে দয়াময়ীর আবার রাগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

—আহা, কথায় কথায় হাসি! বৌ তুমি কি করে অমনি হাসছো?

লীলাবতী বলিল, হাসবো না? একটা বলতে আর একটা বুঝবেন, এতে হাসি পায় না কার?

কিন্তু এবার কানাকে কানা বলিলে অস্বীকার করিবার পালা, দয়াময়ী উঁচু গলায় বলিল, তোমাদের ওসব নানা ডালের কথা বুঝতে পারিনে বৌ। আমি বলছিলাম, বন্যা হলে খাবি কী মেয়ে—তাতেই যেন তেড়ে মারতে এলো—

—তেড়ে মারতে এলো! মালতী রাগিয়া বলিল, মিথ্যুক বুড়ী। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু মিথ্যে কথা বলতে এতটুকু বাধে না!

দয়াময়ী উৎকর্ণ হইয়া লক্ষ্য করিল মেয়েটা কী বলিতেছে। কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েকে ধমক্ দিয়া লীলাবতী বলিল, চুপ্ কর। এখনও যেন ছোটটি রয়েছিস্!

—কেন, আমায় যাতা বলে কেন? আমি কী দোষ করেছি? সব কথা শোনা চাই, আবার ঝগড়াও করতে হবে! মালতী আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। নারায়ণ ইতিমধ্যে মাঠ হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। সে হাসিমুখে বলিল, দিদি, কতো মাছ দেখেছো? এর মধ্যে আবার খুব বিষ্টি হলে বোয়ালও আসবে দেখো।

—যা যা, পড়াশোনা নেই, ভোর হতেই কেবল টো টো করে ঘুরে

বেড়ানো, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বোস্ শিগ্‌গির!—মালতী এক মুহূর্তে একটা মুরুব্বির মতো হইয়া উঠিল।

হঠাৎ এমন কথা শুনিয়া নারায়ণ ভড়কাইয়া যায়। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বই-এর খোঁজে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরে।

মালতী কল্পনা করিয়াছে: তাহাদের বাড়ীর ঠিক নীচে টল্‌মল্ করে বর্ষার জল, সেখানে দীর্ঘ ঘাসের ডগা বাতাসে কাঁপে, আর নিজে সে যেন দাওয়ার ঠিক শেষে বসিয়া পা দুটিকে সেই জলে অল্প একটু ডুবাইয়া আস্তে আস্তে সুন্দর নাড়াচাড়া করে,—আর অজানা দেশ হইতে ভাসিয়া আসে যে লাল ফুল, স্পর্শ করে পায়ে।

কিন্তু অজানার অন্ধকার হইতে লালফুল না আসুক, জল ঠিক নীচেই আসিল। এখন মাটির সাথে দেখা হইবার উপায় নাই, আর ঈশ্বরকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। এই বাড়ীর দুইটি গরু এখন দিবা রাত্রির জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া ঝিমাইবে, মানুষেরা শ্রান্ত পৌরুষে এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইবে।

পৃথিবীর উপর বিষাক্ত বাতাস হাহাকার করিতে থাকে।

ঠিকই পা ডুবাইয়া মালতী দেখিল: ভিতরের স্নায়ুগুলি চকিত হইয়া উঠে—বেশ ভালো লাগে। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া আসে।

কিন্তু ওদিকে দয়াময়ী যদি শঙ্কিত হইয়া ওঠে, তা হইলেও বলিবারই বা কী আছে? কারণ, সেতো জানে, তাহার এই চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়েসের জীবনে দারুণ অভিজ্ঞতার হিসাব হাতে অথবা মুখে মুখে রাখা কঠিন এবং মানুষের কাছে বলিয়া বেড়ানোও এক দুষ্কর ব্যাপার; তবে অতিরিক্ত আত্ম-প্রয়োজনবোধে এমনি বাহির হইয়া যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

দয়াময়ীর শঙ্কার আর অন্ত নাই।

আর একদিন ভোর বেলা। তখন অনুমান আটটা বাজিয়া গিয়াছে, দয়াময়ী আশ্চর্য হইয়া গেল, এখন পর্যন্ত কারুর দেখা মেলে না, এ বাড়ীর লোকগুলির হইয়াছে কি? সেই রাত্রি থাকিতেই তো সে বসিয়া আছে, যেমন রোজই থাকে, কিন্তু আজ মানুষ কই?

দয়াময়ী এবার ছেলের ঘরের কাছে গিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিল: পিয়ো, ও পিয়ো?

কেবল ঘুমাইলেই অনেক সময় আটটা বাজে না, ইহা যে জানে—তাই তো শঙ্কা। কিন্তু আসলে প্রিয়নাথ যে ঘুমাইয়াও নয়, শুইয়াও নয়, এই খবর কে রাখে? দেয়ালে ঠেস দিয়া সে মেজেয় বসিয়াছিল। উত্তর দিল, কেন?

—এখনও ঘুমুচ্ছিস নাকিরে তুই?

প্রিয়নাথ হয়তো একটু ভাবে কি বলিবে।

—শরীরটা কি খারাপ করেছে?

এবার চুপ করিয়া থাকা চলে না। প্রিয়নাথ বলিল, না।

দয়াময়ীর বধিরতা এখন কাজে লাগে। ব্যস্ত হইয়া বলিল, তবে শুয়ে থাক বাপু, আমি উঠতে মানা করি।—কিন্তু আসল ব্যাপারটি প্রিয়নাথ ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছে।

লীলাবতী তখন ছেলে কোলে লইয়া বলিতেছিল: ঘরে একটি দানা নেই যে শুধু কতকগুলো ভাতও সেদ্ধ করে দিতে পারি, কি করি বলো?

এখানে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই, প্রিয়নাথ বাহিরের দিকে চাহিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। লীলাবতী বলিল, আমাদের বড়োদের জন্য কোন চিন্তা ছিল না, কষ্ট হয় ছেলেপিলেদের দিকে চেয়ে। কথার উত্তরে কথা বলিতে হয়, তাই প্রিয়নাথ বলিল, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।

—আমি মেয়ে মানুষ, কি আর করতে পারি বলো?

ঘর হইতে বাহিরের জল চোখে পড়ে, প্রিয়নাথ সেদিকেই চাহিয়া রহিল। রৌদ্র ক্রমেই বাড়িতেছে।

—সহ্যের একটা সীমা আছে, সে তো আজকার কথা নয়, কোন দিন স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পেলাম না, কেবল অভাব আর অভাব। এমনভাবে মানুষ কী ক'রে বাঁচে? আর এখন তো না খেয়ে থাকবার মতো অবস্থা! এর চেয়ে আর বড়ো কষ্ট মানুষের হতে পারে না, আমাদেরও কোনকালে হয়নি। ঈশ্বরকে কি আর জানাবো? সেখানে অনেক মিনতি জানিয়েছি, অনেক বছর ধরে—এ সংসারে আসা অবধি।—লীলবতীর চোখ সজল হইয়া উঠিল।

—কেবল কষ্ট আর কষ্ট। প্রিয়নাথ হঠাৎ রাগিয়া গেল, এর চেয়ে বেশী কষ্ট মানুষের নেই? আমরা তবু যাহোক কিছু খেয়ে আছি, তিন দিন উপোস করে আছে এমন কেউ নেই? আমি কি করবো বলো? এখন অনেক জল, সেখানে ডুবে মরা ছাড়া আর উপায় আছে কিছু?

—ওসব কি বলছো তুমি? লীলাবতী ভীতস্বরে বলিল, আমি তাই বলছি নাকি? তোমার মনে অনেক কষ্ট জানি, কিন্তু আমিও বড়ো সুখে আছি, কেমন?

সে কাঁদিয়া ফেলিল।

হাত জোড় করিয়া প্রিয়নাথ বলে, দোহাই তোমার, একটু চুপ করো, এর ওপর আবার কান্না নয়।

কোনরকমে কান্না থামাইয়া লীলাবতী মুখ নীচু করিয়া রহিল।

সম্মুখের বিস্তৃত জলখণ্ড হইতে জলো বাতাস আসিয়া হা হা করিয়া বহিতে লাগিল।

সে-ঘর হইতে আসিয়া প্রিয়নাথ চেঁচাইয়া উঠিল: মা, ওমা?

—কি রে?

তাহার পাশে বসিয়া প্রিয়নাথ বলিল, আমি এখন কী করি বলো? তোমার বৌ তো কাঁদছে, কেবলি কাঁদছে, কতো বললাম তবু কাঁদছে, তুমি ওকে থামাতে পারবে? আমি এসব সইতে পারিনে, মানুষের কান্না দেখলে আমার রাগ হয়; কিছুতেই স্থির হয়ে দেখতে পারিনে!—চারদিকে জল, নইলে বাইরে চলে যেতাম।

—বৌমা কাঁদছে কেন?

—কে জানে! প্রিয়নাথ বলিল, এখন আমি কী করবো তুমি বলে দাও! তুমি আমার মা, এক তোমার ছাড়া আর কার কথা শুনবো আমি?

গোলমাল শুনিয়া মালতী-নারায়ণরা সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তাহাদের বাবার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ ভয়ানক লজ্জা পাইল। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া সেই জল দিয়াই ছপ ছপ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরমা, বাবা এমন করলে কেন? কি হয়েছে?

আসল ব্যাপার বুঝিতে দয়াময়ীর সময়ই বা কোথায়, কানই বা কোথায়? প্রিয়নাথ বিবাহ করিবার পর, তাহার মতে, অনেক দূরে সরিয়া গেছে, তাই তাহার উপর দয়াময়ীর যথেষ্ট সন্দেহ এবং বিরাগ; কিন্তু অকস্মাৎ আজ সেই ছেলেই এত সান্নিধ্যে আসিয়া যা সব বলিয়া গেল তার অনেক

কিছু না বুঝিয়াই তাহার এখন কী ভালোই লাগিতেছে। প্রিয়নাথ তাহার দুই হাত ধরিয়া পরামর্শ চাহিয়াছে। আরে হতভাগা, ব্যাপারটা ভালো করিয়া খুলিয়াই বল্ না ; তবে তো সে পরামর্শ দিবে।

ঠিক এখন একটু হাসিয়া ওঠাও দয়াময়ীর বিচিত্র নয়, সত্যি সে একটু হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমনি এসেছিলো, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে।

মালতী যে না বুঝিয়াছে তাও নয়, এইটুকু বুঝিবার মতো বয়সে তাহার হইয়াছে ; তাই সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর সকলে চলিয়া গেছে।

দয়াময়ী বলিল, বোস্।

মালতী তবু দাঁড়াইয়া আছে ;

—বোস না আমার পাশে ?—সেই একই কথা মনে করিয়া দয়াময়ী আজ খুশী। মালতী বসিল।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—জলের ধারে।

আশ্চর্য, দয়াময়ী আজ এতটুকু রাগিল না। বলিল, সোনার ডিঙে ভেসে উঠলো ?

—হাঁ।

—ডিঙেয় কে ?

—রাজপুত্তুর।

—কেমন পোশাক।

—সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে সোনা—পাড়ের কাপড় পরে সোনার বরণ রাজপুত্তুর দেখা দিলো। মুখে মাণিক-ঝরা হাসি, চোখে অনেক আলো।—সূর্যোদয়ের ভোরের আকাশখানা মালতীর এখনও মনে পড়িতেছে !

দয়াময়ী বলিল, অনেক বেলা হয়েছে এখন, রাজপুত্তুর রোদ্দুর সইতে পারে না, গায়ে ফোস্কা পড়ে, সে আবার ডুব দিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু,—সে একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু তুই খেয়েছিস, লতি ?

মালতী কী বলিবে !

—খাসনি তাহলে ?

না।

বিস্ময়ে দয়াময়ীর চোখ বড়ো হইল। কাণ্ড দেখেছো ! তুই কি অতটুকু মেয়ে যে ধরে না দিলে খাবিনে ? নিজের হাতে নিয়ে খেতে পারিসনে ?

দুপুরের খাওয়া সেই কখন হবে, এখনও না খেয়ে রয়েছিস ? যা, যা, শিগগির— দাঁড়া, তোর মাকেই বলি। বৌ, ও বৌ, তুমি কোথায় গো ?

লীলাবতী যে তখনও সেই ঘরে পাথরের মতো বসিয়া আছে, সেই খবর দয়াময়ী রাখিলে তো ! তাই সে ক্রমাগত চেঁচাইতে লাগিল,—বৌ, ও বৌ, ছেলেপিলেগুলো যে এখনও না খেয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে খেয়াল তোমার আছে ? দেখেছি, তোমার নজরটা বরাবরই একটু উড়ু উড়ু, লক্ষ্য করো কম, বৌ, ও বৌ—

দয়াময়ী ডাকিতেই লাগিল। তাহার এই চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় সে জানে, নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি না দেওয়া একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের পক্ষে খুবই লজ্জার ব্যাপার।

তাহার মুখ আর থামে না।—কতো বেলা হলো, তুমি এখনও ওদের খেতে দিচ্ছো না কেন গো বৌ ?

মালতী কখন সরিয়া গেছে।

॥ দুই ॥

গ্রামে বন্যাত্রাণ সমিতি আসিয়াছে। কিন্তু সেটা আস্তানা গাড়িয়াছে কিছুদূরে, টানের দিকে একটা উঁচু জমির উপরে। সেখানে পড়িয়াছে কয়েকটি তাঁবু, শহরাগত স্বেচ্ছাসেবকরা থাকে। কিন্তু যে রকম জল বাড়িতেছে, ইহাতে মনে হয়, আর কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে থাকা দায় হইয়া উঠিবে, সাপের ভয়ে অন্ততঃ অন্য আশ্রয় খুঁজিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে আছে কিছু চাল, ওষুধপত্র, একটি ডাক্তার, আর আছে কয়েকটি টাকা, সাহায্য প্রেরণে সুবিধা এবং গ্রামান্তরে চলা-ফেরার জন্য।

ইহাতেই বন্যাপীড়িত দরিদ্র গ্রামবাসীর জিহ্বায় জল ! সাহায্য প্রার্থীদের মধ্যে অসম্ভব ভীড়।

যেসব গাছ, লতাপাতা জল পাইলে মরে, সেগুলি মরিয়াছে। এখন মরিতে শুরু করিয়াছে পশুশ্রেণী ; মানুষেরা ক্ষুধায় অর্ধমৃত।

জলের আয়নায় সূর্যের ছায়া প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া পড়ে, দীর্ঘ সারি সারি তালগাছের ডগায় বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ করে, আকাশে কোন পাখীর

আর্তনাদ শোনা যায়, রাতের আকাশ আর কথা বলে না, গাছপালা সব নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মাঝে মাঝে কেবল নৌকা চলার এবং অল্প জলে পা ফেলার ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ।

পরের দিন প্রিয়নাথ সেখানে গেল—সেই ত্রাণ সমিতির আস্তানার কাছে। একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময় একটি ছেলেকে ওদিক দিয়া হাঁটিতে দেখা গেল—তাহার বয়স কুড়ি-একুশ হইবে। চারিদিকে একবার চাহিয়া হাত নাড়িয়া প্রিয়নাথ ডাকিল, দেখুন—

ছেলেটি কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ, আপনি কি এখানকার?

—হ্যাঁ।

প্রিয়নাথ এবার মুখ নীচু করিয়া মাটিতে আঙুল আঁচড়াইতে লাগিল। কিছু বলিতেই সে আসিয়াছে এখানে। অদূরে রৌদ্রালোকিত জলের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, কি বলিতে সে আসিয়াছে? সবই যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে হয়তো সে কিছু বলিয়াছে, যা সে এখন নিজেও স্মরণ করিতে পারে না, অথবা যা সে তখনও ভাবিতে পারে নাই। নিশ্চয় সে কিছু বলিয়াছে।

ছেলেটি বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইল, দেখিল, মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাঁড়ি, জামা-কাপড় ছেঁড়া ও ময়লা, আর দুটি চোখ করুণতায় জল্‌ জল্‌ করিতেছে।

প্রিয়নাথ আর জোর করে নাই। একটি বিস্ময়ের প্রান্তরে সে হারাইয়াছে পথ, সেখানে সবই নতুন, সবই যেন কোন অদৃশ্য লোক হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া তাহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এ প্রান্তরের ঠিকানা আগে ছিল না জানা, অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া পথবর্তী হইয়া পড়িল যেন। এবং এই দুঃখের সময়ে হঠাৎ এই সৌভাগ্যে যদি প্রিয়নাথ আনন্দে চোখের জল ফেলে, তাহা হইলে সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয় নিশ্চয়ই।

সে বাড়ী ফিরিয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। আসার পথটুকু চুপ থাকিয়া এখন তাহার মুখ খুলিতে চৈতন্য হইয়াছে।—ওমা লতি, নারু, ও মা, তোমরা কোথায় গো? তোমরা কোথায় গেলে!

দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল ছেলেমেয়েরা। দয়াময়ী শুনিতে পায় নাই।

আর একজন কাকে যেন খুঁজিতেছিল প্রিয়নাথের চোখ, কিন্তু পায় নাই। সে সবগুলি ঘর খুঁজিয়া শেষে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল: উনানের কাছে উপুড় হইয়া লীলাবতী প্রাণপণে ফুঁ দিতেছে। চারিদিকে প্রচুর ধোঁয়া।

—কই গো?

লীলাবতী মুখ উঠাইল—সারামুখ ফুঁ দেওয়ার উত্তেজনায় লাল, ঘামে ভিজা, চোখ দুটি জলে ভরা, কয়েকটি চুল অবিন্যস্তভাবে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

—শিগ্‌গির এসো, দেখে যাও মজা!

—কি হয়েছে বলো?—লীলাবতী উঠিল না; সে জানে, দেখিবার মতো এমন কিছু তাহাদের নাই যাতে উৎসাহের পাত্রটি এক মুহূর্তে ভরিয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু প্রিয়নাথের দাঁড়াইবার সময় নাই। সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি ওকে চিনতে পারবে না, কিন্তু পরিচয় করতে হবে তো! চলো। অন্য চিন্তা তোমাকে পেয়ে আছে জানি, কিন্তু বলি শোনো, সে সব আপাততঃ মিটেছে, বিশ্বাস করো। এসো—

লীলাবতী তখন উঠিল।

ওদিকে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে মালতী। এমন দৃশ্যের সাথে পরিচয় তার এই প্রথম, সোনার বরণ জলদেবতা আজ সত্যি দিয়াছে দেখা—জলের বুকে তাহার ছায়া কাঁপে। ইস্, আজ বাতাস কি দুরন্ত! জলদেবতার স্বর্ণাভ চুল কেমন সুন্দর উড়িতেছে, তাহার পাতলা উত্তরীয় বাতাসের সাথে কেমন নড়ে! কিন্তু মালতীর দুই চোখের পাতা আজ পাথরের মতো স্পন্দন-হীন, স্থির চাহিয়া আছে।

লীলাবতী আসিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু আজ তাহারও কি যে হইয়াছে, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নৌকার মুখ ঘুরাইয়া রজত বলিল, চলি।

খুঁটি ধরিয়া প্রিয়নাথ দাঁড়াইয়াছিল। লীলাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, বা-রে, চলে যাচ্ছে যে!

লীলাবতী ভাবে, ও কে! আর মালতীও কি মূক? তাহার কথার ভাণ্ডারও কি শূন্য? হয়তো এক সময় খুঁজিয়া পাইবে কথা, পাইলও, কিন্তু তখন রজতকুমার অদৃশ্য হইয়া গেছে।

লীলাবতী তখন দূরের দিকে চাহিয়াছিল। প্রিয়নাথ এতক্ষণে বলিতে-ছিল: আমরা কেউ ওকে চিনিনে, অথচ ছাখো, ভগবান এই দুঃসময়ে……

মনে মনে মালতী বলিল, তোমরা কেউ না জানো, আমিতো জানি! আমি জানি তাহাকে, অনেক দিনেরই চেনা যে সে!

সকলে চলিয়া গেলে, সেখানেই বসিয়া সে জলে পা ডুবাইয়া দিল।

প্রিয়নাথ আবার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে যেন। একদিন আগেও জানিত না, জানিলেও বিশেষ সন্দেহ ছিল, যে-প্রাণ হারাইয়া গেছে, তা কখনও ফিরিয়া পাইবে কিনা। ভোরের পৃথিবীতে এত আলো সে যেন আবার নতুন করিয়া দেখিল। বন্যার জল রৌদ্রে রঙিন হইয়া উঠিয়া ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে লাগিল।

লীলাবতী স্বামীকে বলিল, তুমি আর তাকে আনলে না?

প্রিয়নাথ রজতের কথাই ভাবিতেছিল। তবু বলিল, কি হবে এনে?

লীলাবতী আশ্চর্য হইয়া গেল—কি যে বলো!

প্রিয়নাথ হাসিয়া বলিল, এরা তো আসে না!

—মানে?

এরা দেখা দেয় কম, এরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, শুধু একজনের সাথেই দাঁড়িয়ে আলাপ করবার সময় এদের নেই, বাঁধবো কোন্‌ সাহসে। আমিই তো শুধু নই, এমন লোক আরও আছে অগুন্তি, আমরা কি তার খবর রাখি? কিন্তু সে রাখে খবর। সময় পাবে কেমন করে এতগুলো লোকের খবর রেখে?

লীলাবতী আর কিছু বলিতে পারে না। এদিকে মালতীও হয়তো তাই ভাবিতেছিল। কিছু দূরে জলে ভরা উঠানে ছিল এক সজনে গাছ, সেটা মরিয়া গেছে। এখন বাঁচিয়া থাকিলে ঝরা ফুল ভাসিত জলে। কিন্তু নাই, সেই গন্ধমাদির বাতাসও আর নাই, ফুলের গাছে নামিয়াছে মৃত্যুর শুষ্কতা।

আকাশের দক্ষিণে কোথায় মেঘ? কখন আসিবে ঝড়? মালতী যেন ভরাচোখে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

দয়াময়ী বিরক্ত হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নাই, একটা রক্ত-মাংসের মানুষ নাকি এত চুপ করিয়া থাকিতে পারে ?

—মালতী !

—কেন ডাক্‌ছো ঠাকুর মা ?

সে যে এত কাছেই দাঁড়াইয়া আছে, ইহা দয়াময়ী জানে না। এত সহজে সাড়া পাইয়া তাই খুসী হইয়া উঠিল। বলিল, পাশে এসে বোস্।

মালতী কাছে ঘেসিয়া বসিল।

—ছেলেটির নাম কি রে ?

—রজত কুমার !

—কি জাতরে ?

মালতী ঝামটা দিয়া উঠিল—তা কে জান্‌তে গেছে বুড়ী ?

—আহা, রাগ করিস্ কেন ? এসব তো সকলেই জিজ্ঞেস করে।

—তা বলে কোন্ জাত, তার বাবা দাদা চৌদ্দপুরুষের খবর ? লোকে যে বলে বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরে, তোমার হয়েছে তাই। সারাদিন বসে বসে কেবল এই ভাবো।

মালতীর সম্বোধনের কোন ঠিক নাই, কখনও 'আপনি', কখনও 'তুমি'।

দয়াময়ী এবার রাগ করিয়া বলিল, এই যে হাতজোড় করে বলছি, আমার ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে, তবু তুমি আমায় ছেড়ে দাও মেয়ে ! বাপ্‌রে বাপ, এ যেন কথা বলতেই ঝকমারি !

মালতী সেখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেই ডাকিল, ঠাকুরমা !

কিন্তু ঠাকুরমার এখন ক্রোধ প্রকাশের সুযোগ। সে চুপ করিয়া রহিল।

—ও ঠাকুরমা, আমার পানে তাকাও দিকি ?

আমার বয়ে গেছে তাকাতে ! এই ভাবিয়াও দয়াময়ী একবার তাকাইল।

মালতী বলিল, জলদেবতাকে বারে বারে দেখতে পাইনে কেন, ঠাকুরমা ?

—তাহলে যাবি যে বানে ভেসে ! যাবি মরে !

মালতীর বহিয়া গিয়াছে মৃত্যু কামনা করিতে। বলিল, আমি যে খুব সাঁতার জানিগো।

দয়াময়ী আশ্চর্য হইল না, বরং মেয়েটার অনভিজ্ঞতায় একটু হাসিয়া বলিল, বোকা, সাঁতার জানলেই বাঁচতে হবে নাকি? বন্যায় লোক মারা যায় না? এই যে জল হয়েছে, আর একহাত, দুহাত জল হলেই তো ঘর নেবে ভাসিয়ে, তখন কোথায় যাবি?

ঠিক অর্থটি কখনও দয়াময়ী ধরিতে পারে না, কানে খাটোতো! মালতী দূরের দিকে চাহিয়া তবু বলিল, আমি তো সাঁতার জানি, ঠাকুরমা।

—জানিস্ বেশ করিস্, এখন খুব সাঁতরিয়ে আয়, যা! বলছি যে—

মালতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনি জানেন ঠাকুরমা?

দয়াময়ী তাহার নিজের সম্বন্ধে কারুর অনুসন্ধিৎসাই বাধা দিতে পারে না।

—খুব জানি, তবে এখন আগের মতো পারবো কিনা বলতে পারিনে।

—একেবারে ভুলে গেছো?

—না রে না। একি তোর গল্প শোনা, নাকি যে, এক কাণ দিয়ে শুনলাম তো আর এক কাণ দিয়ে বেরুলো?

মালতী বলিল, আপনার কোন্ গল্পটা ভুলে গিয়েছি বলুন? সব কটি মনে আছে। নারুকে সেদিন বললাম একটা। এখন আর একটা বলুন না ঠাকুরমা?

—এখন? কী বলগো! দয়াময়ী আশ্চর্য হইয়া গেল—তুই কি পাগল হয়েছিস সত্যি? আমার আর কাজ নাই নাকি?

—ইস্, ভারিতো কাজ! ওই তো এক তরকারি কুট্‌নো, সেতো অতটুকু এক মেয়েও পারে।

দয়াময়ী রাগিল না, বরং এই পরিহাসে আন্তরিক যোগ দিয়া ফেলিল।

—তাহলে তুই-ই করিসনে কেন, মেয়ে?

—ইচ্ছে যখন হয় করবো, আপনাকে তখন বলে দিতে হবে না।

—নইলে নয়? দয়াময়ী একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দেখবো, সবাই দেখবো—জানি রাজপুত্তুর আসবে না নিতে, যেতে হবে শেষে ঐ ভাঙা কুঁড়েতেই, তখন হাঁড়ি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কি চেহারা হয় দেখবো। সেখানে থাকবে না এমন মা, থাকবো না আমি—

মালতী বলিল, তুমি না থাকলেও চলবে বুড়ী!

ভাগ্য ভালো, দয়াময়ী শুনিতে পায় কম। সে তখন আপন মনে বলিতেছিল: যখন শশুর ঘর করতে এলাম, বয়েস তখন নয়, শাশুড়ী দিলে এত

বড়ো কলসী, বললে, আনো জল—দিলে ভাত রাঁধতে, বললে, ভাতের হাঁড়ি নামাতে—দিলে ভাঁড়ার ঘরের ভার—কিন্তু দরজার শেকলের পেতাম না নাগাল! হায়, হায়, কী করি কী করি!

কিন্তু এতক্ষণ এই স্বল্পশ্রুতি বৃদ্ধার কাছে বসিয়া মালতী চেঁচাইয়া বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে উঠিতেছিল, দয়াময়ী হাত ধরিয়া আবার বসাইল।

—তারপর, ছেলেটার নাম বললিনে তো!

মালতী এইবার চকিত হইয়া ওঠে। পুনরুক্তিতে বিরক্তি বোধ না করিয়া স্পষ্ট বলিল, রজতকুমার।

—আবার আসবে বলেছে?

—ঠিকতো কিছু বলেনি।

—আসবে।

মালতী দয়াময়ীর মুখের দিকে চাহিলেও কী দেখিতে পাইত সে বৃদ্ধার চোখের পাতায় ছায়া ঘনাইয়াছে?

—এলে আমায় দেখাস কিন্তু?

—আচ্ছা।

এমন সময় দৌড়াইয়া আসিল নারায়ণ, একমুখ হাসিয়া বলিল, দিদিগো, দেখে যাও মজা!

—কি মজারে?

—এসোই না আমার সঙ্গে। মালতীকে নারায়ণ টানিয়া উঠাইল এবং তাহাকে আর কোন কথাই বলিবার অবসর না দিয়া লইয়া চলিল।

দয়াময়ী পিছন হইতে বলে: এই নারু লতিকে কেন ডাকলি বলে যা না—

কে কার কথা শোনে! তাহারা তখন চলিয়া গেছে।

কারণে অকারণে চীৎকার করিবার অভ্যাস দয়াময়ীর আছে, এখনও তাই শোনা গেল: মালতী, ও লতি, চলে যাচ্ছিস? কেন যাচ্ছিস বললে দোষ হয়? না, আমি বুড়ো মানুষ বলে যতো ঘেন্না!

মালতী আসিয়া দেখিল, প্রিয়নাথ টাকা গুনিতেছে। মেঝেতে তিন থাক সারবন্দী টাকা। তাহার দুই চোখ কপালে উঠিল, বিস্ময় ও আনন্দে। একসঙ্গে সামান্য কটা টাকা আজ লাখ টাকার মতো মনে হইতেছে, কিন্তু

প্রিয়নাথ বিব্রত হইল। তাহাকে যারা জানে তাহারা এবং সে নিজেও জানে, ঐ মেয়ের কাছে তাহার এই ভাব বিস্ময়কর, অদৃষ্টপূর্ব। অথচ ঐটুকু মেয়ের কাছে সেও কি বন্যাপীড়িত পৃথিবীর মতো অসহায় ?

—বাবা, ও কিসের টাকা ?

অসহায় ? কখনও না। অসহায় ঘুমে অচেতন মানুষ, অসহায় এই বাড়ীর মেয়েরা অথবা শিশুরা, সে নয় ; এতখানি বয়সে সেই দুর্ভাগ্যের সাথে পরিচয় এখনও প্রিয়নাথের হয় নাই। সহজ হওয়ার কায়দাটুকু সে জানে। বলিল, গরু দুটো বেচে ফেললাম রে।

মালতী খুব আশ্চর্য না হইয়া পারে না।—কেন ?

—কেন ! সেজন্য তোর কাছে যাবো নিকেশ দিতে ?—টাকা হাতে পাইয়াও প্রিয়নাথ হঠাৎ রাগিয়া গেল, বলিল, সবটাতেই নিকেশ চাই, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যেন !

তাহার সাময়িক কোন মেজাজ বিকৃতির তিরস্কার শুনিতে মালতী অভ্যস্ত নয়, তাই ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু কিছু বলিবার মতো সাহস নাই—স্থির দাঁড়াইয়া আঙুলের ডগায় কাপড়ে আঁচল জড়াইতে লাগিল। প্রিয়নাথও আবার অনেক সময় নিকাশ দিতে অস্বীকৃত হইলেও অনেক সময় অযাচিত-ভাবেই নিকাশ দেয়। এবারেও দিল : দেখিস্ না, দিন-রাত গরু দুটো কেবল কাঁদে ! না খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে গেছে, কোত্থেকে আর খাবার জুটিয়ে দিই বল। তাই ব্যাপারীদের কাছে বেচে ফেললাম, ওরা পনেরো টাকা করে তিরিশ টাকা দিলে। শহরে এখানকার মতো হয় না বর্ষা, হয় না এমনি অকাল, সেখানে পয়সা থাকলে যমের হাতের প্রাণও বাঁচে, সেখানে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি মেলে, সেখানে ওরা খেয়ে বাঁচবে। যতদিন ফলদান করবে, ততদিন খাবারের কোন চিন্তা নেই, ততদিন খেয়ে বাঁচবে।—মাঝখানে মালতী আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নইলে ?

—নইলে আমি কি জানি ? দুঃসময়ে এই অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে রাগ হওয়ার কথা নয়, তবু হয়তো এক নির্মম সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া প্রিয়নাথ খিচাইয়া উঠিল : এতো নিয়মই, সংসারে উপার্জন যে করে, যতদিন সে করতে পারে, তখন পর্যন্ত তার আদর। এতো সংসারের রীতিই ! ওদের বেলায়ও তাই হবে না কেন ? এটুকু বুঝতে পারিসনে, আবার জিজ্ঞেস করিস, নইলে কী হবে ! নইলে হয়তো দেবে কসাই-এর হাতে।

মালতী হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কথা নাই

॥ তিন ॥

নিজের এই নিষ্ঠুরতার জন্য প্রিয়নাথ যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। কিন্তু অপর পক্ষ হইতে একেবারেই কোন সাড়া না পাইয়া ওইটুকু মেয়ের কাছেই আজ এ সম্বন্ধে জবাবদিহি করিবার ইচ্ছা উগ্র হইয়া উঠিল।

প্রিয়নাথ টাকাগুলি কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া বলিল, চুপ করে রইলি যে?

—বাবা, কসাইরাতো মেরে ফেলে, না?

কসাই-এর হাতে পড়ার সম্ভাবনা কম, তবু প্রিয়নাথ যে এখন ভয়ানক চমকিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার চোখে দেখা দিয়াছে জল, এই দুর্বলতাটুকু ছাপাইবার বুদ্ধি তাহার আছে। তৎক্ষণাৎ সে নামিয়া পড়িল জলে, 'সেই কখন ভোর হয়েছে, এখনও মুখটা পর্যন্ত ধোওয়া হয়নি। কাজ কি আর একটা—একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময় যেন নেই'—এই বলিয়া নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ তুলিয়া খল্‌খল্‌ করিয়া নিজের মুখ ধুইতে লাগিল।

কিন্তু মুখ ধুইতে আর কতক্ষণ লাগে? প্রিয়নাথ অনুমানে হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, বড়োজোর দুই মিনিট, তারপরেই—

তারপরেই অপরিষ্কার মুখ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু ঘুরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে প্রিয়নাথ চিরকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া থাকিলেই পারিত, অথবা আ-মরণ কেবল মুখই ধুইতো খল্‌খল্‌ করিয়া।

এক দয়াময়ী বাদে সকলে, এমনকি লীলাবতী পর্যন্ত, তাহার সারবন্দী টাকার মতোই সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লীলাবতীকে জানাইবার ইচ্ছা প্রিয়নাথের ছিল না, কিন্তু সে যে ইতিমধ্যে সবই জানিতে পারিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তাহার মুখের গাম্ভীর্য দেখিলে ভয় করে।

—কাউকে না জানিয়ে এই বুঝি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল?

প্রিয়নাথ ততক্ষণে দাওয়ায় উঠিয়া আসিয়াছে, কাছে গামছা না পাইয়া নিঃশব্দে কাপড়েই মুখ মুছিতেছে।

—গরু দুটো বেচে কি লাভ হলো? দুধও তো পাওয়া যেতো। আর এতদিনের একটা জিনিস, আর কি হবে কখনও? না, একবার গেলে আর

হয় না। একেকটা সময় আসে মানুষের তখন মরণদশা পেয়ে বসে, তোমারও তাই হয়েছে। ইস্, দু দুটো গরু! এতকাল যারা খাইয়েছে তাদের তাড়ানোর মতো মনের অবস্থা তোমার কী করে হলো?

প্রিয়নাথ কতক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; এমনভাবে চাহিবার অভ্যাস তাহার নাই, তবু চাহিল। তারপর বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, দেখেছো?

—হ্যাঁ, দেখেছি, তুমি আর কী দেখাবে?

—ওতে মানুষ মরে জানো, মানুষ?

—জানি, জানি।

এবার প্রিয়নাথের গলা সপ্তমে চড়িল: তাহলে মানুষ নই আমরা? আমরা পশু? না খেয়ে মরবো তুমি বলো?

—তোমার মরবার সাহস আছে? কেবল বড়োবড়ো কথা, তোমারই শরীর ভরে কেবল মমতা, মায়া? আমি অবুঝ পশু? তোমার চেয়ে বুদ্ধি আমার কম? নিজেরাই খেতে পাইনে, গরুকে খাওয়াবে কে? দোহাই তোমার, বিশ্বাস করো, মাথা আমার খারাপ হয়নি, এখনও বাঁচবার সাধ আছে, তোমার মতো মরবার ইচ্ছা আমার হয়নি।

লীলাবতী স্তব্ধের মতো দাঁড়াইয়া রহিল: এ রকম সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও ভাবিতে পারে না, ওই রাগ। উত্তপ্ত প্রিয়নাথের সাথে যুক্ত-জীবনের ইতিহাসে পূর্বোক্তির দৃষ্টান্ত বিরল। বাতাস এত বিষাক্ত আজ।

—তুমি জানো, তুমি অন্নপূর্ণা, আমাদের পেট পুরে খাওয়াবে; কিন্তু জানো, আজকাল শিবকে ভিখিরি হলে চলে না, লোকে ছি-ছি বলে? হাতে অন্ন তোমার আছে? চুপিচুপি বলি, দেবে ভিক্ষে?

প্রিয়নাথ অদ্ভুত এক স্বরে বলিল, যেন অনেক শালপাতায় বাতাসের এক টুকরো শব্দ। প্রিয়নাথ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলিল, চুপিচুপি বলি, দেবে ভিক্ষে? ওদের হয়ে আমি নিজেই হাত পাতছি, দেবে ভিক্ষে? আমাকে বাদ দিলেও তোমার মালতী নারু—ওরা আছে, সে খেয়াল তোমার আছে? কিন্তু আমি এখনও পাগল হইনি। এখনও ঘাসকে মানুষের খাবার বলে ভাবতে পারিনে, এখনও ভাতকে কাঁঠাল পাতার চেয়ে উঁচু বলেই মনে হয়। শোনো, শোনো, কথা বলতে আমিও জানি, কিছু খাবার দাও, খেয়ে আরও কেমন বলি দেখো।

—আশ্চর্য, টাকা হাতে পাইয়াও প্রিয়নাথ এতটুকুও হাঁপায় নাই। সত্যি আরও অনেক বলিতে পারে, হয়তো বলিবে, হয়তো কী মনে করিয়া বলিবে না। কিন্তু মনে করিবার সময় কোথায়?

লীলাবতী তখনও পাষানের মতো দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি অর্থহীন, চোখে যেন ডোবার ঘোলা জল, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে অবলম্বনহীন লতার কাতরতা। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায়ও লীলাবতীর নাই। ওদিকে প্রিয়নাথের স্বরে তাপ; হয়তো আজকার দিনটিতে তাহার মনে হইতেছে, সে একটা লক্ষপতি বা তারও উপরে। ভিক্ষা আজ সে করে না, আজ রাজা হইবার কামনা তাহার উগ্র।

লীলাবতীর ততক্ষণে চমক ভাঙিয়াছে। সে আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা চলিয়া গেল রান্নাঘরে—সেখানে সহজলভ্য মাটির একটা উনান আছে, তাহার ভিতরে আগুন নিবিয়া গেছে, কিন্তু ফাঁকা—অন্নপূর্ণার রাঁধিতে হইবে ধার করা অন্ন। সে আর একমুহূর্ত দেরী না করিয়া আগুন জ্বালিতে বসিল। কিছু পরে উপুড় হইয়া ফুঁ দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া সে মুখ তুলিয়া অনুভব করিল: মনটা তাহার ছুটির স্বপ্ন দেখিতেছে, একটু আগেও ব্যস্ত থাকিয়া বর্তমানে ব্যস্ত আর নাই এবং তাহার শুষ্ক চোখে কোথা হইতে নামিয়াছে বন্যা, উত্তপ্ত অশ্রুর বন্যা!

লীলাবতী আঁচলে মুখ চাপিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল; অনেক ধোঁয়ায় যে ঘর ভরিয়া গেছে সে খেয়াল তাহার নাই।

কিন্তু কান্নার কথা প্রিয়নাথ কল্পনায়ও ভাবে না, স্বপ্নও দেখে না। সে ধপ্ করিয়া আবার দাওয়ায় বসিয়া টাকা গুনিতে বসিল। টাকা পয়সার হাত পা আছে, এ বাক্য তাহার অজ্ঞাত নয়। টাকা কয়টি ভাল করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সে চারদিকে চাহিয়া দেখিল এই মনে করিয়া যে, কোনও দরজার কোন চৌকাঠ ধরিয়া কেউ বসিয়া আছে হয়তো! কাউকে না দেখিয়া উঠিয়া গেল রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেলে কেউ সে ঘরে থাকিলে অনেক সময় তাহাকে দেখা যায় না, একথা জানা বলিয়াই—নিঃশ্বাস চাপিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল: উনানের সামনেই লীলাবতী হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে। প্রিয়নাথ তাহার পিঠে হাত স্পর্শ করিয়া ডাকিল, বৌ?

লীলাবতী একটুকুও আশ্চর্য না হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কী?

ধোঁয়ায় যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। পাশের ছোট্ট জানালাটি খুলিয়া সেই

আলোতে দেখিল, লীলাবতীর মুখ জলে ভেজা।

—বৌ, তুমি কাঁদছো?

—না। লীলাবতী সহজভাবে বলিল, ধোঁয়ায় চোখ থেকে জল বেরিয়েছে।

—তাহলে এখানে বসেছিলে কেন?

লীলাবতী চুপ করিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ কান্নার কথা আর তুলিল না; কারণ, কান্নার অর্থ তাহার কাছে অস্পষ্ট। আস্তে আস্তে বলিল, বৌ, তুমি ব্যাপারটা ভেবে ছাখোনি। গরু দুটো কিছুতেই বাঁচতো না। ঘাস তো জলের নীচে, খড়ও নেই, শুধু পাতা খেয়ে আর কদিন বাঁচে বলো? আর পাতাও কি পাওয়া যায়? এর মধ্যে না খেয়ে-খেয়ে ওরা ঠিক মরে যেতো। বেঁচে থাকতো, তুমি বলো?

প্রিয়নাথ অন্যপক্ষ হইতে উত্তরের অপেক্ষা করিয়া কোন সাড়াই না পাইয়া নিজেই বলিল, কখনও না। তাইতো বেচে ফেললাম। শহরে গিয়ে অন্তত বাঁচবে। নইলে চোখের সামনে মরণ দেখে তুমিই সইতে পারতে? আমারও কি একটুও দুঃখু হয় না মনে করো? নৌকায় ওঠার সময় ফ্যালফ্যাল করে ইদিকে চেয়ে রইলো, দেখলাম, চোখে যেন জল। কাছে গিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম, ওরা কি বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। এমনিতে তুমি যা হয়েছো, সেসব নিজের চোখে দেখলে তুমি সইতে পারতে? তাইতো ডাকিনি। আর এক কথা বলি। আচ্ছা, আমাদের এখনকার দিনগুলোর বাতাস যে বিষে নীল, একথা মানো?

—হ্যাঁ।

—তবে আমাদের এই কষ্টে তোমার মন ভার নেই? অন্যদিকে চাইবার সময় তোমার আছে?—পাশের গাঁয়ের ফ্রি স্কুলে প্রিয়নাথ একবার মাস্টারী না কি করিয়াছিল, সেই মাস্টারীর সুরেই বলিল: পশুর চেয়ে আমরা অনেক বেশী মূল্যবান, আমরা চলে গেলে ধরিত্রীর বুক যে শূন্যি। তখন কে চষবে মাটি, কে ছড়াবে বীজ, কে দেবে সার? কিন্তু শূন্যি কেন হ'তে যাবো, কেন হতে চলেছিলাম, সেকথা কি তোমার এখনও অজানা?

কি মনে করিয়া যেন প্রিয়নাথের চোখ দুটি ব্যথায় গভীর হইয়া উঠিল—আমি কী করবো বলো; স্বর্গের সিঁড়ি যে আমি অনেককাল থেকেই দেখতে পাইনে, আলো যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনে, এ আঁধারে যে শ্বাস বন্ধ হয়ে

আসছে, কিন্তু কোথায় পথ, কোথায় পথের চিহ্ন? বৌ, আমি পথ হারিয়েছি। কিন্তু তোমরাও কি সঙ্গে নেই?

লীলাবতী মাটির দিকে চাহিয়া রহিল; সেখানে সে কিছু দেখিতে পাইয়াছে যেন।

প্রিয়নাথ এবারেও কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিল, কি জানো, রাত্রে পাহারা দিয়েছি এ-পুরী, এই ভাঙা পুরী, দেখেছি চারদিকে কেবল অন্ধকার, একটি রাতেও পাইনি চাঁদকে, দেখেছি নাকটা মাটির উপর পড়ে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে, আর বাইরে কেবল জল, সমুদ্দুর। সেখানে ডুবে গেছে ঘাস, হারিয়ে গেছে মাটি, সঙ্গে আকাশও ডুবেছে, বাইরে এসেছি—বিশ্বেস করবে, সেই জল আমাকে ডেকেছে!

লীলাবতী হঠাৎ ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া একটা দুর্বোধ্য আর্তনাদ করিল।

॥ চার ॥

এবার যেন সায় পাইয়াছে প্রিয়নাথ। আরও ঝুঁকিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বলিল, সেই জল আমাকে ডেকেছে, মানে, একসময় আমার ইচ্ছে হয়েছে মরতে। তুমি তখন খুদ কুড়াচ্ছো শূন্যি ভাঁড়ার ঘরে, ভোর হলে আলোকে জয় করবে বলে। জলে নামলাম, কী ঠাণ্ডা জল, গা শির্ শির্ করে। কিন্তু তখন মনে হলো, আমার মতো সাঁতারু আর এ পৃথিবীতে নেই! আবার উঠে এলাম, তোমাকে সেসব কিছুই বলিনি। তারপরে ভাঁড়ার ঘরে এসে দেখলাম, তুমি তখনও খুদ কুড়োচ্ছো।

লীলাবতীর চোখ দুটি বন্ধ হইয়া গেছে।

—তোমাকে এসব বলিনি, তুমি ভয় পাবে বলে।

লীলাবতী এতক্ষণে তাহার মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু তবুও কিছু বলিতে পারিল না।

হঠাৎ কী মনে হইল প্রিয়নাথের: তুমি খেয়েছো?

—কেউ দেখেছে, ভোরে আমি কখনও খাই?

—কেন? কেন খাওনা? প্রিয়নাথ আশ্চর্য হইয়া গেছে, একি ব্যাপার! এরকম করলে যে তুমি সত্যি একটা বড়ো অসুখে পড়বে গো!—সে তাড়াতাড়ি

ঘর হইতে মা'র কাছে আসিয়া ডাকিল : মা, ওমা—

—কে, পিয়ো ?

—হ্যাঁ, একটা ব্যাপার জানো মা ?

প্রিয়নাথের গলা এখন উঁচু পর্দায়, দয়াময়ী তাই শুনিতে পাইয়াছে। সে জোরে বলিল, কি রে ?

—তোমার বৌ না খেয়ে থাকে !

—কী বলিস ?—দয়াময়ী একেবারে নির্জলা উপবাসের কথা ভাবিয়াছে।

—হ্যাঁ, রোজ ভোরে না খেয়ে থাকে।

দয়াময়ী মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, আমি তো কতো বলেছি বৌকে, রান্না বসাবার আগে চান করে খেয়ে নিতে।

—তোমার কথা কি আর কেউ শোনে ? কেউ শোনে না।

—ঠিক, ঠিক ! দয়াময়ী খুব মাথা নাড়িয়া সায় দিল, ঠিক বলেছিস, আমার কথা কেউ শোনে না, কেউ না। মনে করে আমি বুড়ী-থুড়ী মানুষ, এক কোণে একটা আগাছার মতো পড়ে থাকি, আমার কথায় আবার কান দেবে কী ? সব জানিরে সব জানি, এই চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়সে কিছু জানতে বাকী আছে ? দয়াময়ী একমনে বকিয়াই চলিল।

—মা, তুমি একটু বলে দাও ওকে—প্রিয়নাথ উঠিল।

—আমি কী বলবো রে, আমার কথা কেউ শুনলে তো !

প্রিয়নাথ ততক্ষণে আবার রান্নাঘরে। লীলাবতী সবই শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুই বলিল না।

—বৌ ?

—কী ?

প্রিয়নাথ আস্তে তার কাঁধ স্পর্শ করিয়া বলিল, আজ একটা নূতন জিনিস করলাম, যা তোমাকে জানাইনি। আজ আবার নূতন করে ঈশ্বরকে জানালাম, অনেক বছর আগের যে দিনগুলো ফেলেছি হারিয়ে, তা যেন আবার ফিরে আসে। যে পথ খুঁজে পাইনি, সে পথের ধারের একটি গাছেরও যেন দেখা পাই—

চোখ দুটিতে কী হইয়াছে লীলাবতীর !

প্রিয়নাথ টাকা তিরিশটা বাহির করিয়া তাহার চাবিহীন আঁচলে বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিল, তোমার কাছে এ টাকাগুলো রাখলাম, তুমি যা ইচ্ছে হয়

করো, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। বৌ, কারুর ভুল বুঝবার দায়িত্ব আমার নয়—সেজন্যে আর একজনকে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? তোমার আঁচলে টাকা এই বেঁধে দিলাম।—প্রিয়নাথ এবার দেখিল, লীলাবতী তাহার দিকে তাকাইয়াছে; মুখখানি জলে ভেজা। এখন আর ঘরে ধোঁয়া নাই।

প্রিয়নাথ উঠিয়া বাহিরে আসিল।

আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে অনেকদিন পরে দাওয়ায় সকলে একত্র গল্প করিতে বসিয়াছে, দয়াময়ী পর্যন্ত উপস্থিত।

পীড়িত জীবনের আজিকার মুক্তি-উৎসারিতে রজতের স্মরণ। রজতকুমার! অজানায় একটা পরম সুখে সকলেই অপেক্ষা করে তাহার। সেই একটি দিনের দেখার পর পরিচয়ের পরের সিঁড়িতে আর তাহার পদক্ষেপ শুনা যায় নাই, তবুও তাহার জন্য মনে মনে অপেক্ষা। এমন কী সকলের ছোট হারুর মনেও হয়তো এই আশা!

আর, মালতী দেখে জল, ভাবে শুধু জল, এই জলে একদিন ছোট ঢেউ উঠিয়াছিল, সেই দিনের নূতন সূর্যের আলোয় কত রঙ! সেই রঙের ছায়া এখনও জড়াইয়া আছে তাহার চোখে।

মালতী ঈষৎ দূরে বসিয়াছে; এখান হইতে আকাশকে বড়ো দেখা যায়। তাহার সংস্থানে, আর অন্ধকারের অগুন্তি পিছল সিঁড়িতে দেখা যায় পথ—যে পথে নাচিয়াছিল নতুন সূর্যের রঙের ফুলঝুরি। মালতী একটা নিঃশব্দ আনন্দে চুলের গুচ্ছকে পিছনে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু তা কী আর পিছনে থাকে? আবার আসিয়া হারানো চোখকে জড়াইয়া ধরে।

সে আর বাধা দিল না।

আজ খাওয়ার অপেক্ষাকৃত ভালো আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু নারু বর্তমানের সুখে ভবিষ্যতের কথা ভুলিতে চায় না। সে প্রিয়নাথের হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, কাল একটা ইলিশ মাছ এনো, হ্যাঁ?

—বেশ; লতি?

মালতী মুখ ফিরাইয়া বলিল, কী বাবা?

—তোমার লাগবে না কিছু?

মালতী একটু ভাবিল, অনেকদিন কিন্তু চাহিবার অভ্যাস নাই—তারপর হাসিমুখে বলিল, একটা সাবান।

নারু না বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, সাবান খাবে তুমি দিদি?

—তোকে খাওয়াবো, বোকা!

প্রিয়নাথ 'আচ্ছা' বলিয়া এবার পিছন দিকে চাহিল: তুমি?

—আমার আবার কী! ওদের হলেই হলো। লীলাবতীর মুখেও মুচকি হাসি। প্রিয়নাথ নিজেই বলিল, তোমার জন্যে আনবো কাপড়। মালতী তোর জন্যও। দয়াময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, নিজের শ্রুতি-অক্ষমতায় (দু' একটি কথা ছাড়া) শিশুদের হাস্যালাপের প্রতি অবজ্ঞায় নিশ্চেষ্ট হইয়া। কিন্তু এখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, তোমরা কী বলো গো?

নারু কাছে গিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চেঁচাইয়া বলিল, বাবা কাপড় আনবে মা'র জন্যে।

—কাপড়? দয়াময়ী কতক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া তারপরেই হঠাৎ তাড়াতাড়ি পিঠের আর বুকের কাপড় মুখের সামনে সরাইয়া গভীর মনোযোগে কী দেখিতে লাগিল।

শিশুরা কী যেন নূতন কিছু দেখিবে এইভাবে চাহিয়া রহিল।

অনেক জায়গায়ই তো ছেঁড়া! দয়াময়ী জানে বলিয়াই আশ্চর্য্য হইল না, কিন্তু লীলাবতীকে দেখাইয়া বলিল, বৌ, দেখেছো কী ছেঁড়া! তোমাকে বলতে মনে থাকে না, দুপুর বেলা বসে একটু সেলাই করে দিও। কাপড়টা টিঁকছে বেশ, কী বলো? সেই গত ফাল্গুন মাসে কেনা—

প্রিয়নাথ লীলাবতীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর আবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, মা, তোমার জন্যেও আনবো একখানা। কিন্তু দয়াময়ীর কানে কী সেসব যায়? সে তখন চলিয়া গেছে অতীতের ইতিহাসে: বুড়ো থাকিতে কে একজন দিয়াছিল একটা গরদের শাড়ী, চমৎকার লালপেড়ে শাড়ী, তারপর···

—আর আমার বেলাতেই লুঙ্গি, একেবারেই লুঙ্গি! প্রিয়নাথ এবার নিজের কথা নিজেই রসালাপে বলিল, আখড়ার বাবাজীর শরীরটে যেমন গোল, তেমনি একটা লুঙ্গি!

সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির সাথে প্রিয়নাথও একচোট হাসিতে লাগিল—আজ যেন তার কী হইয়াছে!

কিন্তু লীলাবতীর বসিয়া থাকিবার সময় নাই, সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মালতী আবার জলের দিকে চক্ষু ফিরাইল, আকাশের দিকে চাহিয়া

দেখিল, চাঁদ! এতক্ষণ লুকাইয়া ছিল কোথায়? কোথায় হারাইয়া ছিল পথ?

আজ চাঁদ উঠিয়াছে; বাঁকা ছুরির মতো চাঁদ, শীর্ণ, নিরাভরণ আলো। মালতী আবার জলের দিকে চাহিয়া দেখিল কোথায় তাহার কম্পমান ছায়া? কোথায় আরসির বুকে রামধনু? কোথায় ভাঙা আলোর ঝিল্‌মিল্?

মালতী বুকে হাত রাখিয়া কোন্ এক সৌরভ প্রাণপণে শুঁকিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ তখন গল্প বলিতেছে: পুরীর মধ্যে আট্‌কে থাকা রাজপুত্তুর পথে বেরুলো, মাটিতে নামলো; দেখলো, পথের রঙ হলদে, আকাশের রঙ নীল, আর একখানা মস্তো বড় নদী—এপার-ওপারে যেখানে সুমুদ্দুর—

হারু বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল।

—হ্যাঁ, ওখানে আজ যেমনি হয়েছে, প্রিয়নাথ হাসিয়া বলিল, আর দেখলো, এ কী; পথের ধুলো বাতাসে ওড়ে, আকাশে সাদা তুলোর মতো কী সব ঘুরে বেড়ায়, সমুদ্দুরে কেমন ঢেউ, কেমন শোঁ শোঁ শব্দ! পুরীতে বন্ধ থাকা রাজপুত্তুরের চোখে আশ্চর্যের সীমা নেই, রাজপুত্তুর আশ্চর্য্য-ফুলের গন্ধে জ্ঞান হারালো!

—কোথাও দেখেছ এমন রাজপুত্তুর? আকাশের নীল দেখে সে নীল ফুলকে ভাবলে লাল, পদ্মবনের পাঁককে বললে জলে ভাসা মাখন, মেঘকে বললে তুলো, আর সুমুদ্দুরের হাওয়াকে বললে কোন না-দেখা দেবতার উড়ানির ঝাপটা। রাজপুত্তুরতো অবাক, আর দেখে দেখে হয়রান, ভেবে-ভেবে শেষ হলো, কেবল ভুল করতে লাগলো! চোখের রাজ্যিতে এসে সবই নূতন, সবই সাতরাজার ধন এক-এক মানিক, এ যে ভোম্‌রার বুকে রাক্ষসীর পরাণের চেয়েও অবাক কাণ্ড, চম্পাদ্বীপের রাজকন্তের মনের কথার চেয়েও গোপন, এ যে তরোয়ালের চেয়েও ধার বেশী। রাজপুত্তুর হাওয়া খেতে লাগলো।

বর্ষার জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করিয়া কে একজন ইতিমধ্যে আসিয়াছে কাছে, অথচ খণ্ড চাঁদের জ্যোৎস্নার স্বল্পতায় পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। মালতী বলিল, বাবা কে যেন ইদিকে আসছে?

প্রিয়নাথ ভয়ানক হাসিতে লাগিল, এরকম সে অনেকক্ষণ হাসে নাই।

—কে আর আসবে? প্রিয়নাথ যেন জানে কে আসিতেছে—সেদিকে একবারও না চাহিয়া বলিল, রাজাকে যতটুকু ভালোবাসে প্রজারা, তার বদলে কী তারা পায়? কিছুই নয় গো। ওই তো চার দেয়ালের আড়ালে পালকের

বিছানায় গা মোড়ামুড়ি দেয়, আর কালে-অকালে পথে বেরুলে কাউকে সামনে দেখলেই তরোয়াল দিয়ে কাটে, আর মানিক-ঝরা হাসি হাসে। কিন্তু এবার কোশের পর কোশ পেরিয়ে গেলো—মানিক আর ঝরলো না। এবার তরোয়াল খেলা মাটি, এবার দস্যু ঘোড়সোয়ারের ঘোড়ার ভেঙেছে পা, চোখে একমুঠো ধুলো!

প্রিয়নাথ ভয়ানক হাসিতে লাগিল, এরকম সে হাসে নাই।

—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ক্যাম্পে, তাই এলাম। রজতকুমার আসিয়াছে।

মালতী হাত উঠাইয়া তার উড়ন্ত হালকা চুলের গুচ্ছ পিছনে চাপিয়া ধরিল।

প্রিয়নাথ আগেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল যেন, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলিল, রজত, এক রাজার মধ্যে দেখলাম অতখানি অহঙ্কার। যাদের দৌলতে আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া, তাদেরই বুকে দিলাম তরোয়াল এপাশ ওপাশ, এই কি রীতি? রজত প্রস্তুত হইয়াই ছিল মনে হয়। বলিল, এই রীতি। সাত রাজার ধন এক মানিকের যে মালিক তার এ-অহঙ্কার খাটে। তা'রা ঈশ্বরকেও ঘুষ দিয়ে বশ মানিয়েছে!

—কী বলো, তাহলে মাটির মানুষেরা বাঁচবে কি করে?

—তার পন্থা আবিষ্কার করা হচ্ছে।

—কে করবে?

—আমরা! রজত সকলের দিকে একবার তাকাইল, আস্তে গম্ভীর স্বরে বলিল, আমরা সে মন্ত্র আবিষ্কার করছি। দেখুন, আমিও মাটিরই মানুষ, মাঠ ভরা রোদে লাল আর বাদামী হয়ে চোখের কালোয় আগুন জ্বেলেছি কিন্তু এখন নিজেরা আর পুড়বো না, এখন পোড়াবার পালা। আমার কাছে পন্থা আছে—

এইবার আর সহজ থাকিবার উপায় প্রিয়নাথ জানে না; সে, হঠাৎ চোখে আলো লাগার মতো বিস্ময় লইয়া রজতের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রজতকুমার বলিল, আমার কাছে পন্থা আছে।

রাশি-রাশি রহস্যের ফেনা ওই পুরুষের মাথায়, মুখে, সমস্ত শরীরে: মালতী বুঝিতে পারে না, অথবা রাতের আকাশ, জল, দক্ষিণের বাতাস··· পাশে রাখিয়া কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারে, রজতকুমারের হাতে রাক্ষুসী রাণীর প্রাণ!

এক ফাঁকে মালতী গেল কাছে, কানে মুখ লইয়া ডাকিল, ঠাকুরমা গো—

—কেন রে?

—সেই যে…। মালতীর দাঁতে খিল ধরিয়া যায়।

দয়াময়ী বাহিরের দিকে অনির্দিষ্টভাবে তাকাইয়া অনুমান করিতে লাগিল, 'সেই যে'র মূলসূত্রটি কোথায়।

মালতী পড়িয়াছে মুস্কিলে। ধরিতে না পারিয়া দয়াময়ীর আসিল বিরক্তি। বাহিরের দিকে অনির্দেশ দৃষ্টির শেষ নাই যেন।

হাঁটুর উপরে দুই হাত, তার উপর লোলচর্ম মুখটি রাখিয়া দয়াময়ী অনেক কিছুই তো ভাবিতে পারে। তারপর কয়েকদিন আগে একটি ছেলে নাকি আসিয়াছিল, মালতীই তো বলিয়াছে। কিন্তু মালতীর যা মেজাজ! তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়।

—ও লতি, লতি—

—কী গো?

—তার নামটা কী নাকি বলেছিলি?

মালতী তাড়াতাড়ি তাহার হাতটি তাহার মুখে চাপিয়া আস্তে বলিল, চুপ, চুপ!

দয়াময়ী আবার বিরক্ত হইয়া উঠিল, হাত ছাড়াইয়া জোরেই বলিল, আহা নামটি শুধু জিজ্ঞেস করলুম তো, অমন করে উঠলি কেন বলতো লতি? ভুলেই গিয়েছি, বলই না—

রঞ্জত এদিকে তাকাইতেছে।

বুড়ী যা ইচ্ছে বলুক, আমার কী! মালতীও বিরক্ত হইতে জানে, ভালো করিতে গিয়া যতো বিপত্তি—সে একটা শিশুর মতো তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দয়াময়ী বলিতেছে: মেয়ে মানুষ অত খিট্‌খিটে কেন? আমরা ও-বয়সে কারুর মুখের উপর একটু হা-হা করতে ভয় পেতাম। আর তুই মেয়ে, অহঙ্কারে দেখিসনে পথ! কী তোর কাজ, কী তোর ভাবনা? এখনও তো সিঁথেয় আর কপালে শূন্য মাঠ, তোর কিসের ভাবনা বল? পরের জন্য পর হয়ে যে উপকারটা করলে, তোর মুখেই শুনেছি, তাইতো জিজ্ঞেস করলাম নামটা তার কী! অমনি বুড়ো মানুষের মুখে হাত দিয়ে কী যে বললে—

মালতী তখনও ফিরায় নাই দৃষ্টি।

প্রিয়নাথ বলিল, কী হলো আবার? ওমা, কী হয়েছে গো?

মালতী মুচকি হাসিয়া বলিল, নাম জিজ্ঞেস করছে।

॥ পাঁচ ॥

—আমার? রজত বুকে হাত দিয়ে বলিল।

মালতী মাথা নাড়িল।

রজত হাসিয়া দয়াময়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, ঠাকুরমা, আমার নাম রজত।

জলের দিকে চাহিয়া মালতী মেঝেতে আঙুলের ডগা দিয়া অক্ষর আঁকিতে লাগিল।

ঠাকুরমা! শুধু একরাত্রির পরিচয়। মালতীর চোখেও কম বিস্ময় দেখা দিল না।

আর প্রিয়নাথ তো ভাবিয়াই রাখিয়াছে: তাহার আগের জন্মে খুব বড় একটা সুকৃতি ছিল।

দয়াময়ী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ দেখিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে নাই এমনভাবে বলিল, কে?

—ঠাকুরমা, আমি রজত।

দয়াময়ী এতক্ষণ চাহিয়া দেখিয়াছে, চুপ করিয়া রহিয়াছে; এইবার হঠাৎ এক কান্নার আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল, তুই এতদিন কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি বল? পিয়ো, ও পিয়ো এ আমার সুশী'র ছেলে না রে? তোরা দেখিসনি, এ যে এতটুকু অমিল নেইরে! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক—দয়াময়ী রজতের হাত চাপিয়া ধরিল—সেই হাতের গড়ন, সেই আঙুল, সেই দুটি পা! পিয়ো, ও পিয়ো, তোরা দেখেছিস? লতি, তুই আগে বললিনে কেন, এ আমার সুশী'র ছেলে! তাইতো দেখেছি, পরাণটা টানছে, কেবল টানছে, তোকে তাইতো বারে-বারে জিজ্ঞেস করেছি—রক্তের টান কোথায় যাবে? ঠিক আমার সুশী! এতদিন কোথায় ছিলি বলতো ভাই? দিদিকে এরকম ভুলে যেতে আছে? আমি তো কতকাল আছি পথ চেয়ে, তুই কোথায় ছিলি এতকাল?

রজত এতবড় বিস্ময়ের সম্মুখে হয়তো সারা জীবনেও পড়ে নাই। সে একটি কথা বলিতে পারিল না। মালতীরও সেই একই অবস্থা।

ব্যতিক্রম শুধু প্রিয়নাথ। সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, মা, ওঁ মা—

এখন অনেক রাত। কিন্তু কেউ কী বলিতে পারে বিশেষভাবে প্রিয়নাথের চোখের ঘুম আগের আরও অনেক রাতের মতো অন্তর্ধান করিয়াছে কিনা? করিয়াছে বলিয়া যদি দেখা যায়, তবে আগের সঙ্গে-এখনকার বৈষম্য চোখে পড়িয়াছে?

প্রিয়নাথ গত দুঃখ রাত্রির ইতিহাসকে মনে করিতে ভয় পায়, চেষ্টা করে না, বর্তমানকে হাত ভরিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া সম্মুখে বা পিছনে তাকাইবার সাহস তাহার নাই। সে আজ ভয়ানক হাসিতেছে, কিন্তু মনের কোণে এই হাসির চেয়েও অনেক বেশী ভয়ানক সেই দুর্বলতাটি তন্দ্রায় চোখ বুজিয়া আছে, তাহার চারিদিকে সেই ভয়ের বেড়া। কোন প্রয়োজন নাই অতীত বা ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া, ভয়েরা সেখানে মাথা খুঁড়িয়া মরুক, এখন যে তীর্থের সম্মুখীন হইয়াছি সেখানকার ঘণ্টাধ্বনি প্রাণ ভরিয়া শুনি আর সেসব কিছু ভুলিবার যে দ্বার খোলা সেখানে যাইয়া নাড়ি কড়া।

রান্নাঘরের সঙ্গেই দাওয়া, অপরিসর, ক্ষতবিক্ষত।

প্রিয়নাথ বলিল, জোছ্‌নাকে একদিনও দেখলাম না এ দাওয়ায় এসে উঁকিটি পর্যন্ত মারে, একি ব্যাপার, কেবল অন্ধকার, অন্ধকার। নারু, মনে করিস চাঁদকে থলেয় বাঁধবো কাল, দেখাবো মজা, কেমন পালিয়ে বেড়ায়!

—আনবো থলে? নারু কাহার কাছে শুনিয়াছে, যখনকার কাজ তখন না করিলে পরে আর করা হয় না।

সকলে হাসিয়া উঠিল। লীলাবতী পর্যন্ত; কিন্তু তাহার সেই শব্দহীন মিষ্টি হাসি রজতের কথায়।

—একা বসে আমি কিছুতেই খাবো না, সে আমার কখনও ভালো লাগে না।

—না, না বাপু, তুমি বসো, ওদের তাড়া কিসের।

—কী বলে গো?

লীলাবতী হাসিয়া বলিল, তোমরা একবারে না বললে খাবে না।

—সে কথা আগে বলতে তোমার বাধে? প্রিয়নাথ বলিল। নারু, মালতী,

এখন কয়টা রাত তা তোরা জানিস? খিদে পায়নি তোদের? আয়, আয়—

লীলাবতী এখন যেন সেই গল্পের মেয়ে, যে মেয়ের খাদ্য পরিবেশন এক পাতে ফেলিলে পড়িত পাঁচ পাতে।

মালতী পা' দুটি পিছনে রাখিয়া অতি শান্তভাবে বসিয়াছে। ক্ষুধা সত্যিই পাইয়াছিল কিন্তু খাইতেছে খুব আস্তে, অতি সন্তর্পনে—কোন মূল্যবান জিনিস হাতে তুলিবার মতো, আর চোখের দৃষ্টি এখন মাঝে মাঝে তির্যক, যেন জ্যোৎস্নাবর্ষী চাঁদকে সে এখনও দেখিতে পায়। আর এখনও ভাবিতেছে, দুরন্ত বাতাসে তাহার রেশমের মতো হাল্কা চুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া চোখের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালতী চুলে হাত দিল।

ক্যাম্পে সেই গভীর রাতে রজতকে ফিরতে দেখিলে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হইয়া পারিবে না।

সব জায়গায় জল নয়, এমনও জায়গা আছে যেগুলি এখনও সগৌরবে জাগিয়া আছে। কিন্তু ঘরের একদিকে জল ফেলিলে যেমন অন্য দিকে পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা কম, তেমনি এই প্লাবিত মাটির দেহেও; জলে, জঙ্গলে, শুকনো মাটিতে একটা অভিশপ্ত অপরিচ্ছন্নতার ছাপ।

রজত হাঁটুতে কাপড় উঠাইয়া নীচের দিকে চাহিয়া হাঁটিতেছিল। এখানে অন্ধকারের গাঢ়তা কম। দু'পাশে ঝোপই বেশীর ভাগ, বড়োগাছ যা আছে তার মধ্যে আম কাঁঠালের সংখ্যাই বেশী।

কাঁচা মাটির পথে দুদিকে গরুর গাড়ীর চাকার দাগ, শহরের খোলা ড্রেনের মতো। তাছাড়া তার ভিতর হাঁটু পরিমাণ কাদা, একবার অন্ধকারে ভুল করিয়া পা ফেলিলেও অনেক দুষ্কৃতির ফল পোহাইতে হইবে, নিজের উপর রাগ হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

সাবধানে হাঁটিতে লাগিল রজত।

রাত্রির নিস্তব্ধতায় এখন এই বনে একটা না-শোনা সুর তাহার কানে বাজে, নিতান্ত অপরিচিত সুর। ওই গাছগুলির মাথায় চাঁদের স্পর্শে বাতাসের আন্দোলন—নীচে হইতে তাহার কল্পনা করা যায়। মাটিতেও পড়িয়াছে টুক্‌রা অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, পাতার ছায়া। মাঝে-মাঝে বাদুড়ের পাখার আওয়াজে খাদ্যাহরণের আনন্দ, অনাত্মীয় দিনমানকে কাটাইয়া রাত্রির পাখাকে ভর করিয়াছে। সামনেই একটা বাঁশঝাড়, তাহার কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দ বাতাসে ভাসে।

চমকিয়া রজত থামিয়া গেল। কোন কিছুতে পিছলাইয়া পড়ার শব্দ। কিন্তু তেমন কিছুই নয়। দেখিতে পাইল, তাড়াতাড়ি পথ কাটিয়া গেল একটা গোসাপ। এই অঞ্চলে এই জিনিসটির অস্তিত্ব একটু বেশী।

কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তায় রজতের পা আর পড়ে না। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, এতক্ষণে ক্যাম্পে পৌছিবার কথা, পথ ভুল হয় নাই তো? হয়তো তাই, সে চারিদিকে চাহিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, কোথায় সে আসিয়াছে। সেই গরুর গাড়ীর পথ আর অগভীর বন পিছনে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। রজত কী পথ ভুলিয়া গিয়াছে!

অনির্দিষ্টভাবে সে চলিতে লাগিল।

এত রাতে হঠাৎ মানুষের সাড়া পাইয়া রজত ভয়ানক চমকিয়া উঠিল, পাশে চাহিয়া দেখিল, অত্যন্ত নীচু এক মাটির ঘর, সামনে এক ভাঙা দাওয়া, সেখানে মাটিতে দু'হাতে ভর করিয়া বসিয়া আছে একটি মানুষ। কাছেই, আরও বিস্ময়কর ব্যাপার, পা হইতে মাথা পর্যন্ত ছেঁড়া ময়লা কাপড় ঢাকা একটি ছোট ছেলে কী মেয়ে, শিয়রে একটি তুলসী গাছের চারা, আর নির্বাপিত প্রায় এক তেলের প্রদীপ।

লোকটার মুখে দাড়ি, চোখদুটি লাল, উরু পর্যন্ত পরনে এক কাপড়। শরীরটা এমন যে, কঙ্কালকেই মনে করাইয়া দেয়। আর সামনে ওই মড়া।

রজতের সমস্ত শরীর হঠাৎ এক ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

—দেবতা!

এত রাতে কে এক মানুষ তাকে দেবতা বলিয়া ডাকিতেছে! রজত দাওয়ার একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকে ডাকছো?

—তোমাকে, দেবতা।

—আমাকে কি করে জানলে?

—ওই যে একবার দেখা দিলে দেবতা, খাইয়ে বাঁচালে—

হয়তো কোন দিন চাউল সাহায্য নিয়াছে, কিন্তু রজতের মনে নাই।

চারদিকে মধ্য রাত্রির অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ছম্ ছম্ করিতেছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম?

—ভীম।

ভীমের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াই থাকিতে হয়। রজত তাহার চোখ ফিরাইতে বা কিছু ভাবিতে পারে না।

এমনি বসে রয়েছো কেন ?

যখন-তখন ভীম হাসিতে জানে।—জানো না ? তুমি ভাখোনি ? ভীমের গলার স্বর উঁচু, হঠাৎ সেই কাপড়ে ঢাকা জিনিসটির মুখের কাপড় সরাইয়া ফেলিল, ভাঙা গলায় বলিল, এই ভাখো—

ভয়ে একটা আর্তনাদ করিয়া রজত এক পা পিছাইয়া গেল। কোন মৃতের এমন বিকৃত মুখ সে কখনও দেখে নাই: দাঁত কয়েকটি বাহিরে, নাক অস্বাভাবিক সরু, চোয়াল ভাঙা, চোখ দুটি কতো যে গর্তে ঠিক অনুমান করা যায় না, সাদা পাণ্ডুর মুখ, মাথায় চুল নাই।

শিয়রের কাছে প্রদীপ আর তুলসী চারা বাতাসে মাঝে-মাঝে কাঁপে।

—তোমার ছেলে ?

—হুঁ, দেবতা।

—কখন মারা গেল ? আশ্চর্য, মড়ার কাছেই দাওয়ার এককোণে রজত আস্তে বসিয়াছে।

ভীমের রক্তবর্ণ চোখেও হাসি দেখা দিয়াছে: তিন চার ঘণ্টা আগে।

—কী হয়েছিলো ?

ভীমের এবার ঠোঁট উল্টানো ছাড়া আর উপায় নাই। সে শুধু জানে, মানুষ একদিন মরে, কিন্তু কী হইয়া মরে সে খবর হয় সে জানে না নইলে ভুলিয়া গেছে, জানিয়াও মনে করিতে পারিতেছে না।

এইবারও তাহার লাল চোখে হাসি! বলিল, কে জানে! মা কালীকে কতো জানালাম, ছেলেটাকে ভালো করে দাও মা, সেরে উঠলে যেমন করে হোক তোমাকে কার্তিক মাসে দেবো পূজা, মা, ভালো করে দাও।

এবার দেবতা রাগিয়া গেল, জোরে বলিল, চুপ্, চুপ্, চুপ্।

প্রার্থনা! অজ্ঞাত দেবতার কাছে প্রাগৈতিহাসিক তোষামুদি!

॥ ছয় ॥

রজত চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু অনাথ তো আর তাহার দাঁড়াইতে না পারার কারণ কিছু জানে না, ডাকিল, একটু শুনে যান—

এ লোকটার সাথে পারিবার যো নাই, রজত ফিরিল।

বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস অনাথের আছে; বলিল, ডিসিপ্লিন সকলের আগের কথা, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এর জন্যে ইংরেজ জাত এত বড়, তাদের এত সমৃদ্ধি। আমরা যা এখানে করতে এসেছি, তার আয়োজন খুবই সামান্য, প্রয়োজন অনুপাতে কিছুই নয়। তাই যারা খুব গরিব, যাদের অবস্থা এখন পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট, শুধু তাদেরই মুখে আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে চেষ্টা করবো, এদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত যারা ভালো, যারা মধ্যবিত্ত—তাদের বাদ দিয়ে।

মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মতো কথা। রজত বলিল, আপনি মধ্যবিত্ত কাদের বলেন?

অনাথ আশ্চর্য হইল: বাঃ, তার অর্থ আবার আপনার মতো লোককে আমার বোঝাতে হবে নাকি?

—আচ্ছা, আপনি কেমন করে বুঝবেন কে কে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর?

—কেন, চাল-চলন, জামা-কাপড়। জোরে হাসিয়া উঠিল রজত—মজা মন্দ নয়! আপনার কথামতো বুঝতে হলে আমি এমন লক্ষ লক্ষ লোক দেখিয়ে দিতে পারি যাদের বাইরেটা দেখে মধ্যবিত্ত বলেই মনে হবে, অথচ আসলে গরিব, এমন গরিব যে একবেলা কোনরকমে খেয়ে আবার আর একবেলার চিন্তায় চোখে ঘুম আসে না, দিনরাত বসে বসে কেবল মৃত্যু কামনা করে। তাদের আপনি জানেন না, নইলে এমন কথা বলতে পারতেন না। আপনার মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই, অথচ এসেছেন মানুষেরই কাজ করতে।

এরকম কথায় একটা মানুষ রাগিতে পারে। অনাথও রাগিল, কিন্তু সেটা সম্প্রতি চাপিয়া বলিল, এখন ভেতরের ব্যাপার জানতে গেলে তো আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি সে উদ্দেশ্যের কাজ আর করা হয় না—

—তাই বলুন, জানেন না—সব বুঝি বলে অমন কথা প্রচার করে বেড়াবেন না।

ইহার পরে কি বলা যায়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। অনাথ চারদিকে একবার চাহিয়া বলিল, একটু দাঁড়াবেন? স্নান করবো, কাপড়টা তুলে ফেলে এসেছি, বেশী নয়, আধ মিনিট—

তাহার উৎসাহ দেখিয়া রজতের পাইল হাসি। তাহার তর্ক করার এখন সময়!

কথামতোই অনাথ আসিল, কিন্তু সঙ্গে কাপড় নয়, পনেরো কি ষোলো বছরের মুসলমান ছেলে, চুলগুলি বিশৃংখলায় বড়ো, রোদে লাল, উস্কশুস্ক, চোখ দুটি গর্তে বসা হ্যাংলা, শরীর অনুপাতে পেটটি ভয়ানক বড়ো, বুকের হাড়ের এমন বিকৃত প্রকাশ হঠাৎ দেখিলে ভয় করে। সমস্ত শরীরের মধ্যে কেবল কোমরে কোন রকমে জড়ানো এক টুকরা অত্যন্ত ময়লা গামছা এবং হাতে একটা চিকণ বাঁশের লাঠি।

—স্বীকার করি, বাইরেটা যাদের দেখে ভালো মনে হয়, তাদের মধ্যে আসলে অনেক গরীব কিন্তু—সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া অনাথ বলিল, কিন্তু তারা এর চেয়ে গরীব?

লোকটার কার্যতৎপরতায় আশ্চর্য হইতে হয়। সব ভুলিয়া রজত বলিল, একে কোথায় পেলেন অনাথবাবু?

নিজের প্রশ্নের উত্তর না পাইলে সকলেরই একটা বিরক্তি হয়। কিন্তু সে বিরক্তি প্রকাশ করিবারও অনেক সময় উপায় থাকে না। অনাথ বলিল, ওই তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেটির দিকে চাহিয়া রজত বলিল, তোমার বাড়ী কোথায়?

—শিমুলকোষা।

—সেটা আবার কোন্‌খানে?

ছেলেটি জানাইল, নরেন্দ্রপুরও ছাড়াইয়া।

—এতদূর কেন এসেছো? চাল নেবে? তাহার গর্তে বসা চোখ নিবিড় হইয়া উঠিল।

—একটু দাঁড়াও ভাই, রজত অনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, অনাথবাবু, একে চাল দিয়ে দিন না!

—দেয়ার একটা সময় তো আছে।

—আপনার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ আনবে না, আপনি তো দেয়ার মালিক। রজত হাসল।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মালিক অনাথ ঠিকই।

—মালিক হলেই নিয়ম ভাঙবার কি অধিকার?—ও আর একটু বলুক, এখনই দেখা হবে।

—তবে আমাকেই যেতে হলো, নিয়ম ভাঙতে হলো। রজত যাইতে উদ্যত হইল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার যেতে হবে না—অনাথ নিজেই চলিল।

হাসিয়া রজত বলিল, ভয় নেই, আমি যাব না, আপনি আসুন, আপানার কথার উত্তর দিয়ে তবে যাবো।

অনাথকে স্নান করিতে না হোক, মুখ ধুইতে হইবেই। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওর চেয়ে গরিব?

—ওর চেয়ে না হোক, ওর মতো গরিবও আছে।

—ও কিন্তু দু' দিন না খেয়ে আছে।

—ছোট থেকে বড়ো হয়ে অবধি কেবলি না খেয়ে থাকেনি, মাঝে মাঝে অন্তত জীবনের পথ নিশ্চয় সরল হয়ে আসে। এখন বন্যায় সামান্য কিছু আয়ের পথও বন্ধ এবং তাতে মাথার উপরের আকাশ সব সময়ই রুক্ষ বলে অনেকেই এখন না খেয়ে থাকে। আপনাদের ভাষায় যারা মধ্যবিত্ত তাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা, তাদের গায়েও দক্ষিণের বাতাস এসে লাগে, আবার এমনও হয়, সে-বাতাসও কখন ছুঁচের মতো ফুটে।

—আমার কিন্তু বিশ্বেস হয় না।

—যে কোন জিনিসের ওপরই হোক, তাতে বিশ্বেস রাখা কি এতই সোজা? আপনার কেমন করে হবে? রজত বলিল, এখন গরিব তবু হাত পাততে পারে, ভিক্ষে চাইতে পারে, আর শহরে পারে ফিরি করতে; কিন্তু ভদ্দর-লোক যারা, তারা কি ভিক্ষে করতে, ফিরি করতে পারে? পারে না। ওদিকে ভদ্দরলোকি ঠাঁটও রাখতে হবে বজায়, জামা জুতো পরতে হবে, সামাজিক হতে হবে—

॥ সাত ॥

ভদ্দরলোকি ঠাঁট বজায় না রাখলেই হয়।

রজতের এবার রাগ হইল: এগুলো বলতে সোজা। ধরুন, আপনি খুব গরিব হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আপনার বাবা, কি ঠাকুরদা, কি তারও ওপরে, তাদের অবস্থা ছিল ভালো, ছিল ভদ্রত্বের ছাপ, তাহলে আপনি কি দুদিন না খেয়ে থেকেও পারেন কারুর কাছে সোজাসুজি ভিক্ষে চাইতে? পারবেন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে দিয়ে খালি গায়ে মোট বইতে? এমনকি নিতান্ত যারা

ভালোমানুষ, তারা চুরি করতেও তো জানে না—কারুর অন্যায় বলে বাধে, কারুর ইচ্ছে থাকলেও ধরা পড়বার ভয়ে বাধে। ভদ্দরলোকি ঠাঁট বজায় না রাখলেই হয়। ভদ্দরলোকি না বাঁচিয়েও খেটে পয়সা পাওয়া যায় দেবেন এমন উপায় বাৎলিয়ে? রজতের গলা কাঁপিতেছিল, চোখ জড়াইয়া আসে, বুকের কাঁপুনি দ্রুত। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—শুনুন!

—অনাথবাবু, অনুরোধ করছি, এখনকার জন্যে অন্তত: রেহাই আমাকে দিন, আমি দাঁড়াতে পারছিনে।—রজত আর দাঁড়াইল না।

অনাথ সেদিকে কতোক্ষণ চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাঁটু পর্যন্ত জলে হাত দিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে ভাবিল; রজত যে একটা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়, এটা সে আগেই জানে, এই অপমানে তাহার কী আসিয়া যাইবে?

দূর! ভুল। অপমান নাকি বলে ইহাকে? একটা তর্ক ছাড়া আর কী? মুখ ধুইয়া অনাথ উঠিয়া আসিল।

ভরা দুপুরের রৌদ্র মাথায় করিয়া জল, কাদা, অথবা শুকনো পথ দু'পায়ে ভাঙিয়া যে কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, একটিবার হইলেও জলতৃষ্ণায় তাহার বুক শুকাইয়া আসে, ইহা তো জানা কথাই, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার নেশা, কেন কে জানে! মাঝে মাঝে এ পথকেই হারাইয়া ফেলে, তবু এই পথেরই জন্য মায়া অপরিমিত।

বিশেষতঃ সাতগাঁ যাইতে যে পথ, সেখানে অনেক কিছু চোখে পড়ে, যাহা গভীর তীব্রতায় সে অনুভব করে, এমন অনেক দেখে। ভুর ভুর বুনো জলের গন্ধ নাকে আসিয়া লাগে, যে গাছ ডুবিয়া আছে জলে তাহার জন্য মায়া হয়।

সকলেই দেখে, পথ পরিক্রমায় আকুল এক প্রাণ, কেবল ঘুরিয়া বেড়ায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কেন?

পচা পাঁকের গন্ধও যেন রজতের ভালো লাগে, আশ্চর্য, নিঃশ্বাসে নিবিড় হইয়া সে তাহা শুঁকে। দূরের দিকে চাহিয়া সে ভাবিয়া আকুল হয়: এই তো আমার প্রাণ, ভারতবর্ষের বুক!

কিন্তু এক সময় নিঃশ্বাস আবার শুকাইয়া যায় যেন, বুক কাঁপিয়া ওঠে, সে দেখে পাঁক, তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে: এমন অযাচিত হয়ে কেন আস, আমি তোমারও নই, ভারতবর্ষেরও নই!

নির্মম সত্য! রজত দ্রুত হাঁটিতেছে।

পথের ধারে এক জায়গায় একটি গাছের ছায়ায় প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকে একটি মেয়ে। রজত তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ভরা, গোল মুখ, ছোট চোখ, মাথায় একরাশ চুল, হাতদুটি খালি, মসৃন—বিধবা না কি তাহা কে বলিবে? সেদিনও রজত দেখিয়াছিল তাহাকে—অলসভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

রজত নীচের দিকে চাহিয়া চলিতেছিল।

—এই, এই—

কাহার ডাকে সে ফিরিয়া চাহিল।

—তোমাকে ডাকছে গো, ওই যে ওখানে—একটি ছোট ছেলে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া পিছনের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিল।

—তোমাকে ডাকে। ইহাতে কে না আশ্চর্য হয়!

—কে, বলো না?

ছেলেটি কিছু না বলিয়া কেবল আঙ্গুল দেখাইয়া দিল। অশেষ কৌতূহলে অবশেষে রজত তাহার পিছন ধরিল। গিয়া দেখিল, সেই মেয়েটি!

ফুলদিদি, এখন কি দিবি বল্?

—ওমা, এই নাকি আমি ডেকেছিলাম, দুর দুর—

—মেয়েটি লজ্জায় লাল হইয়া আঁচল মুখে চাপিয়া সেখান হইতে দৌড়াইয়া পালাইল।

অবাক রজত কমই হয়। সে হাসিতে লাগিল।

তারপর একদিন। ভীষণ তৃষ্ণা পাইয়াছে। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অর্থহীন কথার মতো সে ঘুরিতেছিল। এক জায়গায় একটা উঁচু জায়গায় কয়েকটি লোক বসিয়া আছে। ইচ্ছা করিয়াই সেখানে রজত গেল। বলিল, জল খাওয়াতে পারো একগ্লাস?

একটি লোক, বয়স খুব বেশী নয়, পরণে হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়, খালি গা, কিছু দূরেই জলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, ওই তো কত জল। ওতেও তেষ্টা মিটবে না গো?

সকলে হাসিয়া উঠিল।

একজন বলিল, জমিদার বাড়ী যাওনা গো? দু'পা গেলেই তো হয়। শুধু জল নয়, সেখানে আছে মণ্ডা-মিঠাই, পোলাও-মাংস—সে কতো, কাঁড়ি-কাঁড়ি লোক আসছে, জন আসছে, হাসছে, খেলছে, হাওয়া করছে, অত-অত খাচ্ছে, গান বাজনা হচ্ছে, সেখেনে যাও না, আধলা চাইতে আধুলি পাবে, জল চাইতে

পাবে মিষ্টি, সে কি মজা! পেটপুরে খাবে আর গান শুনবে—

ফুল দাঁড়াইয়াছিল, বাবার ডাকে হঠাৎ খেয়াল হইলে আঁচল উড়াইয়া চলিয়া গেল।

তামাক খাওয়ায় পঞ্চুর নাম। পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া তাহা রজতের কাছে আনিয়া হাসিয়া ধরিল।

—না, না, আমি খাইনে—

পঞ্চুর সামনের দাঁতকয়টি নাই, সেই মুখে হাসি দেখা দিল।

—তোমার কে কে আছে পঞ্চু?

—ওই এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই—ফুল, ও ফুল,—ত্মাখো জল আনতে নাকি এত দেরী লাগে!

রজত না হাসিয়া পারে না: ফুল! কেমন সুন্দর নাম! হয়তো সবটুকু নাম ফুলবালা কিংবা ফুলময়ী, অথবা ফুলবতী; ফুলবতীই বেশ ভালো!

জল হাতে ফুল ধীরে ধীরে আসিল।

পঞ্চু বলিতেছিল: এই আমার মেয়ে, ওই আমার ঘর, সে ঘর ভেঙে ভেঙে পড়ে কিন্তু আমরা ভাঙিনি বাবু, এখনও ভগবানের দয়ায়, এই অকালেও খেয়ে বেঁচে আছি।

রজতের হাসি পাইল—তবে ঘর কেন ভেঙ্গে পড়ে? কেন বাঁধছে না?

পঞ্চু মেয়ের দিকে চাহিল, তারপর কী যেন কতোক্ষণ ভাবিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল: এইখেনেই তো মজা। ঘর বাঁধবার মানিক যার আছে, ঘর তার বাঁধা হয় না। যার নেই, তার বাঁধতে হয়।

মেয়ের মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে সে খুব আশ্চর্য হইয়াছে; হয়তো এরকমভাবে অভ্যস্ত।

পঞ্চু বলিল, দেশের যে অবস্থা তা তো তুমি দেখেছো বাবু? মাটি তো জায়গায়ই দেবে না, আকাশ যেন ভেঙে পড়তে চায় মাথায়, শুধু প'ড়ে থাকার জায়গার পর্যন্ত অভাব! এই মরার সামিল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াতো ভালো, কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এদের আমার যতটুকু সাধ্যি তার চেয়ে আর বেশী কি করতে পারি বলো?

রজত এবার গভীর স্বরে বলিল, তখন অন্যের থেকে নিতে হলেও আমাকে বাঁচতে হবে!

পঞ্চু এখন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার দিকে না তাকাইয়া পারে না। তবু

বলিল, সেটার নাম যে চুরি!

—হোক্ চুরি!

—আর একজন মারা যাবে?

—যাক মারা। রজত আরও বাঁকিয়া অস্বাভাবিক স্বরে বলিল, তবু তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও, কি বলো?

—তুমি কে? পা হইতে মাথা পর্যন্ত ভালো করিয়া পঞ্চুর তাকাইতে হয়।

—আমি সাধারণ মানুষ পঞ্চু, আমি অতি সামান্য মানুষ। রজত স্নিগ্ধতায় বলিল, আচ্ছা পঞ্চু, একটা কথার উত্তর দেবে, এই অবস্থার জন্যে কাকে তুমি দোষ দাও?

—দোষ আবার কাকে দেবো, যে কষ্ট পায় তারই দোষ। আর ওরা তো বলে অদেষ্ট, আমি বলি, এগুলো আগের জনমের কর্মফল, যে যেমনি কাজ করে এসেছে, তার তেমনি ফল। পঞ্চু বুড়া মানুষ, যাহা বলে তাহা গভীর জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা হইতেই বলে; স্থির নিশ্চয়তার সহিত সে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার চেয়ে বেশী আশা রজত করিতে পারে না। এখন চাহিয়া দেখিল, দীর্ঘ পথ, কোথায় শেষ হইয়াছে কে জানে। এই পথের প্রান্তে পৌছিতে অনেক সময় লাগিবে।

রজত মাটিতে আঙুল ঘষিতে লাগিল, তাহার বুকে আগে ঝড় বহিয়াছিল, এখন কাঁপিতেছে, তাহার চোখের দৃষ্টিতে আগে বহ্ন্যুৎসব হইয়াছে এখন অর্থহীন।

সে বলিল, আমি যাই পঞ্চু।

—আমিও যাবো, দাঁড়াবে?

সমবোধের এই প্রকাশটুকু অন্য সময় শুনিলে রজত নিশ্চয় খুশী হইত। এখন অন্যমনস্কভাবে বলিল, দাঁড়াবো। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো পঞ্চু, এই অবস্থার মূলে অদৃষ্টও নয়, কর্মফলও নয়।

রজত সেখান হইতে উঠিয়া আসিল এবং সেই গাছের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল মেয়েটি যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধি যাহার সে তারক বিশ্বাস। জমিদারী পদবী নাই কিন্তু জমি জমা আর মাছের ব্যবসা করিয়া লোকটা টাকা করিয়াছে খুব।

তাহারই কাছে প্রিয়নাথ আজ চলিল। এতবড়ো গাঁয়ে একটা সামান্য পাঠশালাও নাই, আশ্চর্য ব্যাপার। তাই একটা প্রাইমারী ইস্কুলের পরিকল্পনা হইয়াছে, অবশ্য প্রিয়নাথই সেটা করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত সে সেটা টিঁকবে এ বিশ্বাস তাহার নাই, তবু চলিয়াছে চেষ্টা করিয়া দেখিতে। অদ্ভুত গাঁ, দ্বিতীয় এমন লোক নাই যাহার কাছে আর্থিক ব্যাপারে না হোক, উৎসাহ অন্ততঃ পাওয়া যাইবে, তবুও প্রিয়নাথ তো ইহার পিছনে লাগিয়াই আছে।

বলিল,—আমি না খেয়ে মরবো তোমরা বলো? পাটের দর কম, আর ধান ষাট মনের জায়গায় দশ মন পাওয়া গেছে, এর জন্যে আমি দায়ী? জলে তোমাদের যা ক্ষতি, আমাদেরও তাই, বরং আমাদের আরও বেশী কারণ ভগবানের আশীর্বাদে, জমি তো আর অল্প নয়! কাজেই ক্ষতিটা তোমাদের চেয়ে বেশীই হবে, ধারণা করতে পারো। আর জমিরই বা কী অবস্থা সে তো তোমরা জানো। কিন্তু উপরওয়ালা তো আর সে কথা বুঝবে না, তাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতেই হবে। আমি কী করি? আমি না খেয়ে মরবো তোমরা বলো?

তারক বিশ্বাস না খাইয়া মরিতেছে!

ঘণ্টা দুই আড়াই পরে ঘর পাতলা হইল। প্রিয়নাথ মুখ তুলিয়া চাহিল।

—প্রিয় নাকি হে, কখন এলে?

—অনেকক্ষণ এসেছিতো। প্রিয়নাথ সত্য কথাই অনেক কষ্টে বলে।

—অনেকক্ষণ? আমি লক্ষ্য করিনি তাহলে!

প্রিয়নাথ হাসিল।

—তারপর কিসের জন্যে?

তারক বিশ্বাসের মস্ত বাড়ী; চারদিকে দেওয়াল। বাহিরে বৈঠকখানা, সেখানে উঁচু চৌকিতে ফরাস পাতা, তাকিয়া ঠাসা, প্রজাদের জন্য মেঝেতে বাঁধানো কাঠের টুক্‌রা।

বৈঠকখানা সেদিনও লোকজনে ভরা। প্রিয়নাথ গিয়া ফরাসেরই এক কোণে বসিল। তারক বিশ্বাস এখনও পূজার ঘর হইতে আসে নাই। সকলে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। প্রিয়নাথও বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তারক বিশ্বাস আসিল—খাটো, শরীরের চামড়া শিথিল, চুল পাকা, মাথায় টাক, এখন সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে, এই মনে করা

যাইতে পারে। চারিদিক হইতে রব উঠিল সেলাম, সেলাম, নমস্কার, নমস্কার।

তারক বিশ্বাস তাহার বিশিষ্ট আসনে গিয়া অতি আয়াসে এবং আরামে বসিল।

—সেই যে ইস্কুলের ব্যাপারটা—

—ও, তা কোথায় করবে ঠিক করেছো?

তাহা প্রিয়নাথ হয়তো একবার বলিয়াছে; আশ্চর্য হইয়াও সহজ সুরেই সে বলিল, আপনার কাছেই তো সেজন্যে ঘর চাইছি, আর সেদিন বলেছিলাম—

—আমার এখানেই শেষে ঠিক করলে? দু'একজন লোক যাহারা তখনও ছিল তারক বিশ্বাস তাহাদের দিকে একবার চাহিল।

—আপনি ছাড়া আর কে-ই পারে বলুন!

—বেশ, বেশ। তারপর?

মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া প্রিয়নাথ বলিল, আর সেদিন যে বলেছিলাম, মাসে-মাসে আপনার আর্থিক সাহায্য কিছু চাই।

—সেকি, সেখানেও জড়িয়েছো আমাকে?

তারক বিশ্বাস আবার অবশিষ্ট লোকগুলির দিকে চাহিল, হাসিয়া হাসিয়া বলিল, কোনখানেই রেহাই নেই যেদিকে যাই সেদিকেই দেখি—এই তো সেদিন গিয়েছিলাম এক কাজে মামুদপুর, বন্যা সাহায্য সমিতি না কী সমিতি এসে ধরলে, চাঁদা চাই। আর কি, দিতে হলো, কতো যেন নায়েব মশাই?

নায়েবের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। নায়েব কর্তার দৃষ্টিতে কোন্ মনোভাব যেন বুঝিয়া বলিল, আজ্ঞে, কুড়ি টাকা।

—এই ছাখো এত নিলে তবে ছাড়লে। আমাদের গাঁয়ে যে দল এসেছে—

কি মনে করিয়া প্রিয়নাথ উৎকর্ণ হইয়া কাঁপিতে থাকিল যেন।

—আমাদের গাঁয়ে যেটা এসেছে সেটা আমার কাছে আসেনি। তারা নাকি শুধু চালই দেয়। কথায় বলে, মার পোড়ে না, পোড়ে মাসীর। বাইরে থেকে অমনিই মনে হয়, কী না হয়েছে! আর আমরা এখানে থেকেও কিছুই জানি না! আরে বাপু ওদের ক্ষুধা কি কখনও মিটবে? এ ক্ষুধা চিরকালের আমরা দেখিতো! দুদিন নয় একটু কষ্ট—সে কষ্ট আমাদেরও ভুলেও ছাড়বে না—তার পরেই তো আমরা আছি ঠেকে, ডেকে মাঠের কাজ করাবো, মজুরি দেবো, বেশ খাজনা পত্তর না দিয়ে খাবে আর গান গাইবে। এ ছাড়া

আর কী, কি বলেন চক্কোত্তিমশাই ?—চক্রবর্তী সানন্দে সায় দিল। প্রিয়নাথ কী বলিবে ?

তারক বিশ্বাসের নজর সব দিকেই আছে। বলিল, তারপর কতো দিতে হবে বললে না ?

এতটা ভাবিতে পারে নাই প্রিয়নাথ ; আবার যেমন করিয়াই হোক হাসিয়া বলিল, সেটা পরে বলবো'খন।

তারক বিশ্বাস অন্যের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ বসিয়া আছে ; এমন একটা প্রচেষ্টার এই সহজ সাফল্যে খুব আনন্দ যদি হয় তবে নূতনের কী আছে ? সে বসিয়াই থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে আবার দৃষ্টি পড়িল : তুমি এখনও বসে ? ও, তোমার সঙ্গে, একটা কথা ছিল, শুনে যাও।

তারক বিশ্বাস তাহাকে নিভৃতে লইয়া গেল। প্রিয়নাথ আত্মগৌরবে আর বাঁচে না।

তারক বিশ্বাস বলিল, এসব কি কখনও হয় ? হয় না। ওদের পড়িয়েই বা লাভ কী, আর পড়েই বা কী ওরা করবে ? তোমাকে আসল কথাটা বলি, কাউকে বলো না যেন। ওরা লেখাপড়া শিখলে আমাদেরই ক্ষতি, তুমি আপনার মানুষ, বলতে বাধা নেই, আমাদের অনেক কারসাজি তাহলে ধরে ফেলবে। আমি দেখেছি, দু' একজন যারা একটু কলম ধরেছিলো তাদের নিয়ে মুস্কিল। কী হবে এসব করে, আমাদের পথেই কাঁটা ! আর বছরের হালচালতো জানো, ঘরই বা কোত্থেকে দিই, আর টাকাই বা কোত্থেকে পাই ?

তারক বিশ্বাস আবার আগের জায়গায় আসিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিল, একটা ইস্কুলের দরকার হয়ে পড়েছে বটে। লোকেই বা কী বলবে, আমাকে তো ওরা জানে—

আর প্রিয়নাথ, সে যে এমন একটা বিস্ময়ের ঢেউয়ে পড়িবে, এটা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মাথা নীচু করিয়া চুপচাপ সে চলিয়া আসিল।

হয়তো এখন দুইটা কি আড়াইটা বাজিয়াছে। রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতে চায়।

॥ আট ॥

—কোথায় যাচ্ছেন?

—রজত? প্রিয়নাথ অত্যন্ত খুশী হইয়া গেল।—তুমি এ পথে কেন?

রজত হাসিয়া বলিল, আমি পথেই থাকি! ঘর আমার ভালো লাগে না।

কতোক্ষণ আগের সমস্ত কুশ্রীতা প্রিয়নাথ এক মুহূর্তে ভুলিয়া গেল। হাসিয়া বলিল, ঘর যাদের ভালো লাগে না তাদের কী নামে ডাকবো? তুমি যাযাবর?

রজত কী যেন ভাবিয়া বলিল, সম্প্রতি যাযাবরই বটে।

—তাহলে তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো চলো? প্রিয়নাথ তাহার হাত ধরিল।

রজত আবার হাসিয়া ফেলিল। বয়সের পার্থক্য ছাড়াইয়াও এক অনুপম ঘনিষ্ঠতাবোধ জন্মিয়াছে এই লোকটির সাথে, ইহা মনে করিয়া তাহার মুখ স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিল।

বাড়ীর কাছে প্রথমে দেখা গেল নারায়ণকে; কিসের আশায় জল ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রিয়নাথ আর রজতকে দেখিয়া ভয়ানক খুশী হইয়া বলিল, কোথায় ছিলে বাবা? আমি তো তোমাকেই খুঁজছিলাম।

—এই জলের মধ্যেই বুঝি আমি হারিয়ে গিয়েছি? দুষ্টু! খালি রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানো।

নারায়ণ লজ্জায় দৌড় দিল।

প্রিয়নাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, সেই গল্পের মতো আর কি! বলে নারকেল গাছে উঠেছো কেন? ঘাস আনতে। বলে, নারকেল গাছে আবার ঘাস পাওয়া যায় কখনও? তাইতো নেমে পড়েছি!

দাওয়ায় উঠিয়া রজত প্রথমেই খুঁজিল এই নারায়ণকেই।

কিন্তু তাহার বদলে দেখা দিল মালতী।

—নারু কোথায় গেল?

মালতী হাসিয়া বলিল, এইতো সব খবর রটিয়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

—কিসের খবর ?

মালতী জলের দিকে চাহিয়া হাসিল।

—ও, আমরা যে এসেছি, এই খবর ? দূতের মতো রটাচ্ছে বুঝি!

এমন সময় পিছন হইতে আসিয়া ধরিল নারায়ণ। বলিল, চলুন তো ?

—কোথায় ?

—আগে চলুন না ?

রজত তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, তার আগে তোমাকে একটা কথা বলবার আছে শোন ?

—আগে চলুন, ভারি মজা! ঠাকুরমা বিশ্বেস করতে চায় না, আপনি এসেছেন! দিদিটা প্রায়ই ফাঁকি দেয় কিনা!

মালতী লজ্জায় দৌড়াইয়া পালাইল।

রজত সেই দিকে চাহিয়া কী ভাবিয়া বলিল, চলো।

দয়াময়ী রোজকার জায়গায় বসিয়াছিল। সেখানে গিয়া চেঁচাইয়া নারায়ণ বলিল, দিন কী দেবেন ঠাকুরমা, এই যে নিয়ে এসেছি ধরে।

ভাল করিয়া সব দেখিল দয়াময়ী; তারপর কী বলিতেছিল, মাঝখানে নারায়ণ আবার বলিল, দিন যা দেবেন। এই যে এইটে দেবো, এইটে—একটি শিশুর মতো দয়াময়ী ত্রস্তে বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া 'কাঁচা কলা' দেখাইয়া দিল।

রজত হাসিতে হাসিতে আর বাঁচে না। এমন যেন কখনও দেখে নাই।

নারু রাগিয়া বলিল, বুড়ী, বুড়ী তো।

সেদিকে কান না দিয়া, দয়াময়ী বলিল, নরু এসেছিস ? আয়।

রজত কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—বোস না ? দেখি তোর হাতটা—দয়াময়ী তাহার একটি হাত লইয়া বলিল, ইস্ একেবারে চাষার মতো হাত, কী শক্ত! তুই একটা চাষা নরু!

—তাই ভালো ঠাকুরমা, তাই ভালো! রজত হাসিয়া বলিল। সে যেন এই কামনা করে।

দয়ময়ীর মনে খটকা লাগিল: কী ভালো ? চাষা হওয়া ?

তাহার কাছে না বলিলেও চলিত। আর লাভই বা কী, তবু রজত বলিল, হ্যাঁ।

—ষাট, ষাট। রাজা হ' ভাই, রাজা হ'।

—না ঠাকুরমা, রাজা হয়ে কাজ নেই, কেবল গরিবের টাকায় রাজভোগ খাওয়াত, সোনার পালঙ্কে ঘুমানো, ঘুমের ওপর ঘুম, আর স্বপ্ন দেখা!

না ঠাকুরমা, অমন সুখে দরকার নেই। রাজারা না খেটে আরাম করে। পরের রক্ত জল করা পয়সার ওপর বসে দিনকে রাত করে।—রজত তাহার মনের কথাটি কাউকে 'এ পর্যন্ত' বলিতে পারে নাই, কেবল নীরবে দেখিয়াছে।

কিন্তু দয়াময়ী অন্য কথা শুনিলে তো! সে এখনও আশীর্বাদই করিয়া চলিয়াছে।

এমন সময় ঘরে ঢুকিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া লীলাবতী যেন একটা হঠাৎ-আলো চোখে পড়ায় ঝাপসা দেখিল। নরুকে তাহার কী প্রয়োজন ছিল কিন্তু ডাকিল না।

তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে রজত বলিল, এই চোর, চোর—

—বারে, তাহলে কি চোর হলো?

এমন কথায় সকলেরই হাসি আসে। সে যে স্বীকারই করে।

এই আবহাওয়ায় মানুষ কি করিয়া থাকে? নারায়ণ জোর করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু রজত তাহাকে তেমনি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পালিয়ে কোথায় যাবে বাপু, দাঁড়াও। আরও অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে—

—অন্যখানে গেলেই তো হয়—

তাহাকে তেমনি ধরিয়া রজত বলিল, আচ্ছা, তোমার বয়স কত?

—নয়।

—বেশ। নয়। তাহলে তুমি এতটুকু ছেলে। কিন্তু এই ছেলে আবার বড়ো হবে। যখন আমাদের মতো বড় হবে—এই লম্বা, এই বুক, এই হাত, হাতের কব্জি—রজত হাত দিয়া দেখাইল—তখন আমি এখন যা দেখতে পারি, যা বুঝি, তা দেখবে তা বুঝবে তো?

নারু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যেন প্রিয়নাথকে উদ্দেশ্য করিয়া রজত বলিল, আমি অনুভব করছি, আমাদের হাত—পায়ে সোনার শিকল, এক পা চলতে গেলে হেঁচকা টান পড়ে। আমি অনুভব করছি, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আর একজন করে খেয়ে মোটা হচ্ছে, আমাদের দশজনের পরিশ্রমের ফলকে একজন উপভোগ করছে, মোটর দৌড়াচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে। আমাদের হাতে একটু প্রসাদেরও বেলায় ভাঁড়ার ঘর শূন্য, আমি দেখতে পেয়েছি, একজন দশ রাজার চেয়ে

বড়ো, আর দশজন বয় বোঝা। আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব—

প্রিয়নাথের মুখ নীচু হইয়া আসিল যেন! চোখ কেমন করিতেছে!

রজত বলিতেছে: আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব। একটা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আমাদের জীবন। আমাদের খাবার—ভাত আর গাছের পাতা—না জুটলে কিছুই নয়, তাই আমাদের অসুখের সীমা নেই। ডাক্তারের দেখা নেই। আমরা ডাক্তার দেখাতে পারিনে। আমরা খেটে দাম পাইনে। অন্যে খাটলে তার চতুর্গুণ দাম দিতে হয়। আমরাই সমাজের জীবন, অথচ ওরা বলে আমাদেরই প্রাণের দাম নেই। আমরাই তৈরী করি ছায়া, কিন্তু ছায়া পাইনে। একের বিলাসে ভুয়ে মরি—আমি অনুভব করছি, আমরা গরিব—

অনুভব করিয়াও নতুন কথা শুনিতেছে লীলাবতী।

রজত বলিতেছে, আমরা খাবার সাজাই, খেতে পারিনে। রক্তের দুধ দিয়ে পুকুর কাটি, চান করে রোমের রাণী। আমরাই করি বাগান, ফুল লুটে নেয় আর একজনে—

প্রিয়নাথের মুখ আরও নীচু হইয়া আসে যেন।

দু'হাতে নারুর মুখ ধরিয়া রজত বলিল, নারু বড়ো হলে ঘুমিয়ে থেকো না। ঠিক এরকম অনুভব করবে তো? মার খেয়ে আরও মার খেতে পড়ে থেকো না, জাগিয়ো, প্রতিবাদ করো। মনে রেখো, যা পেয়েছি তাই ঠিক পাওয়া নয়, তার চেয়ে বেশী পেতে পারি—তা' না হলে একজন যেকোন-ভাবে হয়ত লাখ লাখ টাকা উপার্জন করলে, আর তার মরবার পর তারই ছেলে বসে-বসে সেই টাকা সারাজীবন খেলো। এটা কি ঠিক পাওয়া? ছেলে তো এতটুকু পরিশ্রম করেনি যে অত টাকা বসে-বসে খাবে? এখানে কোন্ নীতি আর রীতি?—আসলে প্রিয়নাথকেই বলিতেছিল রজত—কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমরা গরিব বলে কিছুই কামনা করতে পারিনে, কিছুই চাইতে পারিনে, এমন নয়, যা পেয়েছি এই পাওয়া ছাড়া আর কিছু পেতে পারিনে এমন নয়, আমাদের চুপ করে থাকা অন্যায়, বোকামি! আর একজনের অন্যায় চাপে পিষে মরে যাচ্ছি তবু প্রতিবাদ করিনে, এর মতো বোকামি কী আর আছে বলো?

প্রিয়নাথ মুখ নীচু করিয়াই রহিল; তুলিলে হয়তো বোকামিই ধরা পড়িবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তারক বিশ্বাসের কথা তাহার মনে পড়িতেছে না। কারণ খুঁজিলে এই পাওয়া যাইতে পারে, রজত যাহা বলিয়াছে তাহা

ভয়ানক অনুভব করিয়াও তাহা যুক্তি দিয়া আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিতে বা জানাইতে প্রচুর অক্ষমতা, স্থবির পারিপার্শ্বিকতায় এই অক্ষমতার জন্ম; শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার অভাবে দৃষ্টি স্বল্পতাই ইহার পরিণতি। অথচ দুঃখের সীমাহীনতার অনুভূতি থাকে অবিচল।

রজত ইহা জানে। তবু বলিতেছে প্রাণের তাড়নায়, বিরাট সম্ভাবনার আশায়।

মালতীর কি ভালো লাগে? রজত কুমার কী বলিতেছে? তাহার চোখে ছায়া; মালতী সে ছায়া দেখিয়াছে।

তাহার চোখে আলোর কণা; মালতী সে আলো দেখে নাই।

লীলাবতীর প্রতিবাদহীন প্রকৃতি, সে চুপ করিয়াই রহিল।

ইতিমধ্যে সহজ হইয়া নারায়ণ টানাটানি করিতেছে: চলুন না—

রজত কী ভাবিতেছিল।

—চলুন না—

চমক ভাঙিল রজতের: কোথায় নারু?

নারায়ণের হঠাৎ কী খেয়াল, বলিয়া ফেলিল: পাতালপুরী!

—ওরে বাপ্‌রে, সেখানে যে অনেক অন্ধকার!

আবার ভাবিয়া একটু পরে নারায়ণ বলিল, স্বর্গ!

—সেখানে সকল সময়ে আলো, শুধুই আলো—আমার পছন্দ হয় না। আমি অত আলো সইতে পারিনে। আমার চোখে ভারি লাগে। আমি সেখানে যাবো না।

হতাশায় নারায়ণ আর কী বলিবে?

রজত একটু পরে বলিল, এই পৃথিবীই তো ভালো। এখানে মাটির ঘাস আছে। সোনার পালঙ্কও আছে—এই পৃথিবীই তো ভালো?

—তাহলে সেখানেই চলুন?

রজত একটি ছোট ছেলে হইয়াছে যেন; মাথা নাড়িয়া সে তাহার সহিত চলিল।

লীলাবতী একটু স্নিগ্ধ হাসিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। প্রিয়নাথের খাওয়া এখনও হয় নাই।

শ্রবণ শক্তিতে অক্ষমতা দয়াময়ীর ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি শক্তিতে অনেক তীক্ষ্ণতা। রজতকে ধরিয়া ফেলিল।

—নরু আয়। কেবল পালিয়ে বেড়াস কেন?

নারায়ণের বিরক্তির আর সীমা নাই।

দয়াময়ী বলিল, তুই যা-না ছোঁড়া, তোর এখেনে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?

—বুড়ী! অস্ফুটে উচ্চারিত হইল।

—সাতগাঁতে গিয়েছিস আরও?

—না, সে পথে যেতে মানা করেছেন আপনিই!

—বোকা, এ ছাড়া আর পথ নেই বুঝি? বৌ, বৌ—বোস একটু, আমি এখুনি আসছি—দয়াময়ী একান্তই কী একটা কাজের তাড়ায় উঠিল।

—পালিয়ে আসুন, নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলিল, পালিয়ে আসুন, এখুনি আবার আসবে বুড়ি, সারাদিন কেবল বক্‌বক্‌—আসুন—

রজত হাসিয়া তাহার হাত ধরিল।

একটু যাইয়াই হঠাৎ থামিয়া নারায়ণ বলিল, পায়রার জন্যে ঘর বানিয়েছিলাম তারপর বাঁশ গেড়ে বাবা তার ওপর সেটা তুলে দিলে, আমি দিয়েছি খাবার, বক্‌বকম শব্দ—করে সে কি খাওয়ার ধুম।

দেখা গেল, চারিটি উঁইপোকায় কাটা বাঁশ অতিকষ্টে শীতের গাছের মতো দাঁড়ানো।

—তারপর?

—এখন দেখছেন তো ঘর ভেঙেছে আর কতদিনই বা টিঁকবে?

—পুরনো জিনিস একদিন ভাঙবেই।

—ভয়ানক পুরনো। আমি বানাতে দেখিনি।

—তুমি এতটুকু ছেলে, তুমি কী দেখবে?

বয়সের স্বল্পতা হেতু অবজ্ঞা নারায়ণের অসহ্য। বলিল, আপনি খুব বড়ো তাই অহঙ্কার, না?

—অহঙ্কার নয় কেন, হিংসে হয় বুঝি? হাসিতে হাসিতে রজত বলিল, তারপর সেগুলোর কী হলো?

—পায়রা? এখন কোথায় উড়ে উড়ে বেড়ায় কে জানে? রাত কাটাতে কোথাও থাকে নিশ্চয়। আমি দেখেছি দেয়ালের ফাকে—আর দিনের বেলায় উড়ে বেড়ায়। বাবাকে কত বলি একটা ঘর বানিয়ে দিতে—মরবে, এ্যাদ্দিনে মরে গেছে, মরবে না, একটুও খাবার পেলেতো? কে দেবে খাবার? হুঁ—

কয়েকটি পাখির ঘর ছাড়ার বেদনায় ভারী হইয়া আসিয়াছে ছেলেটির মুখ।

—ওরা নিজেরাই জোগাড় করে খায়, কারুর দিতে হয় না নারু।

—আপনি ছাই জানেন! ওরা কোত্থেকে খাবে! সামনে না দিলে, ছড়িয়ে না দিলে? ওদের ভাষাও তো আমরা তেমনি বুঝিনে।

—কেন বুঝিনে? নারু কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

—ওরা লিখতে জানলে তো? মানুষও একদিন এমনি লিখতে জানতো না—

—ভারি মজাতো। সেটা কবে?

—সে অনেক আগে, কতো হাজার বছর হবে কে জানে! তখন মানুষ একদম লিখতে জানতো না। আস্তে আস্তে লেখা তৈরী হলো। সবাই তা পড়তে শিখলো। তুমি যেমন ইংরিজী বাংলা পড়ো!

এইবার খুশী হইয়া নারায়ণ বলিল, আপনার পড়া হয়ে গেছে?

—দূর! পড়া কারুর শেষ হয় না, কেউ সারা জীবনে শেষ করতে পারে না।

নারায়ণের চোখ কপালে!—সারা জীবন! তাহলে ওই যে পাশ করে, তখন পড়া শেষ হয়ে যায় না?

—না।

বিস্ময়ে সে অবাক হইয়াই থাকিত যদি না এমন সময় হঠাৎ একটি পায়রা কাছেই সুন্দর শব্দ করিয়া উঠিত।

রজত দেখিল, সেটা বুনো জাতের পায়রা, কেউ পোষে না; তবু নারুর চোখে কাতরতার সীমা নাই, কেমন করিয়া উঠিল যেন তাহার মনটা। তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চলো, আর কী দেখাবে বললে?

কিন্তু বলিয়াই পরক্ষণে মনে হইল, কী দেখিবে আর, নারুর সব ভাণ্ডারই যে শূন্য!

—চলো নারু?

আর এক জায়গায় নীচু একটি মাটির ঘর, হাঁসের; কিন্তু এখন খালি।

সেই শূন্যতা!

নারায়ণ বলিল, ছ'টা হাঁস ছিল, একেকটি করে সব ক'টি শেয়ালে খেয়েছে।

—কি বলো!

—এখানে এমনি হয়। শেয়ালগুলো ভারি পাজী! আরও তো কতো

কিছু খাবার আছে, সেগুলো খানা রে বাপু! শুধু আমাদেরটাই নয়, এখানের সকলেরটাই খেয়ে ফেলে, তবু সাধ মেটে না। আচ্ছা হাঁসগুলো উড়তে জানলে বেশ হতো, না? আচ্ছা, পাখা তো আছে, তবু উড়তে পারে না কেন ওরা?

—শরীর যে ভারী, পাখা ছোট।

—উড়তে পারলে বেশ হতো কিন্তু, শেয়ালগুলো ধরতে এসে হাঁ করে থাকতো! হাঁসরা দেখতো মজা! কী পাজী, ছ-ছ'টা হাস খেয়ে ফেললে!

—কতক্ষণ একদৃষ্টে সেই মাটির বাসার দিকে নারায়ণ তাকাইয়া রহিল।

কেবল শূন্যতা!

—এসো—

আর এক জায়গায় সান্‌কি আর ভাঙা কানাস্তায় একসারি ফুলের চারা।

নারায়ণ হাসিয়া বলিল, বেশ সুন্দর, না?

—হ্যাঁ। এতক্ষণ শূন্যতার পূরনে তাহার জন্যই মন ভরিয়া উঠিল রজতের। চমৎকার লক্ লক্ করে ফুল চারার পাতাগুলি।

—আমি আর দিদি এগুলো এনে বুনেছি। এখন কেমন সুন্দর হয়েছে।

ক্ষণেক পরেই তাহার হাত ধরিয়া রজত বলিল, তারপর আর কী দেখাবে?

—মা তো বলে, আমরা খুব গরিব, গরিবের আর কী থাকবে বলুন?

—ওরে বাবারে, আমিও খুব বড়ো লোক নাকি?

—কে আপনি?

রজত আর একবারও এমন প্রশ্নাকুল হইয়াছে। কি উত্তর সে দিবে?

—আমি সামান্য মানুষ নারু, সামান্য মানুষ!

একটা দুর্বোধ্যতায় পড়িয়া নারায়ণ হাঁ করিয়া তাকাইয়াই রহিল, কিছু বলিতে পারিল না।

যাহা সে বলিয়াছে, প্রিয়নাথ তাহা কেমন করিয়া ভুলে? খুঁজিয়া বাহির করিল তাহাকে। বলিল, রজত, ওসব কথা কাকে তুমি বললে?

রজত হাসিল।—কাউকে উদ্দেশ্য করে বলিনি, এমনি বলছিলাম। কেন?

প্রিয়নাথ একবার একটু না হাসিয়া কী করে! বলিল, এমনিই।—আবার

একটু ভাবিয়া—একটা ব্যাপার হয়েছে কিনা—তাহার মুখটি কেমন হইয়া আসিল।

—কী? কখন?

—তোমার সাথে যখন দেখা হলো, তার একটু আগে।

রজত মনে করিতে পারে।

—কী কী হয়েছিল?

—বিশেষ কিছু নয়, তবে—সসঙ্কোচে প্রিয়নাথ তারক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাতের যতটুকু পারে বলিল।

রজত প্রস্তুত হইয়াই ছিল, আশ্চর্য হইল না। বলিল, নাম কী—বললেন?

—তারকবাবু। এ অঞ্চলে ওর খুব খ্যাতি—দান, ধ্যান—

রজতের কেমন লাগিল শুনিতে। বলিল, তবে আপনাকে ও-কথা বললে কেন?

—বারে, সে কি অন্নসত্র খুলে বসেছে নাকি যে, যে-ই চাইবে তাকেই দেবে! তবে যে কথায় বলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরোয়!—তাহার মনের কোন এক কোণে কোন প্রচ্ছন্ন ব্যথা লাগিয়া থাকে, নিজের সহজ প্রকৃতি ভুলিতে সে পারে না।

কতকটা অন্যমনস্কতায় রজত বলিল, আপনি ভুল করেছেন।

—বারে! আমি ভুল করবো কেন? আমিই তো গিয়েছি তার কাছে।

—ঠিক অমন কথা যে বলে, খ্যাতি তার যাই থাক, কী করে তা আমি অস্বীকার করি, আপনি বা কেমন করে করেন? রজতের স্বর কেমন বিকৃত হইয়া আসিল।

—কি বলো!

—কিছুই নয়, রজত সহজ হইয়া গেল: বলছি যে, লোকটা ভালো নয়।

—ত্যাখো, দোষগুণ সবারই থাকে—প্রিয়নাথ বুঝাইতে জানে—এই একটা দোষেই কি তাঁর সমস্ত ভালো অস্বীকার করতে হবে? আমরাই কি দোষ ছাড়া?

—দোষের কথা কে বললে!

প্রিয়নাথ বলিল, আমিই বলছি। সেটাতো দোষই হলো।

—রজত! প্রিয়নাথ ডাকিল।

—অ্যাঁ! বলুন!

—ওঁর সাথে আমার একটা ইয়ে কিনা, মানে—নারায়ণের ভাষাতেই প্রিয়নাথ বলে,—এই ছোটকাল থেকে দেখে আসছেন, একটা স্নেহ—আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। আমার খারাপ কামনা করবেন, এমন একটা হতেই পারে না—তার ছেলেকে আমিই তো এতকাল পড়িয়েছি, এখন না হয় কলেজে থাকে!

এই সবের সঙ্গে আগের ঘটনার কী সম্পর্ক রজতের বুঝিয়া উঠিতে ভয়ানক কষ্ট। আবার ভাবিতেই লাগিল সে: অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যেখানে নাই, সচেতনতা সেখানে অনগ্রসর, সেই মৃত্তিকা খণ্ডের মানুষরাই রুদ্ধশ্বাসে অচেতন, উপলাহত ঝর্ণার মতো ছুটিয়া পড়িবার সাহস তাহাদের কোথায়! কোন অনাবৃষ্টিকালে তাহারা অদূর বন্ধুকে দেখিলেও আহ্বান করে না, আহ্বান করিবার সুমতি তাহাদের নাই।

॥ নয় ॥

পরদিন ভোরবেলা অত সকালে উঠিয়া রজত দেখিল দয়াময়ী কখন উঠিয়া বসিয়া আছে। সে চলিয়া যাইতেছিল, তাহার ডাকে কাছে আসিল।

—নরু, কখন ঘুম থেকে উঠলি!

—এখন। ঠাকুর মা, আপনি তাহলে রাত থাকতে উঠেছেন আজ!

দয়াময়ী বিরস হইয়া উঠিল এক মুহূর্তে, রোজইতো এমনি। চোখে অতটুকু ঘুমও আছে—সেই সুখী মরবার পর থেকে! দেবতার পায়ে কত মাথা খুঁড়ে মরি। নরু, তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাসনে, বল, চলে যাবিনে!

এমন প্রায়ই গলা ভিজিয়া আসে দয়াময়ীর।

রজত পায়রার ভাঙা ঘরের চারটি বাঁশের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু বেলায় দেখা গেল, প্রিয়নাথের ব্যস্ততা।—শহরের মানুষ, সকালে খাওয়ার অভ্যেস, আমি জেলে বাড়ী যাচ্ছি, এখনই মাছ নিয়ে চলে আসবো। তুমি ইদিকে তাড়াতাড়ি করে ফেলো কিন্তু।

লীলাবতী হাসিল: আমার জন্যে ভয় নেই, ইদিকে হয়ে যাবে, দেখো

তুমিই না সব গোলমাল করে বলো, কোথায় গল্প করতে বসে যাবে কে জানে!

—কোথায় আবার গল্প করবো, কোথাও না। লোকের সঙ্গে দু'ঘণ্টা গল্প করে আমার পেটের ক্ষিদে মিটবে!—এ বিষয়ে প্রিয়নাথের জ্ঞান বাড়িয়াছে অপরিসীম। সে আর কাহারও কথায় ভুলিবে না যেন—বলে, না, আমার কোন লাভ আছে তাতে।

লীলাবতী সায় দেয়ঃ না, কিছু নয়। কিন্তু এমন কথাটিও মাঝে মাঝে ভুলে যে যাও।

—ভুলবো। কি বলো, হুঁ, সারা জীবনেও তো নয়, শরীরে প্রাণ থাকতে তো নয়—প্রিয়নাথ বিড়বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

লীলাবতী জানে, হয়তো একটু পরেই লোকটি সমস্ত ভুলিয়া যাইবে, তবু তো মানুষের কাছে না ভোলার অহমিকার অন্ত নাই। তাহার আবার হাসি পায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়া গেল যাতে সকলেরই মন অল্প বেশী খারাপ না হইয়া যায় না।

নিজের রান্না নিজেই করিয়া খায় দয়াময়ী। এই কাজে তাহার জন্য কাহাকেও কষ্ট করিতে হয় না। সে প্রায়ই একথা বলে, আর এই চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়সে সক্ষমতার চাক্ষুস দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আগামীকালের মেয়েদের অক্ষমতার আসমুদ্র হিমাচলের সহিত তুলনা করে। কিন্তু আজ সক্ষমতার মুখে কালি; অবিশ্যি আছাড় তো জোয়ানেও খায়!

দয়াময়ী প্রকাণ্ড একটা আছাড় খাইল; অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবারে, ও মাগো, আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম গো! কতো যে বলি, কারুর একটু পরিস্কার করবার নাম নেই, কী পিচ্ছিল, কতো সাবধানে হাঁটলাম, তবু—ও বৌ, বৌ, ও মালতী, নতি, ও নারু—

সকলে আসিয়া হাজির হইল। আর দেখিল, মাটির কলসী মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে এবং দয়াময়ী অতিকষ্টে সশরীরেই উঠিতেছে!

লীলাবতী তাড়াতাড়ি গিয়া হাত ধরিল।—আহা কেমন করে আবার পড়লেন? খুব ব্যথা পেয়েছেন, না?

—কোমরটায় ভয়ানক লেগেছে। কিন্তু কলসীটি কি রকম ভেঙে গেছে—দেখেছো বৌ?

—তা যাক্, সেজন্ত আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি আমাকে ধরে চলুন।

—ওরে বাবারে, ওরে মারে! দয়াময়ী যাইতে যাইতে বলিল, তোরা কে কোথায় থাকিস বৌ! কতো ডাকলাম, কাউকে কি আর পাই! আমি একাএকা শুন্তি দেখলাম, আর তো উঠতে পারিনে! কোমরে যা লেগেছে, ও মাগো!

ঘরে গিয়া বলিল, বৌ, কাপড়টা দাও, ছেড়ে ফেলি।

লীলাবতী কাপড় আনিয়া দিল।

—ঠাকুর মা, এখন শুয়ে থাকুন, রজত বলিল, ভালো করে শুয়ে থাকুন।

অন্ত কেউ বলিলে দয়াময়ী শুনিত কিনা কে জানে!

—তুই বলছিস? কিন্তু তাতে কী আর এমন হবে? যা হয়েছে তা কি আর—বাপরে, বুড়ো হাড়, পাকা হাড়—একবার ভাঙলো তো কার সাধ্যি ফিরে জোড়া লাগায়! ও মাগো!

রজত বলিল, ঠাকুর মা, হাড় আপনার ভাঙেনি। আপনি শুয়ে থাকুন।

শুইল দয়াময়ী।

লীলাবতী বলিল, মালতী, তোর ঠাকুরমার জন্ত তুই রাঁধগে যা।

—আচ্ছা। মালতী খুশীতে কোমরে কাপড় জড়াইল।

মালতী হাসিয়া বলিল, আপনার কিছু হয়নি, বললো যে শুনলেন না?

—কে বললে রে?

—ওই যে—মালতী আবার হাসিয়া ফেলিল, চোখেও হাসি!

নরু?

হ্যাঁ।

দয়াময়ী উষ্ণ হইল: দাদা বলতে বুঝি মুখে বাধে? কেন, ফেলনা এসেছে নাকি বড়ো? না, বয়সে তোর ছোট?

মালতী হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল; সে আজ নিতান্ত খেয়ালেও কিছু বলিবে না।

আবার নিজের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছে দয়াময়ী: জল, সে তো সব সময়ই সেখান দিয়েই আনছি, কে জানে, অত সাবধান হলেও অমনি পড়ে যাবো! ভেঙেছে, এখন রথও অচল হলো। ঈশ্বর, তোর কোন চুলোয় আমি আগুন ধরিয়েছি বল?

ঈশ্বর নামে কোন বস্তু যদি থাকে এবং সেই বস্তুটির অক্ষরে গুনিয়া চৌদ্দটি পুরুষ যদি থাকে, তাদেরই প্রাণ ভরিয়া বকিল দয়াময়ী! শুইয়া-শুইয়া শরীরটার কথা মনে হয়, তখন কী আঘাতটাই না পাইয়াছে, আর এখন মনে হয়, ব্যথা করিতেছে, কিন্তু এক সময় অত্যন্ত শারীরিক সাবধানে একটু নড়িয়া চড়িয়া, বা তার পর উঠিয়া বসিয়া দেখা গেল, অক্ষমতার গ্রন্থিতো তত আঁট-সাট নয়, বেশ শিথিল। দয়াময়ী এপাশ-ওপাশ কাৎ হইয়া দেখিল: না ওঠাই তো যায়। ব্যথা-প্রকোপের সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের মুখে কালি (অবিশ্যি মনে মনে); সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহার রান্নার যেখানে জায়গা সেখানে গিয়া দেখিল, মালতীর শুকনো, উস্ক-খুস্ক চুল, ঘর্মাক্ত মুখ, সকড়ি হাত, আবার আঁচলও খসিয়া যায়।

—যা, যা, তোর দরকার নেই, যতদিন পরাণে বেঁচে আছি, ততদিন কাউকে দরকার নেই।

মালতী স্তব্ধ। ইহাতেও যদি মানুষ আশ্চর্য না হয় তবে কিসে হইবে! বলিল, আপনি যান। দু'একদিন রেঁধে খাওয়াতে পারবো না, আমরা কি মরে গিয়েছি নাকি?

—না, না, আমি বলছি, তুই যা।

—মরণ দিশা পেয়েছে বুড়ীর। মালতী রাগে চলিয়া গেল লীলাবতীর কাছে—মা, ওমা, দেখে এসো, আবার উঠে এসেছে, আমাকে দিলে না রাঁধতে!

লীলাবতী দেখিয়া অবাক! দয়াময়ী বলিল, বৌ, কতোদিন বলেছি, আমার ঘটিতে ফুটো, জল রাখি তো একটু পরে দেখি নেই, এখন এটা দিয়ে তো আর চলবে না।

এখন জল কিছু কমিয়াছে, উঠানে কাদা। ঘাস আর অনেক জংলা গাছ শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। চারদিকে কেমন একটা গন্ধ।

পরদিন মালতী সেদিকেই চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।

—দেখছো? রজত বলিল।

মালতী হাসিয়া বলিল, জল অনেক কমে গেছে, না?

—হ্যাঁ। কিন্তু এই জল থাকলে তোমার ভালো লাগতো, না?

সত্যি কথা বলিবার সাহস মালতীর আছে।—হ্যাঁ।

রজত খুশী না হইয়া পারে না। বলিল, মনে করতে পারো ওইখানে

ওই জলে এক লাস এসেছে ভেসে, হাতীর মতো ফুলো, আর দুর্গন্ধ ?

মালতীর দুচোখ হইল বড়ো। যেন ভয় পাইয়া বলিল, তেমনি হয় নাকি কখনও ?

—হয় না ! খুব হয়। জানো সে লাস কার ?

—না !

—আমাদের মত কারুর ? রজতের চোখের দৃষ্টি নিবিড় হইয়া আসিল।

—তাহলে আমরা তো ওরকম মরে লাস হয়ে ভাসিনে ?

—ভাসিনে, সেইটেই তো আশ্চর্য। আচ্ছা, এমন হয়নি, খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু কেবল জল ছাড়া কিছুই খেতে পাইনি আমরা ?

সে কথা মনে করিয়াও মালতীর এখন চোখে জল আসে। সে মাথা নাড়িল।

—তেমন দিনে কি মনে হতো—

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

—আরও কিছু বাড়লে এ ঘরে জল উঠতো ; তুমি জানো মালতী, আমরা তখন কোথায় যেতাম—না খেয়ে তো আর মানুষ একদিনে মরে না, বলতে পারো, তখন আমরা কোথায় যেতাম ?

—তারক বিশ্বাসের বাড়ী। বাবাকে খুব ভালোবাসেন তিনি।

—ঠিক, ঠিক, সেইখানে প্রথমে ওঠা যেতো। রজত হাসিয়া বলিল, হয়তো দু'একদিন থাকাও যেতো। কিন্তু স্নেহ যে অনেক রকম আছে, তা জানো ?

মালতী এইসব ঠিকই জানে, না নূতন কথা শুনিতেছে সে ! বিস্ময়ে আর আগ্রহে চোখ তাহার দীপ্ত। বলিল, জানিনে তো।

—তা'রা আর আমরা সমান নই, যেমনিই হোক তা'রা অনেক বড়ো, আমরা অনেক ছোট। তুমি বলছো, আমাদের খুব স্নেহ করেন তিনি, কিন্তু কুকুরকে মানুষ ভালোবাসে জানো ? যখন চাটে পা, যা হুকুম তাই শোনে, যা দেয়া হয় তাই খায় কিন্তু পারবে ভালবাসতে যখন সে শেকল ছেড়ে চলে যাবে, বা, রাগে দেবে কামড়ে ? কক্ষনো না। ওরাও তেমনি। আজ তুমি ছোট, তুমি ওদের কাছে ঠেকে যাবে, তাহলে একটা অনুকম্পা মিশিয়ে তোমাকে ভালোবাসবে, নিজেদের ন্যূনতম স্বার্থেও যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে কড়া নজর রেখে, তারপর ওরা তোমাকে ভালোবাসবে। তুমি ওদের কাছে ঠেকে নেই, বা যেমনই হোক সমান হতে চললে তো অমনি

ভালোবাসার ঘরে শূন্তি, প্রতিবাদ জানালো তো, অমনি শত্রুতা,—তখন তুমি হারবে জানা-ই, আবার মরে মরে বাঁচবে জানা-ই, আর প্রতিবাদ করবে না এটাও জানা, এ থেকে প্রমাণ হলো, তুমি দোষ করলে আর আর সেই হেতু হারলে।

—এখনও তেমনি হয়নি তো, না দেখে কি করে বলি? পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতী একবার চাহিল।

তাহার প্রশ্নে রজত আরও খুশীই হইল : হ'তে আবার বাকি কতোক্ষণ? আজ নয়, কাল হবে, নয়তো কোন একদিন হয়ে গেছে, তুমি হঠাৎ টের পাবে। আর, এতো হচ্ছেই, সব সময় হচ্ছে, এসব অনুভব না করা যে আমাদের সংস্কার, আমাদের শিক্ষা, নইলে আর পাঁচটি লোক পঞ্চাশজনকে না খাইয়ে রাজার হালে থাকবে কেন? কষ্ট পাচ্ছো, সহ্য করলে, অদৃষ্টের দোহাই দিলে, তবু যারা দোষ করলো তাদের দোষ ধরবার বা দোষী করবার অনুভূতি বা শিক্ষা পর্যন্ত নেই, প্রাণে মরে গেলেও ; চুরি বা খুন করলেও তার কারণ বার করবার অভ্যাস আমাদের নেই।

—অদৃষ্টের দোষ দিই না, কাকে বা দেবো, আমরা গরীব, তা অন্যকে দোষ দিতে যাবো কেন, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো কেন? দূর, এটা হিংসে ; একেবারে—পরেরটা দেখে হিংসে। এরকম কখনও ভালো নয়, এতো ছেলে-মানুসি! তোমার অনেক টাকা পয়সা, তা দেখে আমি গরীব, তোমাকে খুব গাল দিলাম, এটা কি হিংসে নয়? খুব বড়োলোক যে, নিশ্চয় খেটে পয়সা রোজগার করেছে, তা'র কি দোষ?

দিবা রাত্রির স্বপ্ন মালতীর ভাঙিয়াছে, এখন সে অনুভব করে, পায়ের নীচে মাটি, হাতের কাছে রক্ত মাংসে গড়া পৃথিবীর মানুষ, চোখের সামনে সঠিক জীবন। এখন বোঝাপড়া ও অনুভূতির কষ্টি পাথরে শিক্ষার পরীক্ষা আর অনুশীলন। কিন্তু কে তাহার প্রতি জাগ্রত চেতনায় বলিতেছে কথা? কে এই মানুষের সন্তান? মালতী তো কল্পনাও করে নাই, দূর-দেখার একাকী স্বপ্ন দেখিয়াছে শুধু। কিন্তু সামনে রজত কুমার! তাহার মনের ঘরে এক বালক চাপা হাসি হইয়া উঠিয়াছে বৈশাখের দুরন্ত বাতাসে।

একেবারে উল্টা বলিলেও, রজত ভাবিয়াছে, মেয়েটি তর্কই করে, অর্থাৎ উপলব্ধির পথ হইতে ফেরায় নাই মুখ। বেশ!—বলিল, তোমার বাবা কি খাটছেন না? না, খাটবার মোটেই ইচ্ছে নেই?

মালতীর বিস্ময়ের আর সীমা নাই। সে বলিবে কী?

—তবে কেন তোমরা গরিব? রজত মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল: তবে কেন আমরা খেতে পাইনে উনত্রিশ দিন মাসে। তবুওআমরা বেঁচে থাকার পথ পাইনে কেন খুঁজে? আরও অনেক এমনও আছে যারা নিরুপায়ে, খাটে না, তাদের নিরুপায় কেন হলো? তাদের উপায় বলে দেয় কে, যদিও উপায় একটা বলে দেয়া যায়? শতকরা পঁচানব্বই জন নেহাৎ বাঁচবার জন্যেই বেঁচে থাকলে পাঁচজন বড়োলোকের কী এসে যায়? তবুতো পঁচানব্বই জন মরেও বাঁচে। আচ্ছা, এদের সবাই-ই কি নিজেদের অক্ষমতায় না খেয়ে আছে? কেউ কি আপ্রাণ পরিশ্রম করছে না রোজগারের জন্যে? সকলেই কি হাল গুটিয়ে বসে?

মালতী বলিল, কিন্তু যারা কালে বড়োলোক হয়? তারা অনেক সময় খেটেই তো হয়?

—তা হয় কি না হয় সে সম্বন্ধে পরে বলবো। কিন্তু মোটাকথা বলি। এমনও তো আছে যারা বাপেরটা পেয়ে বড়োলোক, বেশ বসে-বসে রাজা হয়ে খাচ্ছে, সেটা কোন্ পরিশ্রমিকের পরিবর্তে? আশা করি, আর সকলের মতো তুমিও এর কারণস্বরূপ গত জন্মের পুণ্যিফলের জোর করবে না।

মালতী হাসিল। তাহার হালকা চুল হাওয়ায় উড়িতেছে। তাহার ভালো লাগিল: রজতকুমার তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

—বলিল: না।

মালতীও ভাবিল, তাহা হইলে? সে দেখিল, নীল আকাশে কী রৌদ্র; আর তার শরীরে লাগে তপ্ত বাতাস!

দেখিল, উনানের মুখে প্রাণপণে ফুঁ দিতেছে লীলাবতী, ধোঁয়ায় লাল মুখ, জলভরা চোখ!

মালতী আজ এই প্রথম অনুভব করিল, চোখ করিল জ্বালা।—মা, দাও, আমি জ্বালিয়ে দিই?

মুখ উঠাইয়া লীলাবতী হাসিয়া বলিল।—থাক্। তার চেয়ে বরং এক কলসী জল এনে দে আমায়।

কিন্তু কথামতো জল আনিতে গিয়া মালতী দেখে, কলসীর মুখ ভাঙা; বলিল, কলসী যে ভাঙা মা, একেবারে হাত কেটে যায়।

চাপা উত্তর আসিল: সে-তো অনেক আগে থেকেই, আজকের কথা নয়।

আর যাই হোক, ফুটো তো নয়।

আবার একটা স্বপ্নাকুল চোখে আলা।

নারায়ণের পড়ায় মনোযোগ বাড়িয়াছে সত্যি। চেঁচাইয়া পড়িতেছিল।

—অত চেঁচাসনে নারু, যা পড়বি, সব ভুলে যাবি।

একটা নূতন জিনিস শিখিয়াছে নারায়ণ। থামিয়া, প্রাথমিক ভূগোল পড়ার একখানা ছেঁড়া ময়লা বই খুলিয়া একটা পৃথিবীর মানচিত্র খুলিয়া বলিল, ভারতবর্ষ কোথায় বলো দিকি দিদি? আচ্ছা, তার আগে সেটা কী, তাই বলো তো?

—আহা বাহাদুর! নিজে জানিনে কিছু, পরের ওপর বাহাদুরি!

—হুঁ, জানিনে! তুমি জানো! আমরা যে দেশে থাকি, সেই দেশতো?

মালতী হাসিয়া ফেলিল।—এখন দেখাতে পারিস?

—পারিনে তো কী! এই যে—

—অত্তোটুকু?

নারায়ণ এবার রাগিয়া সমস্ত পৃথিবীতে আঙুল ঘুরাইল। মালতী কিন্তু হাসে না, চুপ করিয়া রহিল।

রজত আগেই নিঃশব্দে কাছে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, রাজপুত্তুরের বুদ্ধি আছে। একটা গল্প বলি শোনো।—হয়তো সেই অনেক বড়ো গল্প, এই মনে করিয়া মালতী উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণের না বুঝিয়া হাঁ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কী?

রজত বলিল, রাজপুত্তুরের নাম ইন্দ্রনাথ। বড়ো একটা দেশ একেবারে কম আয়াসে জয় করে নিলে! অতো অতো সৈন্য নেই, তেমন হাতী নেই, ঘোড়া নেই, তেমন কামান বন্দুক নেই, তবু জয় করে নিলে! তারপর তার খুশী দেখে কে? এমন হলে কে না খুশী হয়? রাজ্য পেয়েই তো ইন্দ্রনাথ রাজা হলো। এবার শাসনের পালা। অতবড় দেশ সে কেমন করে শাসন করবে? কিন্তু ইন্দ্রনাথ ঘাবড়ালো না, খুব বুদ্ধিমান কিনা! শাসন কাজে আগে যেসব বড়ো-বড়ো কর্মচারী ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো সব, কিন্তু এই জন্যে তাদের একেবারে পথে বসানো হলো না। ছেলে বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে সেই সব পদে নিযুক্ত করা হলো। কাজেই তারা অধীন থেকেও খুশীই হয়ে গেল। আর যারা বিদ্রোহ করেছিলো, সংখ্যায় তারা

অন্ন, ওদিকে কেউ করলে আত্মহত্যা, কেউ পালিয়ে গেল দেশ থেকে। কিন্তু কী ক্ষমা! তাদের খালি তক্তপোষে তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরই বসানো হলো, লোকচক্ষে নিজে বেদখল না করে—আসলে কিন্তু রাজ্য শাসন করবে নিজেই, অথচ জনসাধারণ ভাবলো, কী ভালো আমাদের নূতন রাজা! দ্যাখো, ওদের কোন শাস্তি পর্যন্ত দিলে না। রাজকুমার ইন্দ্রনাথের বুদ্ধি আছে। এইভাবে রাজ্য জয় ব্যাপারে যেসব বিশৃংখলা জেগে উঠেছিল সেসব সহজেই থামানো গেল। ইন্দ্রনাথের নিজের দেশ যেখানে ছিল—এই নূতন রাজ্যের কাজেই, নইলে আর অত সহজে জয় করা যাবে কেন, সেইই দেশের রীতিনীতি আইন-কানুন, শাসনের অবস্থা সব ভালো করে জেনেই সে এসেছিল—নিজের যে দেশ, সেখানে ভয়ানক গরীব, সেখানে তেমনি পাঁচজন লোক খেতে পায় তো পঞ্চাশ জন না খেয়ে থাকে, সেখান থেকে লোক আনিয়ে ইন্দ্রনাথ তাদের ভালো ভালো চাকরি—যেসব চাকরিতে দায়িত্ব আর সিন্দুক খোলার চাবি—দিলে। এতে এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল: লোকগুলো তো নিজের দেশের আর হাতের; ভুলেও কখনও বিদ্রোহ করবে না, বরং এদের জোরে পরের রাজ্যে নিজের পক্ষটা শক্তিশালী হলো। এদিকে ছোট ছোট আর মাঝারি গোছের সমস্ত চাকরি, যেগুলিতে নেই দায়িত্ব আর চাবি, সেগুলো দেওয়া হলো এই দেশের লোকদের—রীতিমতো মাইনে আর বুড়ো হলে চাকরি ছাড়বার সময় অনেক-গুলো টাকা একসাথে পাওয়া যায়, যা আগে ছিল না। এই পেয়ে সকলে খুশী।

এই ধরনের গল্পে নারায়ণের রস পাইবার কথা নয়। সে চুপি চুপি চলিয়া গেল পড়া ছাড়িয়া।

রজত বলিল, এইভাবে চলছে তো চলছে, অনেকগুলো বছর গেল কেটে। ইন্দ্রনাথ শাসনের সুবিধের জন্যে সারা দেশটা কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নিলে—এখনকার লোকে বুঝলো, এই, আর মনে করলো, তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক। আসলে একই দেশে বাস করলো, কারণ মহারাজ ইন্দ্রনাথই সে রয়েছে সকলের উপরে, মূল ক্ষমতার অধিকারী সেই। কিন্তু দু'একজন যারা চিন্তাশীল তারা ভাবলো, এসব বাইরের চটক, দোকানদারের গ্রাহক আকর্ষণ করবার মতো একটা উপায়। তারা প্রতিবাদ জানালো। ইন্দ্রনাথ মনে মনে ঘাবড়ে গেল, এতকাল নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে, পরেরটা দিয়ে নিজের দেশের আর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়িয়ে, অথচ বুদ্ধি খাটিয়ে এ দেশের অতো অতো অনুভূতি-ছাড়া লোকদের খুশী রেখে, বা খুশী না রেখেও প্রতিবাদ

করবার মুখ কৌশলে ভেঙে অমন আরামের সন্ধান পেয়ে এতকাল ভাবতেও পারেনি যে, তার ভেতরের কৌশলও অনেকে ধরে ফেলেছে, সে মনে-মনে ভয়ানক ঘাবড়িয়ে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলো না। রাজ্য পাবার পর এতকাল সে এ দেশেরই লোক দিয়ে অনেক সৈন্য তৈরী করেছে, ভাবতে পারা যায় না সে কত সৈন্য! আর তৈরী করিয়েছে কত দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র, জোগাড় করেছে কত ঘোড়া, হাতী, নিযুক্ত করেছে এদেশেরই লোক দিয়ে কতগুলি চর। তাই সে প্রথমে কিছু গ্রাহ্যই করলে না কিন্তু কানের কাছে সব সময় একটা জিনিস বাজলে তার তো প্রতিকার করতে হয়। তাই ইন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালো তাদের, ওই ক'টি লোককে যদিও অনায়াসে পারতো তবু কামান দিয়ে দিলে না উড়িয়ে, নিজের আত্মসম্মান একটু নষ্ট করা হলো এই মনে করেও সে তাদের ডেকে পাঠালো। তারা এলো রাজপ্রাসাদে।

রজত বলিতে লাগিল : ইন্দ্রনাথ খুব আদর-আপ্যায়ন করে জিজ্ঞেস করলে, কী তাদের দাবী? তারা সব বললে। তারা এমনি অনেক দরবার-বৈঠক করলে, কিন্তু আসল কথাটি পেলো না, ইন্দ্রনাথ আগের উপায়ে শুধু দেরী করতে লাগলো, অথচ কোনক্রমে রাজকীয় ভদ্রতার এতটুকু ব্যাঘাত হলো না। দেশের বেশীর ভাগ লোকই গরিব আর অজ্ঞ; ইস্, কী—পুণ্য ছিল আগের জন্মে, দেশের রাজার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখা করছে, রাজা তাদের আদর করছেন, কী ভাগ্যি, কী আশ্চর্য্য! তার আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করা হচ্ছে, সর্দারী! আমরা বেশ আছি, খুব ভালো আছি, তোমরা বাপু সর্দারী করতে গেলে কেন? ইস্, কী আশ্চর্য; রাজা নিজে ডেকে কথা বলছেন—তারা এই ভাবলো, অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকই এই ভাবলো। কাজেই তারা, যারা প্রতিবাদ করে, আর তেমন জোর পাবে কোথায়? তবু ছাড়লো না। ইন্দ্রনাথ অনেক চিন্তা করলে, শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে—খুব বুদ্ধিমান কিনা—একটা উপায় স্থির করলে। সে সিন্দুকের চাবি হাতে রেখে বড়ো-বড়ো চাকরিগুলোও এই দেশের লোকদের দিতে আরম্ভ করলে; মস্ত মাইনে, রাজার মতো মাইনে, যা কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি। লোকের আশ্চর্য্যের আর সীমা নেই। বললে, অমুক চাকুরে আমার অমুক আত্মীয়, আর কী আনন্দ হলো! সকলেই যে বলতে পারলো বা পারে, এমন নয়, তবু স্বপ্নে ভেবেও, লোকের সাথে গল্প করেও খুশী হলো। অথচ নিজেদের খাবার একবেলা জোটে তো আরেক বেলা জোটে না, ভারী অসুখ হয়তো চিকিৎসা হয় না, ঘর ভেঙে পড়ে তো

এক খণ্ড বাঁশও জোটে না, জল জোটেতো ময়লা। আর যাদের কথা বলে তারা হাসে, জমায় আড্ডা, করে গর্ব্ব, দেখে স্বপ্ন, খুশী করে অন্তকে, তারা কিন্তু একেকটি বাদশা, একেকটি আমীর, তাদের না খেয়ে থাকার দিন থেকে কেড়ে নেয়া কড়ি দিয়ে একেকটি রাজা।

গল্প শুনিয়া মালতীর না জানি কেন মনটা কেমন করিল, চোখ দুটি ভরিয়া উঠিল করুণতায়।

রজত ঝুঁকিয়া বলিতে লাগিল: এরপরে কয়েক বছর চলে গেল। ইন্দ্রনাথ এর মধ্যে মোটা মাইনের—যা কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—মোটা মাইনের আরও অনেক চাকুরে সৃষ্টি করলে, শিক্ষা যাদের প্রচুর এবং অনুভূতি যাদের ধারালো তাদের রাখলো হাতে, তাদের তৈরী করলে দেশ শাসনের অস্ত্র। এদের কল্যাণে কেউ আর প্রতিবাদ করবে না কারণ তারা যে এই দেশেরই মানুষ। আগের দিনে দরকার ছিল অস্ত্রের, এখন কেবল বুদ্ধির, ইন্দ্রনাথ খুব হাসলো। কিন্তু যারা প্রতিবাদ করে তারা তো পায় না আমোদ, তাদের নাকি বুক জ্বলে, চোখ নাকি জ্বলে! তারা বোঝাতে লাগলো, তোমার আমার না খাওয়ার কড়ি নিয়ে ওরা একেকজন বাদশা, তোমার আমার গায়ে ঘাম ঝরিয়ে ওরা শোয় সোনার পালঙ্কে। তারা দেখিয়ে দিলে, এই যে রেশমের কারখানা, কাপড়ের তাঁত, এই যে দুলাখ টাকা আয়ের চৌধুরী, আমরা এদেরই চালক, আমরা এদের চালাই, আমরাই এদের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করে দিই, এরা সোনার থালে খায় আমাদেরই জন্যে, এদের জীবন আমরাই, এরা তো দেবতা—এই দেবতার গদি আমরাই তৈরী করেছি। তারা বুঝিয়ে দিলে, ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলবার ছিল না কিন্তু তার যে নীতি তাতে পাঁচজন দেবতা পঁচানব্বুইজন উপবাসী, অথচ এই উপবাসীরাই আবার উপবাস করে তাদের দেবতা বানায়, তার এই নীতির সাথে অজাজী সম্বন্ধ ধনীদের সঙ্গে, তাই তো সে এক শ্রেণীর চাকুরেদের মাইনে দিচ্ছে ভয়ানক বেশী, পঁচানব্বুইজন উপবাস করছে—এখন বোঝাতে পারলে হয়, কারণ দেশ ভরে তো অশিক্ষার বধিরতা!

মালতী তাড়াতাড়ি বলিল, বলুন।

—রাজপুত্তুরের জন্যে কষ্ট হচ্ছে, না? রজত একটু হাসিল।

—একটুও না রাজপুত্তুরের জন্যে আমার কষ্ট তো ভারি! আমি কি

নাকি?—না হাসিয়াও মালতী ঠিক মনের কথা বলিতে পারে না—একটুও না। কেন কষ্ট হবে?

রজত হাসিয়া বলিল, তারা বললে, আমরা জানি, লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে। আমরা জানি, যারা বিদ্বান তারা অশেষ গুণী, সকলে তাদের ভালোবাসার চোখে দেখে, আমরা জানি, অধ্যয়নের মতো উৎকৃষ্ট আনন্দ আর সাধনা আর নেই। শিক্ষার দেখা না পেয়েও শিক্ষার উপর আমাদের ভয়ানক শ্রদ্ধা, সম্মান, তবু আমরা লেখাপড়া শিখতে পাইনে কেন? তারা জানালো, অত খরচ করে বাইরের-চটকের কী দরকার? কী দরকার বিদেশী কারিগর এনে বড়ো মহল করার? আমরা যে খেতে পাইনে! এইভাবে তারা সকলকে জানাতে লাগল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ওদিকে ইন্দ্রনাথ প্রমাদ গুনলো এবার মনে-মনে। কিন্তু কয়েকদিন তেমনি চিন্তা করে একটা উপায় বার করলে। খুব বুদ্ধিমান কিনা! ইন্দ্রনাথ, যারা প্রতিবাদ করছিলো, তাদের অনেক জনকে মনসবদারী সুবেদারী সাধলো, তাতে দু'একজন কেউ এলো বটে, যারা বাকি রইলো তাদের অগত্যা শাস্তি,—দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু এতে কি আর আসল কথাটি চাপা পড়ে?

—রজত?

দাঁড়াইয়া রজত দেখিল লীলাবতী আসিয়াছে। বলিল, আপনি! বলুন?

লীলাবতী হাসিয়া বলিল, তোমাদের কি নাওয়া-খাওয়া নেই? আমি যে বসে রয়েছি!

—বিশ্বাস করুন, আপনাকে বসিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য আমার মোটেই নয়।

তাহার কথার ভঙ্গিতে লীলাবতী আবার না হাসিয়া পারে না।—উদ্দেশ্য থাকলেও আমি মনে করতে পারি, কি বলো?

—ও, বললাম দেখেই বুঝি? রজত একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—না, জগতে আর কাউকে বিশ্বাস নেই! এই তো যদি বলি, ওকে একটা গল্প বলছিলাম—

'—গল্প? মালতী সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকাইল। রজতের এবার খুবই খুশী হইবার পালা; একটি আরামের তৃপ্তি আসিল মনে। বুঝিল, তাহার মনের কলকব্জায় উপলব্ধির আসন অনেকখানি।

মালতীর দিকে চাহিয়া রজত শুধু বলিল, ধন্যবাদ।

—হুঁ, যদি বলি—তারপর কি বলছিলে?

—যদি বলিতো, ওকে একটা গল্প বলছিলাম, অমনি ভেবে বসবে, গল্প-শুনছিলাম!

—বলে কি! খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল লীলাবতী।

—আমি কি ছোটটি, যে কেবল বলবে রাজা-উজীরের গল্প? রজত নিজে না হাসিয়া বলিল, আমি এখন একটি যুবক, আমার ওসব ভালো লাগে না। আর রাজা উজীর ভালো লাগবেই কেন, সেগুলো কি সত্যি! কক্ষণো নয়।

এইবার কোন্ উদ্দেশ্য, তাহা লীলাবতী হয়তো জানে না কিন্তু রজত এতক্ষণে হাসিয়া উঠিল।

পরদিন দুপুর বেলা। একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উপুড় হইয়া রজত কি লিখিতেছিল। মাথায় অযত্নের চুল, মাঝে মাঝে বাতাসে নড়ে। উপুড় হইয়া লিখিতে অসুবিধা হয়, হয়তো চোখের কাছটা শির্ শির্ করে, তখন হাত দিয়া চুল সরাইয়া দিতে হয়। উপুড় হইয়া অসুবিধা বিস্তর।

কিন্তু কালকের কথা মনে হইলে রজতের এখনও হাসি পায়।

সেদিন তারই গাওয়া একটি গানের প্রথম কলি বিকৃত সুরে গাহিতে গাহিতে মালতী আসিল। লজ্জা অথচ ভালো লাগায় সে সে কেমন করিয়া রজতের মনোযোগ তাহার দিকে টানে? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু অসীম মনোযোগ না থাকিলেও কেউ একজন গান গাহিয়া আসিলে তাহা নিশ্চয়ই শোনা যায়। বিশেষতঃ বলিতে গেলে যখন মেয়েটিকে ভালোই লাগে, আর তাহার বাদ-প্রতিবাদের সহজতা যখন রজতের কাছে মনোরম!

কিন্তু লেখাটা প্রয়োজনের, প্রচুর মনোযোগ চাই।

—ঠাকুর মা আপনাকে ডাকছে, আমি এলাম তাই।

রজত প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া একটু পরে মুখ না তুলিয়াই বলিল, হ্যাঁ, কী বললে?

পুনরাবৃত্তি করিল মালতী।

একটু পরে আবার রজত বলিল, ডাকেনি আমি জানি, তুমি কেন এসেছো বলো শুনি? খুব অল্পেতে কিন্তু, আমার সময় নেই, সেকথা আশা করি তোমার

মতো বুদ্ধিমতী মেয়েকে বলে দিতে হবে না।

মালতী নিরুপায় বড়ো হয় না। বলিল, এই দেখুন, ফিরে দেখুনই না মজা—

লেখা রাখিয়া রজত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সে মুচকি হাসিতেছে, আর কিছুই নয়।

সেও একটু হাসিয়া বলিল, ছাখো, মানুষের জীবনে সমস্যা অনেক, যেমন আমাদের সমস্যা দারিদ্র্য আর শিক্ষা। এইসব সমস্যায় পীড়িত হয়ে অন্য আনন্দ বা বিলাস উপভোগ করবার সময় কোথায়? তার এখন প্রয়োজন বা কতটুকু, সামান্য। কিন্তু মেয়েরা তা চায় না; তারা চায়, সারাক্ষণ পুরুষ তাদের হাতের কাছে থাকুক, তাদের সবসময়ে ভালোবাসার কথা শোনাক, কানের কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে বলুক। কিন্তু এটাতো জীবনের উপর সহানুভূতির অভাব।

এসব শোনায় অনভ্যস্ত হইলেও প্রথম শুনিয়া ঘাবড়াইবার মেয়ে মালতী নয়। এই সামান্য ক'দিনেও তাহার মনের ক্ষেত্র হইয়াছে অনেক বড়ো, সাহস বাড়িয়াছে প্রচুর, সরল সহজতার দ্বার পরিপূর্ণ খোলা—এইতো কালও যখন লজ্জার সমুদ্রে ডুবিয়াছিল, আজতো সে নিজেও বুঝিতে পারে না, সেই সমুদ্র ছাড়াইয়া সে কোথায়? বলিল, আপনিই তো বলেছেন আমাকে নাকি আপনার ভালো লাগে—

—অ্যাঁ? রজত এবার মনোযোগ না দিয়া পারে না।

অবিশ্যি এই মনে করে আপনি গর্ব করবেন না নিশ্চয়ই, এমন বোকা নই যে আমি ভাববো তাতেই কেবল আপনারই মহত্ব, আপনার দয়া, একথা মনে রাখবেন আমার নিজেরই দাবী আছে যে। সবাই জানে আমি সুন্দরী, আর আমি জানি, বলতে পারি, গেয়ে বেড়াতে পারি—বলবো না! একশোবার বলবো, যা সত্যিই আছে তা নিয়ে গর্ব করবো না!

—ও, এই কথা! রজত হাসিয়া উঠিল, কালকের কথাটা এখনও মনে রেখেছো দেখছি, আমি তো ভাবতেই পারিনি, তুমি আবার তা মনে রাখবে! কেন সে কথা বলেছিলাম জানো? ভয়ানক রাগ হলে, মেয়েদের রাগ সহজে থামবে না মনে করে একটা সোজা আর সস্তা কথা বলেছিলাম, তাতে তুমি সব ভুলে গেলে, খুব খুশী হলে; আমি জানি বেশীর ভাগ মেয়েই অমন খুশী হয়। অথচ তুমি ভেবে রেখেছো, তোমাকে আমার সত্যি ভালো লেগেছে!

মালতীর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল। কোনরকমে রাগ চাপিয়া বলিল, অমন মিথ্যে কথা বলাই বুঝি আপনার অভ্যাস?

—অভ্যাস নয়। এই দেশে আরও কয়েকটি মেয়ের সাথে মিশবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।

—ওঃ। মালতী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রজত হাসিয়া আবার লিখিতে বসিল।

তারপর সারাদিনে দেখা হইয়াছে প্রচুর, কথা হয় নাই একটিও। সুমুখে রহিয়াছে মালতী অনেক সময়েই, কিন্তু আগের মতো তেমনি আলাপ উন্মুখ নয়। এখন আর জল বা তালবনের দিকে স্বপ্নাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া না থাকিলেও তাহার দিকে আর চায় না। অথচ এই পরিবর্তন আনিয়াছে যে মানুষ, সে তো রজতই; মালতী সেই গল্পটি নিশ্চয় ভুলিবে না।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও কেউ ওঠে নাই, রজত ঘরে বসিয়াছিল। এমন সময় সেই বিকৃত সুরে গানটি শোনা গেল। বাহির হইয়া সে দেখিল, দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া মালতী এপাশ ওপাশ হাঁটিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই গান থামিয়া গেল।

—এই শোন—

তবু মালতী শোনে নাই এমনভাবে চলিয়া যাইতেছিল।

—যেয়ো না একটা কথা শুনে যাও—

এবার সে আসিলে রজত বলিল, রাগ করেছো মনে হয়।

—সে রাগ ভাঙাবার উপায় তো আপনি জানেনই।

—কারুর বিশেষতঃ কোন মেয়ের রাগ ভাঙানো আমার পেশা নয়।

আবার চলিয়া যাইতেছিল মালতী, রজত তাড়াতাড়ি বলিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার হাতখানা একবার দেখি—.

যেন অনিচ্ছায় মালতী হাত বাড়াইয়া দিল। সেই হাত ধরিয়া রজত বলিল, সে সব কথা থাক। একটা কথা বলিব। তোমার মধ্যে একটা খুব ভালো জিনিস লক্ষ্য করেছি, সেটা হলো তোমার ব্যক্তিত্ব আছে, অনুকূল আবহাওয়া পেলে তার প্রকাশ আরও সুন্দর হতে পারে, অবিশ্যি আমার কাছে নয়। কিন্তু এ থেকে মনে করো না, তোমার আমি প্রশস্তি গাইছি। যার যেটা ভালো, যার যেটা আকর্ষণীয় সেটা তাকে বলে দেয়া আমার অভ্যেস। আহা, মুখ অমন করছো কেন? আমি তোমার হাত ধরে

আছি, তুমি যাবে না জানি।

—আপনি সমঝদার মানুষ!

—সমঝদার কে নয়? তার মধ্যে তুমি একজন প্রধান। তোমার এই গুণটাই সবচেয়ে বেশী প্রবল। এ দেখে যে-কেউ তোমায় ভালোবাসতে পারে। তুমি কি তাতে বাধা দেবে?

—নিশ্চয়। সকলে ভালোবাসবে এমন আমি চাইনে—সেটা বাজারের সস্তা জিনিস। মালতী অনায়াসে বলিল।

বাজারে যেটা কাটে বেশী, সকলে নেয়, তাকে ভালো জিনিস বলে। তোমার মূল্য তাহলে কম?

—বাজারে হুজুগে অনেক খারাপ জিনিস কাটে। তাছাড়া আমি তো সকলকে বলতে যাইনি, দেখাতে যাইনি, এই গ্যাখো, আমি কী সুন্দরী! আমায় তোমরা ভালোবাসো!

রজত হাসিয়া বলিল, এই কিছুক্ষণ আগেও তো আমাকে সে কথা বলছিলে। সে থাক্, সব কথাই যে মেপে-ঝুপে, ভেবেচিন্তে বলবে এমন তো কোন কথা নেই, তাহলে মহাপুরুষ হওয়া যেতো। তবে এটা প্রচারের যুগ, সব কিছুরই প্রচারের প্রয়োজন হয়, এটা তুমি জানো?

—খুব খারাপ জিনিসেরও?

—হ্যাঁ।

—নিশ্চয় সেই প্রচার কখনও টিঁকে থাকে না?

—ঠিক ধরেছো। কিন্তু আজকাল মানুষ সেটা বোঝে না, জিনিসের উৎকর্ষের দিকে না তাকিয়ে কেবল প্রচার করে। তাতে লাভ হয় এই, মানুষকে কয়েকদিন ফাঁকি দেয়, কিন্তু একদিন তা ধরা পড়েই, সেদিন অনেক কষ্ট করেও বেঁচে থাকবার ক্ষমতা আর হয় না, বা পরে কোনদিন বেঁচে উঠবারও কোন আশা থাকে না। তবে প্রচারের দরকার—সেটা ভালোর।

—ভালোর কখনও প্রচার দরকার হয় বলে মনে হয় না।

—খুব দরকার। শিক্ষা যাদের অল্প বা নেই, তাদের সহজেই অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে, আসলে তারাই চিরকাল কোন কাজ চালানোর পক্ষে অস্ত্র। কিন্তু অনুপ্রেরণা যারা দেয় তাদের উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয় তাহলে বিপদ অনেক। কারণ বলেছি তো, যাদের শিক্ষা নেই তাদের অনুপ্রাণিত করা সোজা। কাজেই সেখানে জায়গা করেই নিতে হবে

ভালোর প্রচার দিয়ে। অনেক জায়গায় প্রচুর কষ্ট থাকে তো অনুভূতি থাকে না, সেই অনুভূতি জাগাতে হলে প্রচার দরকার। ধরো, একটা ওষুধের কারখানা, সেখানে সকলের মাইনে কুড়ি টাকার ওপরে নয়; কিন্তু যারা সেটা চালায়, যারা শুধু কতগুলো টাকা দিয়ে চিরকালের জন্য রাজার সুখের মালিক হয়েছে, তারা মোটর হাঁকায়, মাসে দুটো মিটিং করে, সেখানে নিজেরাই আর সব চাপা দিয়ে নিজেদের মাইনে বাড়ায়,—এখন তুমি কুড়ি টাকার মাইনের একজনকে বলে ছাখো, ওহে তোমরাই তো এখানকার প্রাণ, কিন্তু দেখেছো, এই প্রাণের ঠিক রকম খাদ্য কেউ দিচ্ছে না? তাতে সে আপশোষ করবে, সংসারের অনটনের কথা নিজের খাটুনির কথা বলবে, কিন্তু ভুলেও তবু দাবি করবে না, নিজের অহেতুক কষ্টের জন্যে অন্যকে দোষী করবে না, উপরওয়ালার কারখানা চালানোর গাম্ভীর্য তাদের কাছে হিমালয়, তেমন যেন কেউ পারে না, তাই তারা অতো বেশীরও দাবি করতে পারে, আর কুড়িটাকা মাইনেতে তাদের দিনরাত পরিশ্রমকে নেহাৎ পরিশ্রমই বলা চলে, অন্য কিছু নয়, আর অদৃষ্ট! এমনি সংস্কার। এই সংস্কারকে সরাতে হলে প্রচারের দরকার। তুমি, এই তো কদিন আগেও, তুমি ঠিক আগের মতো ভাবতে পারতে কিনা কে জানে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

—অথচ সহ্য করতে, কষ্টের কারণ খুঁজতে না। এখন হয়তো খুঁজছো, জানছো।

হাত ছাড়াইয়া যাইয়া বলিল মালতী: সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন ছেড়ে দিন, আমার কাজ আছে।

রজত খুব আস্তেই তাহার হাতটি ধরিয়াছিল। বলিল, এই জিনিসটা আমি পছন্দ করিনে—একদিন ভালো লাগলো না বলে তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সে কথা যে বলে সে-ই তো তা চায় না, আমিই তো তা পছন্দ করি না বলেই চাইনে।

—আপনার সেটা মহত্ব কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সে মহত্ব সইতে পারে না। ছেড়ে দিন, আমার কাজ আছে। এইবার মালতী চলিয়াই গেল।

লীলাবতী একা কাজ করিতেছিল পিছনের দাওয়ায়। তাহাকে দেখিয়া বলিল, বাসি ঘরগুলো ঝাঁট দে তো সতি, আমি সময় পেলুম না।

—আমি পারবো না !

—তবে কী পারবি জিজ্ঞেস করি? এই সামান্য কাজও যদি তোকে দিয়ে না হয় তবে আমি কোথায় যাবো বল?

—তোমার যা ইচ্ছে করো, আমি পারবো না।

লীলাবতীর প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর, সাধারণতঃ রাগে না। মেয়ের দিকে কতোক্ষণ একদৃষ্টি চাহিয়া আবার কাজে মন দিল।

এই চাহনির অর্থ মালতী জানে, তবু সে ঘরে গিয়া গুম ধরিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু একটু পরে আবার কী মনে হইয়াছে, আস্তে আস্তে লীলাবতীর পিছনে দাঁড়াইল।

—মা?

ডাকিলে চুপ করিয়া থাকিতে লীলাবতী পারে না। বলিল, কেন?

—তুমি আমার উপর রাগ করলে?

—না রে না। ওইরকম কথায় লীলাবতী সব ভুলিতে পারে।

—কী করবো বলো?

—বললাম যে, বাসি ঘরগুলো—

—আচ্ছা, আচ্ছা। মালতী চলিয়া গেল।

এই দিনটিও তারপর নিঃশব্দে কাটে।

পরদিন রজত খুঁজিয়া বাহির করিল নিজে। কাছে আর কেউ নাই, নিভৃত। বলিল, তুমি ভুল করছো, মালতী!

—একটুও নয়। আপনার কাছে তা হতে পারে।

—আমার কাছে? তোমার ভুল দেখায় আমার কী লাভ?

—ভুল থাক আর নাই থাক, তাতে আমার কী? কাউকে জিজ্ঞাসার থাকলে, আমি তাকে সোজা জিজ্ঞেসই করি, অন্য কথা তুলিনে।

রজত হাসিয়া বলিল, একটি কথা সত্যি তোমায় বারে বারে না বলে পারিনে, তোমার সহজ কথার তর্ক, চলাফেরা আমার ভালো লাগে। তুমি স্বাভাবিক!

—আমার স্বভাব আমি কারুর জন্য ইচ্ছে করে তৈরী করিনি।

আমি তো সেকথা বলিনি। তবু তুমি জবাবদিহি করলে। তাই আমি বলছি, তুমি ভুল করো! রজত এবার তাহার হাত ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তোমাকে ভালো লাগে এটা তোমার রাগ থামাবার জন্যে বলেছি,

তাই বলে তোমাকে ঘৃণা করি, এমন কথা তুমি কি করে ভাবলে ?

—কে বললে, ও কথা ভেবেছি ?

—তা নইলে অমন করছো কেন ?

মালতী আর পারে না, এবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল—আমি কী করেছি আপনার, কোন্ ভুলটা করেছি আপনি বলুন ? আপনার ওপর রাগ করবো এমন দুর্মতি যদি আমার কখনও হয় তবে তার কি কখনও ক্ষমা নেই ? আমি কী ভুল করেছি বলুন ?

রজত তাহাকে দুহাতে ধরিয়া বলিল, কেঁদো না, কেঁদো না। তোমার মতো মেয়ে এমনভাবে কাঁদবে, এ আমি আশা করিনে। শোন। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি।

—অ্যাঁ! চলে যাচ্ছেন ? কোথায় ?

—তার ঠিক নেই। শোনো, কাউকে না জানিয়ে যাবো, জানাতে গেলে গোলমাল, হয়তো আটকে পড়বো। তুমি ওদের জানিয়ো।

মালতী তাহার হাত আরও জড়াইয়া ধরিল ; এখন কিছু বলিবার সাহস যেন তাহার নাই।

বলিল রজত : আবার একদিন আসবো—

—কবে ?

—ঠিক কবে, এখন তা বলতে পারিনে, কতো কাজ হয়তো এসে যাবে পথের মাঝে, তাতে দেরী হতে পারে। কিন্তু সেদিন এসে তোমায় দেখবো মালতী ?

আবার কাঁদিয়া উঠিল মালতী।

—কেঁদো না, কেঁদো না। রজত বলিল, বলো, এসে দেখবো তো ?

—হুঁ।

—তাহলে যাই।

জামা পড়িয়া রজত বাড়ীর পিছনের পথে পা বাড়াইল। এখন জল নাই।

কতক্ষণ পরে ঘরে মালতী গিয়া দেখিল সকলে একখানে একত্র হইয়াছে, দয়াময়ী পর্যন্ত। কী যেন কথা হইতেছিল, সে যাইতেই থামিয়া সকলে তাহার দিকে চাহিল। প্রিয়নাথ বলিল : চলে গেছে ?

প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া মালতী বলিল, কে ?

—কে আবার। ন্যাকা, যেন কিছু জানে না। সেই যে রজতটা—

বন্যার জল ঝল্‌মল্‌ করে, বাতাসে আবার সেই আগের সৌরভ, পাখীর ডাক।

মালতী বাহিরে আসিল। আজকার ভোর, পরিচয়ের সেই প্রথম মুহূর্ত-গুলির কথা মনে করাইয়া দেয়; এই বাতাসের ছোঁয়াচে সেই দিনটাই শুধু মনে পড়ে।

তখন কেউ পথ চলে না। মালতী হাঁটুতে কাপড় উঠাইয়া সেই বন্যাবশেষ জলে ছপ্‌ছপ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে, সামনেই একটা টিলার মতো ছিল, সেখানে গেল। এই উঁচু জায়গায় দাঁড়াইলে অনেক দূর পর্যন্ত চোখ পড়ে। মালতী চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কাহাকে যাইবে দেখা? কে আসিবে ওই প্রান্তর পার হইয়া? কেউ না, তবু সে সেদিকে চাহিয়া রহিল একদৃষ্টে—হাল্কা রেশমের মতো চুল তাহার উড়িল দুরন্ত বাতাসে, কাপড়ের আঁচল তেমনি খসিয়া খসিয়া পড়ে; রোদে চিব্‌চিব্‌ করে ভিজা চোখের পাতা, আসিবার-কালে জলে ভিজা পা-এখনও শুকায় নাই।

ছোট গল্প

মরুভূমিতে মুক্তি

আশ্চর্য, এমন একটা ছবি রাণীর ভালো লাগলো না। অর্দ্ধেকও হয়নি, তখনি সে অস্বস্তি বোধ করেছিলো। আগে, পেছনে ও পাশের দর্শকগুলো তন্ময় হয়ে দেখছে, কিন্তু রাণী তার চোখ দুটি যদিও পর্দার দিকে রেখেছে, ভালো লাগছে না তার। অথচ এখানে আসতে তারই আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী।

সে বিমলকে চুপি চুপি বললে, চলো বাড়ী যাই।

—কেন, ভালো লাগছে না?

—না, তুমি চলো।

বিমল বললে, দাঁড়াও ইণ্টারভ্যালটা তো হোক।

হলের ভেতরের হাওয়া যেন ভারী হয়ে উঠেছে, রাণী নিশ্বাস ফেলতে পারছে না।

বিশ্রাম হলো, কিন্তু বিমল যা মনে করেছিলো তা হলো না, রাণী আর থাকলো না। সে আর কি করে, নীল আলোর নীচ দিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠল।

কনকনে শীত। চলতি গাড়িতে বাতাসও লাগছে। রাণী আরও ঘন হয়ে বসলো।

বাসায় চাকর রামলোচন অপেক্ষা করছিলো। রাণী গিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে দিলে। তারপর ওপরে গিয়ে একেবারেই বিছানায় শুয়ে পড়লো। যেন এই শীতের রাতেও অনেক ক্লান্ত। ওর এই এক দোষ, একটা সামান্যতম কিছু অসঙ্গতি ঘটলে, সে তা চেপে রাখতে পারে না, প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু ওদিকে আবার কি যে অসঙ্গতি ঘটেছে তা'ও সহজে জানাবে না, এখন যদি কেউ তার অনুভবের তীক্ষ্ণতায় জানতে পারে।

বিমল একটা চেয়ারে বসেছিলো। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ। টেবিলের ওপর আলো জ্বলছে। কিন্তু পরে রাণী জানালাগুলো খুলে দিয়ে খাটের ওপর বসলো।

—বাইরে ভয়ানক হিম পড়ছে, জানলা খোলার কি দরকার ছিলো ?

—থাক না খোলা, পরে বন্ধ করে দেবো।

বিমল একটা সিগারেট ধরালো।

কথায় কথায় রাণী বললে, আচ্ছা মেয়েটি যে ওরকম অবৈধভাবে ভালোবেসে চলল, এর শেষ কোথায় জানো ?

—শেষ পর্যন্ত দেখলেই তো জানা যেত, বিমল বললে, কিন্তু আমি জানি, বই পড়েছি, Anna আত্মহত্যা করলো।

—আমিও তাই ভাবছিলুম। ওরকম জীবন কখনো ভালো নয়। তার শেষ কখনো ভালো হতে পারে না।

—কিন্তু মানুষের ভুল বলে একটা জিনিষ আছে, এটা তো স্বীকার করো!

—করি, কিন্তু এও জানি, সে ভুল আমরা জেনে শুনেই করি। তাই তার ফল কখনো ভালো হয় না। কেবল দুঃখ আর দুঃখ। তার পরের জীবন একটা কান্নার সমুদ্র। ওর জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু সেজন্যে তুমি আর কি করতে পারো বলো ? যে মেয়ে স্বামী আর ছেলে থাকতে আর একজনকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার, ধরো তোমার কাছেই যদি ওরকম কোন ঘটনা ঘটে, তার পক্ষে তুমি কি তাহলে সাক্ষী দিতে পারবে ? পারবে না। কেবল দুঃখই হয়।

—তাছাড়া আর উপায় কি বলো ? কিন্তু তুমি যা বললে তা না করতে পারলেও নিজের দিক থেকে প্রশান্ত মনে ক্ষমাও তো করতে পারি ?

—তা পারো। রাণী আবার শুয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কাটলো চুপচাপ। বিমলের সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। সে হাত পা গুটিয়ে বসেই রইলো। পাশের বাড়ীর বাসন মাজার শব্দ কানে আসছে।

—ঘুমুলে ?

—না।

—হঠাৎ অত মনমরা হয়ে গেলে কেন ? বিমল যেন অনেক সাহসে বললে।

—কি হবে অত পরেরটা ভেবে ? রাণীর স্বর ভারী হয়ে এলো।

বিমল লক্ষ্য করছে, তবু বললে, তা ঠিক! তবে শুধু নিজের ভাবনাই তো সার নয়।

—এও ঠিক, কিন্তু সার নয় কখনো, যখন নিজের ভাবনা বলে একটা কিছু অন্তত থাকে।

বিমল আবার জিজ্ঞেস করলে, সে কি একেবারেই নেই ? ·

—আছে কি নেই তা কি তুমি নিজেই জানো না ? রাণী উষ্ণ হয়ে উঠলো, কেন আবার আমাকেই জিজ্ঞেস করছো ? তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান, এটুকু বোঝবার শক্তি আমার থাকলে তোমারও নিশ্চয়ই আছে। ভাবনা ! সে কার থাকে ? যার ভাবনার বিষয় আছে, আছে উপকরণ। আমাদের কি তা আছে ? তুমি বলো। তুমিই খুঁজে বের করো।

—আমি তো অনেক দেখেছি, পাইনি। জানতাম, তোমারও নেই। এখন দেখছি কিছু আছে। বলো তাহলে। কিছু সময় কাটানো যাবে। যে দিনগুলো এত অবহেলায় আর আলস্যে কাটছে সেগুলোর কিছু অন্তত কাজে লাগানো যাবে।

—ইস, আমি তো আর পারিনে। রাণী আর বলতে পারলো না, স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন, সে বালিসে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো।

বিমলও চুপ করে গেল। রাত বেড়ে চলেছে। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে হুইসিলের শব্দ। শহরের প্রান্তে গভীর রাতের ট্রেন যাচ্ছে।

বিমলের চোখে ঘুম নেই। সে নড়ে চড়ে বসলো। কি শীত ! ঘরের আলোটাও দুরন্ত শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একটা কি রকম যেন অলসতায় বিমল চেয়ার থেকে উঠলো·না।

গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

এবার সে চমকে উঠলো। চেয়ার থেকে উঠে জানালাগুলো আগে বন্ধ করলো, তারপর সেইখানেই কতক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে খাটের কাছে গেল। রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ঘুমের চোখেই হয়তো আলোর দিকে পাশ ফিরে শুয়েছে। বাহিরের পোশাকই এখন গায়ে। সেই জরিপেড়ে নীল সিল্কের শাড়ী, গায়ের সব কিছু একেবারে একটা গরম জামায় গিয়ে শেষ, বুকের মাঝখানে সবগুলো জামা ঈষৎ ফাঁক হয়ে একটা কোণের মত সৃষ্টি করেছে। শুভ্র কতটুকু বুক। একটা সরু হার। চারদিকে একটি মিষ্টি গন্ধ।

বিমল ডাকলো না।

নিঃশব্দে ভাঁজ করা লেপটি তার গায়ের ওপর টেনে দিয়ে এবার টেবিলের কাছে একটা বই খুলে পড়তে লাগলো। সময়ের বিরাম নেই। একটা বিড়াল এসেছে ঘরে। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু আশ্চর্যের যা তা হচ্ছে ওর ভীষণ চেহারা—গায়ের রঙ মিশকালো, একটু সাদা ছিট নেই, আর চোখদুটো আলোর ভাঁটার মতো জ্বল জ্বল করছে। হঠাৎ দেখলে ভয় করে।

বিড়াল। বিমল দেখতে পেয়েছিলো। সে এটা আরো অনেকবার দেখেছে, কিন্তু অন্যবার আজ রাতের মতো হয়ে ওঠেনি। সে চেয়ে রইলো তার দিকে একদৃষ্টে, বিড়ালটাও চেয়ে রয়েছে একই রকম ভাবে।

বিমলের হঠাৎ ভয়ানক হাসি পেল: মনে মনে বললে, ওরে তোরও কি নিদ্রাবিহীন রাত্রি?

কিন্তু এখন হাসবার কথা নয়। ভয় পাওয়ার, নইলে রাগবার কথা। বিমল এবার রেগে গেল, হাতের কাছে ছিল একটা খালি সিগারেটের কৌটো, খুব চুপিচুপি সেটা হাতে নিয়ে হঠাৎ ছুঁড়ে মারল বিড়ালটার দিকে। কিন্তু তার পায়ে সেটা লাগল না। বিড়ালটা যেখান দিয়ে এসেছিল সেখান দিয়েই দৌড়ে পালাল।

ইতিমধ্যে কৌটোর শব্দে রাণী জেগে উঠেছে। বিমল অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি আবার বইয়ে মন দিলে। রাণী আশ্চর্য হয়ে বললে, ওকি তুমি এখনও বসে!

সে আস্তে উঠে তার কাছে এল, বললে কটা বেজেছে?

—বোধ হয় একটা।

—একটা! রাণীর চোখ দুটি বড় হয়ে গেল, বলল, আর তুমি এখনও জেগে?

—তা এমন কি হয়েছে। রাত একটা, এমন কি! বেশী ঘুমনো কি ভালো? জগতে যত বড় বড় লোক আছেন তাঁরা কখনও বেশী ঘুমোননি, বই খুলে দেখ গিয়ে।

এই কয়েক ঘণ্টা আগের কথা রাণীর মনে পড়লো, হঠাৎ অনুতাপে, আর একটা দুঃখে তার চোখ দুটি সজল হয়ে এলো। বলল, তুমি কি বড়-লোক?

—না, তা নই, কিন্তু মহাজনপন্থা অনুসরণ করতে তো হবে।

—দরকার নেই। রাণী যেন ভয়ানক অনুতপ্ত হয়ে বললো, আমার অনেক অপরাধ হয়েছে। তুমি এখনও না খেয়ে আছো. আর আমি কিনা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! আমাকে ক্ষমা কর।

মাথাটি নীচু করে সে দুহাত জোড় করল। বিমল তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে তার দুটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বললে, আহা, একি করছ? তোমার কিছু অপরাধ হয়নি। আমি এতটুকু মনে করিনি।

কতক্ষণ এমনি কাটল। রাণী হঠাৎ বললে, চল খেতে।

বিমল খেতে গেল।

কয়েকদিন পর। একদিন সাইকেলে করে একটি চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সী ছেলে এল। দুপুর বেলা।

কি একটা পর্ব উপলক্ষে বিমলের অফিসে ছুটির দিন।

ছেলেটি রাণীকেই খুঁজছিল। রাণী তার কাছে গিয়ে বললে, কাকে ডাকছো?

—বিমলবাবুর বাসা না এটা?

—হ্যাঁ।

—মানে, তারই—মানে, আমার দিদির বন্ধু রাণী বলে কেউ আছে এখানে?

—আছে। রাণী মুচকি হেসে বলল।

—তাকে একটু ডেকে দিন না।

—আমিই।

—ওঃ আপনি। ছেলেটি তাড়াতাড়ি সার্টের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে তার হাতে দিয়ে বললে, দিদি লিখেছে। কালকে আবার ঠিক দশটার সময় আসবো।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, রাণী তাড়াতাড়ি বললে, আমাকে এখনই আবার উত্তর দিতে বলেনি তো?

—ওঃ, একেবারেই ভুলে গেছি। ছেলেটি সাইকেল রেখে আবার কাছে এসে বললে, আমার সঙ্গেই উত্তর দিয়ে দিতে বললে।

—এই ভাখো, আমি মনে করে দিয়েছি বলেই না! তুমি এই ঘরে একটু বসো, আমি আসছি।

—আচ্ছা।

—রাণী আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে গিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলে পড়ল। লেখিকা তার স্কুলের সময়কার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতা। তার ছেলের অন্নপ্রাশন কাল। তাকে আর বিমলকে যেতেই হবে, নইলে ভয়ানক রাগ করবে। আরও নানা কথা।

রাণী হাসল, এই না সেদিন বিয়ে হল! হ্যাঁ, সেদিন বলেই তো মনে হচ্ছে, আর আজই ছেলের অন্নপ্রাশন!

আর লিখেছে, রাগ করবে। কুমারী জীবনে যখন ও ছাড়া আপনার বলতে আর কেউ ছিল না, তখন একথা শুনলে কি ভয়ই না পেত, কিন্তু আজ আর ভয় হয় না, চোখেও জল আসেনা, বরং—

এই তো সেদিন বিয়ে হল। আর আজই ললিতা ছেলের চিন্তায় মশ্‌গুল। সমস্ত চিঠিতে কেবল তারই কথা। বরং এখন রাণীর যেরকম অবস্থা—তার বুক কোথাও যেন ব্যথায় কন্‌কনিয়ে উঠল, কোথাও যেন একটু রাগও সঞ্চিত হয়েছে।

সে থমকে দাঁড়ালো, না আমি যাব না। একদিন যখন ভাব ছিল তখনই এসব আবদার খাটত, আজ আবার তার পুনরালোচনা কেন?

—রাণী, ওখানে দাঁড়ালে কেন? চিঠি কার? বিমল এসে দাঁড়ালো।

—কারুর নয়। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গিয়ে একখণ্ড কাগজে 'তার কিছুতেই যাওয়া হবে না', এই লিখে ভাঁজ করে ছেলেটিকে দিয়ে এলো। সে সাইকেল নিয়ে চলে গেল।

বিমল কিছুই বুঝতে পারেনি, ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়েছিল, জিজ্ঞেস করল, কি হল, ও কার চিঠি?

রাণী চিঠিটা হাতের মুঠো থেকে বিমলের কাছে ছুঁড়ে দিলে।

—আমি পরের চিঠি পড়ি না, তুমি যদি পার বলো।

—স্বামী যে কি মনে করে তার স্ত্রীর কাছে দেওয়া কারুর চিঠি পড়তে পারে না, সে তো আমার জানা নেই!

সে তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে চলে গেল। বিমল স্তব্ধ।

বিকেলবেলা মনটা হয়তো একটু হাল্কা হোল। রাণী ভাবল, সে কি

পাগল হয়েছে? কি করতে কি করে ফেলছে। একসময় এসব কথা মনে হলে যে হাসি পায়!

বিমল তখন বাইরে বেড়াতে বা'র হচ্ছিল, সে এসে বললে, চিঠিটা লিখেছে আমার বন্ধু ললিতা, সেই যে যার কথা তোমাকে অনেক বলেছি। ওর ছেলের অন্নপ্রাশন।

—ছেলে! বিমল সমস্ত ব্যাপারটা এক মুহূর্তে মনে করে নিলো, তার দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকালো।

—হ্যাঁ, রাণী বললে, তা আমাদের যেতে বলেছে, অনেক অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে। কিন্তু কে যায়? আমি যেতে পারবো না লিখে দিয়েছি। তুমি কি বলো?

বিমল বললে, আমি কি বলবো? তবে, একজনের দুঃখ যে তোমার চেয়ে বেশী হবে, এটা বেশ বুঝতে পারি।

—আমার চেয়ে! রাণী অতি কষ্টে বললো।

—হ্যাঁ। আমি কিন্তু যেতেই বলি।

বিমল আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

পরের দিন ললিতা নিজেই এলো। রাণী এতটা ভাবতে পারেনি। বড়োলোক, তাদের কতো আত্মীয়-স্বজন, জীবনের কতো প্রাচুর্য্য, সে-সব চাকচিক্য ফেলে তার মতো নগণ্য একজন বান্ধবীকে নিজে নিয়ে যেতে আসবে, এটা কল্পনা করা যায় না।

ললিতা বললে, তুই তো জানিস, আমার এখানে কেউ নেই।

—কেউ নেই? আমি তো জানতুম অনেকে আছে।

—না, আত্মীয় বলতে কেউ নেই। বাবা তো কবেই এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন। কিন্তু রাণী তুই 'না' লিখে দিলি কেন? হায়রে নিষ্ঠুর, ছোটবেলার কথা আজ বেমালুম ভুলে গেছিস!

দুজনেই হেসে উঠলো।

হাসি থামতে ললিতা বললে, তবে আমি যাই, এখনও অনেক কাজ ভাই, অনেক কাজ। ছেলেটাকে আবার ফেলে এসেছি। কি হ'লো কে জানে! তোরা নিশ্চয় করে যাবি। নইলে দেখবি, আবার এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার কি এখন আর মরবার সময় আছে? নানাদিকে নজর রাখতে হয়। যাই ভাই।

ললিতা একটা আলেয়ার মতো মিশে গেল। ইস্ কি রূপ। একটা অগ্নিশিখার মতো দেখতে হয়েছে। আগে এত সুন্দরী ছিল না। ললিতা ছিল ছোট, কিন্তু আজ যেন তাকেই বড়ো দেখা যায়।

যথাসময়ে রাণীরা ওদের বাড়ী গেল।

লোকজন সত্যি তেমন নেই। কিন্তু সেই কয়টিতেই সমস্ত বাড়ীটা হাসি-কোলাহলে মুখরিত করে রেখেছে। ছেলের জন্যে শোবার ঘরেই একটি দোলনা করে দেওয়া হয়েছে। নরম বিছানায় শোয়ানো। সুন্দর, ফুটফুটে, মার আদলই পেয়েছে বেশী। গলায় মালা, কপালে চন্দন, চোখে কাজল। ছোট হাতপাগুলো শূন্যের দিকে ছুঁড়ছে আর মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ। করছে রাণী দোল্‌নাটা একটু দুলিয়ে দিলো।

ললিতা বললো, অনেক নাম মজুত হয়েছে। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। তুইও একটা বল, রানু—

—বলে কি হবে, আমার দেওয়া নাম তো আর রাখবিনে!

—পছন্দ হলে রাখবো, বল তুই।

—আমি কি নাম রাখবো! রাণী হেসে ফেললে, বললে, যা, রাখলুম চয়ন।

—বাঃ, বেশ নাম তো। তোর ভাই পছন্দ আছে। এই নামই রাখবো। একটু দাঁড়া, আমি আসিগে, এই নামই রাখা হ'লো।

ললিতার খুশী আর ধরে না। বিকেলবেলা রাণীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর সুমুখে বাগানের ধারে গিয়ে বসলো।

রাণী বললো, আর কতক্ষণ থাকবো বল্, সেই কখন এসেছি।

ললিতা তার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, তাতে কি হয়েছে, আজ বৈ তো নয়। আর তুই যদি এমন কথা বলিস, তবে কে আর বলবে না? রানু, টের পাচ্ছিস, দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করেছে, আর ওই যে ঝাউ গাছ, দেখছিস তো?

রাণী কিছু দূরে একটা ঝাউগাছের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, হুঁ দেখছি।

—ওগুলো দেখে কি মনে পড়ে?

—মনে পড়ে অনেককিছু। কিন্তু লতা, সে-সব কথা মনে করে' কি লাভ?

—লাভ নেই, কি বলিস? আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস? ললিতা রাণীর মুখটি দুহাতে চেপে ধরে তার গালে একবার ঠোঁট দুটি স্পর্শ করে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

রাণী হাসলো। কিন্তু ললিতার হাসি যেন তাকে বিঁধছে। ঝাউগাছের নীচে টুকরো ছায়া বাতাসে কাঁপছে। রাণী কাতরভাবে বললে, আজ আসি ভাই, সেই কখন এসেছি!

—না কিছুতেই যেতে পাবি না।

—আমাকে মাপ করো ভাই।

এ-কথায় যদিও ললিতা একটু বিমর্ষ হয়ে গেল, কিন্তু তবুও তার কাছে রেহাই পাওয়া শক্ত।

রাত ন'টা অবধি কিছুতেই বাড়ী যেতে পারলো না। বিদায় দেওয়ার সময় গেটের কাছে ললিতা এল, আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু রাণী তার নিজের মুখে একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত জানাতে পারলো না।

বাসায় এসে বিমল বললো, চমৎকার লোক! কি বলো?

ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলে রাণী কাপড় বদলাতে চলে গেল।

বিমলের একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে। তাদের অফিসের তার এক ফেলো-অফিসার এসেছেন এ-পাড়ায়। বুড়োমানুষ, রিটায়ার্ড হবার সময় হয়ে এসেছে। অত্যন্ত রসিক, আর ভয়ানক গল্প বলতে পারেন, এঁকে ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে বিমলের তাসের আড্ডা চলে, অনেক রাত অবধি, সময়কে চোখ রাঙিয়ে।

রোজ রাতে নীচের ঘরে আলো জ্বলে নিষ্কম্প। জানালা দিয়ে সে-আলো গিয়ে অনেক দূর পড়ে। ভেতরে চারটি প্রাণী খেলায় রত। হঠাৎ একদিন রাণী ডাকলো, বললো, তোমার খাওয়া-দাওয়া নেই?

—ওঃ, ভুলেই গেছ্‌লাম। তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব, না?

স্বামীর এই অপ্রতিভ ভাব দেখে রাণীর একটু কষ্ট হয়, বলে, না, কষ্ট আর কি! আমার তো বেশ মজা! খালি ঘুমুই, আর জেগে থাকলে বই পড়ি।

কিন্তু ওঁরা কি গেছেন? আলোটা ধরে বিদেয় দিয়ে এসো, নইলে কে জানে কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বেন।

কথার ইঙ্গিত ধরে বিমল লজ্জা পেলো, নম্রভাবে বললো, না পথ তো খারাপ নয় যে হোঁচট খেয়ে পড়বেন।

—এই রাতে তুমি হেঁটে দেখেছ?

শূন্যের বাতাস ভারী, আকাশ মেঘাবৃত, পৃথিবী প্রাণহীনতায় স্তব্ধ, শেষরাতে কুকুরের ডাক, নিশাচর মানুষের ক্লান্ত পদধ্বনি আর কঠিন শীত—আর পাষাণ শীতল দেহ।

রাণী কেবল বসে থাকে। বিষণ্ণ সন্ধ্যা, রাত্রি আসে চুপিচুপি, যায় নিঃশব্দে, সে তখন চমকে ওঠে।

বসন্তের হাওয়ায় পরশ নেই!

রোজই রাত্রে বিমলকে ডেকে পাঠাতে হয়, নইলে তার হুঁশ হয় না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়। সেদিন হয়তো রাণী ঘুমিয়ে থাকলো, আর রাত বারোটা একটা অবধি তাস খেলে বিমল শোবার ঘরে সেই চেয়ারে বসেই বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলো। রাণীকে ডেকে জাগাতে তার ভয় হয়।

আর পাণ্ডুর আলোয়, তার হাতে যে ধরানো সিগ্‌রেটটা থাকে তার সাদা ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের দিকে ওঠে।

ল্যাম্পের আলোর রঙ যেন ধূসর, শীত যেন সহ্য করা যায় না। সমস্ত খাট জুড়ে ঘুমিয়ে আছে রাণী।

বিমলের বন্ধু অলোক; শিলং-এ থাকে, তার আসার কথা ছিল। সে চিঠি লিখেছিলো। একদিন হঠাৎ এসে হাজির হলো।

বিমল খুশী হয়ে বললে, এতদিন পরে যে? সেই কবে লিখেছো তো?

—সময় যে করে উঠতে পারিনে, কিন্তু আগে যদি জানতুম তোমার গৃহে আমার এমন বৌদি আছেন তবে কি আর এত দেরী করি।

অশোকের কথাই এরকম, অথচ কেউ কাউকে দেখেনি। রাণীর চমক লাগলো।

অশোক বললে, আমি মনে করেছিলুম, ইস্কুলের সেই ফার্স্ট বয় বিমল আমাদের জন্তে আর এমন কি বৌদি আনবে! ওঃ, এখনও বুঝি নমস্কারটা জানানো হয়নি? ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। নমস্কার বৌদি।

নমস্কার। রাণী হেসে বললে।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অশোক বললে, বাঃ বেশ সাজানো গোছানো তো! বৌদি, আপনারই হাতের গৌরব।

সে হাসতে লাগলো।

অনেকদিন এ ধরণের কথা শোনা হয়নি, সে আজ পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেল, বিমল উৎফুল্ল হয়ে বললে, নাঃ, তুই এখনও সেই চণ্ড অশোকই রয়েছিস, কবে মানুষ হবি বলতো?

—মানুষ আর হবো না, অশোক বললে, আর কেমন করেই বা হই বলো? বিয়ে তো আর করিনি—

—যাক্, বিমল বললে, একটু বিশ্রাম করো বন্ধু, আমি আসছি।

দুপুরবেলা। বিমল অফিসে।

অশোক কয়েকটা চিঠি লেখা শেষ করে রাণীকে খুঁজতে গেল। রাণী এখনও ভালো করে কথা বলেনি, কিন্তু সে আর এরকমভাবে থাকতে পারে না, তার অভ্যাস নয়।

অশোক দোতালার সিঁড়ির ওপর থেকে, নীচে গিয়ে, আবার উপরে এসে 'বৌদি' বলে ডাকলো অনেক, কিন্তু কোন সাড়া নেই। তারপর শোবার ঘরের কাছে পর্দার বাইরে থেকে ডাকলো, বৌদি, ও বৌদি, বারে আমি বুঝি একা-একা কাটাবো এমনি করে?

রাণী মাথার নীচে একটা হাত রেখে শুয়েছিলো, তন্দ্রাও একটু এসেছিলো। হঠাৎ জেগে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললে, ওঃ, আপনি!

—আপনি ঘুমিয়েছিলেন আর আমি এদিকে ডেকে ডেকে হয়রান! অশোক বললে।

রাণী হেসে বললে, আমার তা'হলে অন্যায় হয়েছে।

—কিছু নয়। আপনি আসুন। আহা, দাঁড়িয়ে রইলেন যে। তাড়াতাড়ি আসুন, দেখে যান একটা জিনিষ—

অশোকের যেখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে সেই ঘরে সে গেল, পেছনে রাণী, একটা কৌতূহল নিয়ে।

অশোক দেয়ালের গায়ে রাণী-বিমলের একসাথে তোলা একখানা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে বললে, এটা তো বিয়ের অল্পকাল পরেই তোলা, না ?

রাণী অনেকদিন সেদিকে ভালো করে তাকায় নি, আজ দেখে মনে-মনে শিউরে উঠলো, ফটোটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে, সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে কোনরকমে বললে, হুঁ ।

—তবে আমাকে এককপি পাঠাননি কেন ?

—আমি কি জানতুম যে—রাণী জোর করে একটু হাসলো ।

অশোক এ প্রসঙ্গে আর অগ্রসর না হ'য়ে বললে, বারে, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন ।

রাণী হাসলো ।

অশোক বললে, গল্প বলুন বৌদি, গল্প বলুন ।

—কি বলবো ?

—বাঃ, এই পঞ্চম বৎসরে কোন কাহিনীই কি রচিত হয়নি ? হা ভগবান ? অশোক যেন সত্যি বড়ো হতাশ হলো ।

রাণী জোর করে হেসে বললে, সে কাহিনী কি সকলের কাছেই বলা যায় ?

—নিশ্চয়ই নয় । সে-কাহিনী শুনবার অধিকার কারুর নেই । আমার ভুল হয়েছে ।

অশোক সরলভাবে হাসতে লাগলো ।

রাণীর এখন লজ্জায় লাল হবার কথা, কিন্তু হ'লো নীল । কিছু বলতে পারলো না ।

চুপ করে বসে থাকা অশোকের স্বভাব নয়, বললে, না, এরকমভাবে তো চলতে পারে না । বৌদি, তাস আছে ?

—আছে, কেন ?

—দুহাতে ব্রীজ খেলবো, নিয়ে আসুন তো ।

রাণী হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার দেখলো, মশারীর ওপরে বিছানার তলায়, দেয়ালের সবখানে খুঁজে দেখলো কিন্তু পেলো না । কি মজা, এর আগে সে নিজে আরও কয়েক জোড়া তাস ছিঁড়ে ফেলেছে রাগে, আজ তাকেই আবার নিজের প্রয়োজনে খুঁজতে হ'লো ।

সব জায়গাই দেখা হয়েছে, এবার আলমারির ওপরটা বাকী। কোমরে কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে, একটা চেয়ার আলমারির কাছে এনে, সে তার উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো, হ্যাঁ, সত্যিই আছে একজোড়া নতুন তাস।

এত দেরী দেখে এমন সময়ে অশোক এসে ঘরে ঢুকলো, তাকে এমন অবস্থায় দেখে হেসে উঠলো, বললে, উদ্যোগ-পর্ব এখনও শেষ হয়নি নাকি?

আস্তে আস্তে নামতে-নামতে রাণী হেসে বললে, হয়নি। এখন ভেবে দেখুন, এর পরের পর্ব্বটা কি রকম হ'তে পারে!

রাণী আলমারির কাছে চেয়ারটা সরাতে যেতেই অশোক বললে, আপনি যান, শাফ্‌ল করুন গে, আমি সব ঠিক করছি।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে বিমল রাণীকে অত্যন্ত খুশী দেখতে পেলো। এই দেখে তার পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। সেই আলোকিত দিনগুলোর কথা আজ এখন একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তখনকার দিন আর রাত্রিগুলো যেন হাতের মুঠোর মধ্যে আনন্দে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে থাকতো, আর বল রুমের পিছল মেঝেতে পা চালানোর মতো নিঃশব্দে গড়িয়ে যেত। কিন্তু আজ?

বিমল বললে, আজ কোন সুখবর আছে নাকি? খুশী দেখছি যে বড়ো?

—আছে, রাণী হেসে বললে, অশোকবাবু আজ সর্দারী করে নিজের হাতে চা বানাতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেন।

—এটা কি সুখবর হ'লো?

—তা নয় তো কি? অত সর্দারী কেন? আমি কতো বললাম—

—কই সে?

বিমল অশোকের ঘরে গিয়ে দেখলো, সে একটা বই পড়ছে।

বললে, কিরে চণ্ড, কোথায় দাহন হ'লো?

—খুব বেশী নয়। অনামিকার এই অগ্রভাগ।

অশোক শান্ত ছেলে হয়ে শুদ্ধ বাংলার অবতারণা করে আঙুলটিই দেখালো, বললে, আমার একটুও দোষ নেই। বৌদির মতো এমন দুষ্টু আর দেখিনি—

দু'জনের মাঝে এই সব কথার পেছনে হাস্যমুখর দৃশ্যাভিনয়ের মতো কতকটা কল্পনা করে বিমলের চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠলো।

রাণী কাছেই ছিলো, বললে, আবার বৌদির নামে কি লাগানো হচ্ছে? দুদিনের চেনা দুদিন পরেই আবার চলে যাবেন, কেন অনর্থক একজন নিরীহ মানুষকে দোষ দেওয়া বাপু!

—ওঃ, সত্যি কথা বললেই বুঝি ভালো লাগে না?

অশোক মুচকি হাসলো। বিমল চলে এলো।

আবার সন্ধ্যার ছায়া। রাত্রি। জানালায় উজ্জ্বল আলো উঁকি মারে, পথের পাশে শ্রান্ত আলো; রাতের কুয়াশা, রুদ্ধ গৃহে গৃহে চুড়ির শব্দ, আর চাপা কথা, নিঃশ্বাস। আর বিমলের নীচের ঘরের চারটি প্রাণীর চোখে ঘুম নেই।

বিমলের এখন অফিসে যাওয়ার সময়। রাণী আজ তাকে বাইরের দরজা অবধি এগিয়ে দিলে। কিন্তু এ দেখে আর কারুর না হোক বিমলকে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হতে হবে। কিন্তু সে কিছু বললে না।

কিন্তু দুপুরের ঢিমে-তেতালা সময়ে যতই চেষ্টা করুক নিজেকে দরজা বন্ধ করে রাখতে; মনকে কোথায় যেন আকর্ষণ করছিলো, যা কিছুতেই থামানো যায় না। পা এগিয়ে চললো। গন্তব্য স্থানেও পৌছলো। অশোক বিস্ময়ে বললে, আপনি!

রাণীর মাথাটি কতকটা নীচু হয়ে আসছে।

—কিন্তু দেখুন বৌদি, দোহাই আপনার, অমন আষাঢ়ে মেঘের মতো মুখ করে থাকবেন না, আমার ভয় করে, ভালো লাগে না।

রাণী অনেক কষ্টে মাথা তুলে একটু হাসলো।

—বাঃ, আপনাকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! অশোক বলেই ফেললো।

অতি আপনার জন ছাড়া আর এক পুরুষের সম্মুখে রূপ বর্ণনায় বোধ হয় কেউ সপ্রতিভ থাকতে পারে না, রাণীও পারলো না, অধোবদন হয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইলো।

একটু দুঃখ পেয়ে অশোক বললে, দেখুন বৌদি, যদি আমার কোন অন্যায় হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন। বাপ মা বোন ভাই কেউ নেই, স্নেহের

স্পর্শ কোনকালে একদিন পেলেও আজ আর চেষ্টা করেও মনে করতে পারছিনে। তাই ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক।

রাণীর এতক্ষণে চমক ভাঙলো, ব্যস্ত হয়ে বললে, ওকি, কেন আপনি ও সব কথা বলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। আমি তো কিছুই মনে করিনি।

—করেন নি, তাহলে বসুন। অশোক এবার হাসলো।

বসলে পরে বললে, আচ্ছা, এত একা আপনার কেমন করে সময় কাটে? সারাটি দুপুর—

—সে চিন্তা করে কি লাভ, কিছুই যখন হবার নয়। তবে বর্তমানে তো আর কোন আফশোষের দরকার নেই!

—আজ নয় আমি আছি, অন্যদিন?

—সেদিন আছে ঘুম, নইলে বই!

—এ সব তো আর চিরকাল ভালো লাগতে পারে না, একদিন নিশ্চয়ই বিরক্তি ধরে যাবে।

—অশোকবাবু, সেদিন আমি আত্মহত্যা করবো। হয়েছে তো?

আর না পেরে এই বলে কান্না চেপে রাণী দৌড়ে পালালো।

অশোক শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে, যে পথে রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল সেই দিকে চেয়ে রইলো।

এর পরে, দুদিন আর দেখা হয় নি, কথাবার্তাও হয়নি, যদিও দেখা করবার অবসর দুজনেরই প্রচুর। সে দিনের কথা মনে করে রাণী যেন কিছুতেই আর নিজেকে অশোকের সামনে বার করতে পারছিলো না। অবস্থা আবার আগের মতোই হয়েছে।

একবার সিঁড়ির পাশে দেখা হ'লে পর অশোক নিজেই জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি কোন অসুখ করেছে বৌদি?

—না তো।

—তবে দেখিনে কেন? অশোকের চোখের ওপর ম্লান ছায়া।

—আমিও তো আপনাকে দেখিনে।

অশোক কোন দ্বিধা না করে বললে, কেন এমন হ'লো বলতে পারেন?

—জানি না।

—আমি কিন্তু জানি।

—তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—আপনাকে ছাড়া আর কাকে করবো?

রাণী যেন সব সহজ হয়ে দাঁড়ালো। সেদিন দুপুরেই দেরাজ থেকে নতুন একখানা টকটকে লাল সিল্কের শাড়ী পরে রাণী খুব ভালো করে প্রসাধন সেরে অশোকের ঘরে গেল।

লাল শাড়ী! যেন আগুনের মাঝে সীতা দেবী।

অত্যন্ত আনন্দে অশোক কেবল বললে, বৌদি!

রাণী তার কাছে এসে একটু হেসে বললে, আপনার দেওয়া কাপড়, অশোকবাবু।

—নাকি? আমি তো ভুলেই গেছি। তা হলে, আপনাকে কখনও না দেখেও একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম সত্যি, নইলে আর এত ভালো মানিয়েছে কি করে?

রাণীর মুখে মধুর লজ্জার রঙ ফুটে উঠলো।

অশোক বললে, এটা এতদিন পারেন নি কেন?

রাণীর মুখে উত্তর নেই, তার নিঃশ্বাস চেপে আসছে। শাড়ীর পাতলা আঁচল বাতাসে উড়ছে।

আবার সেই রাত হলো। বিমলের তাস খেলা তখনও পুরোদমে চলে। ভয়ানক শীত, চারদিকে সাদা কুয়াশা, নিস্তব্ধ শহর। সমস্ত শরীরে গরম কাপড় জড়িয়ে পথে কদাচিৎ মানুষের যাতায়াত, তাদের চকিত পদধ্বনি, আর রাত্রির নিঃশব্দ গতি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাণী অগ্রসর হ'লো।

অশোক এখনও ঘুমোয়নি। ভেজানো দরজা, একটু ফাঁক। রাণী চেয়ে দেখলো, আলোর সামনে বসে অশোক কি ভাবছে।

তার পা দুটি অবশ, বুকে অসহ্য দাপাদাপি। তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চারদিকে কেবল অন্ধকার।

কিছু আগেই শোবার ঘর, কিন্তু এতটুকু পথ হাঁটতেই সে যেন ক্লান্ত, দাঁড়াতে পারছে না। রাণীর চোখ ফেটে জল এলো।

তারপর, হটাৎ একটু অন্যমনস্কতায় ওদিকে সরতে গিয়ে একটা কি যেন লাগালো পায়ে, হ'লো প্রবল শব্দ। অশোক বললে, কে? আর রাণী

ভয়ানক ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে একেবারে দরজায় খিল দিলো। বুক দারুণ কাঁপছে, যেন কিছু চুরি করছে আর কি!

রাত যখন একটা তখন বিমলের তাসের আসর ভেঙেছে। বন্ধুরা চলে গেলেন, নীচের ঘরের আলোও নিবলো।

বিমল আস্তে ঘরে ঢুকে আগের মতো সেই চেয়ারে বসলো।

টেবিলের উপর আলোটা আজ ভয়ানকভাবে জ্বলছে, সে আবার উঠে বাতিটা একটু কমিয়ে দিলে, তারপর স্থির হয়ে বসলো।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব আরামে টানতে লাগলো।

আজও জানালা খোলা, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বিমল আর কি করে, উঠে জানালা বন্ধ করে আবার বসলো। সিগারেটের অনেকখানি পুড়ে গেছে, ছাই কমেছে, আস্তে একটু ঝেড়ে ছাইগুলো ফেলে সে আবার খেতে লাগলো।

দেয়ালে ঘড়ির টিক টিক শব্দ।

ঘড়িটি অন্যদিন বেশ পরিষ্কার থাকে, আজ একটু অগোছাল, আলনার কাপড় জামায় শৃঙ্খলা নেই, মেঝেতে কাগজের টুকরো। টেবিলের ওপর দু' তিনটি বই ছড়ানো, খাটের নীচে রাণীর দুটি শ্লিপারের একটি ওই কোণে।

বিমলের সিগারেট শেষ। সেটা মেঝেতে পিষে আগুন নিবিয়ে সে বাইরে ফেলে দিলে। কি ভেবে একবার আলোটা বাড়িয়ে খাটের কাছে এলো। রাণী ঘুমিয়ে রয়েছে। মুখে দেহে যেন অনেক দিন পরে সাজ-গোজের ছাপ। চুলগুলো ভালো করে বাঁধা, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে নেলকালার, মুখটা চক-চক করছে, কানে নতুন-পরা এক জোড়া দুল, গলায়ও নতুন হার, হাতে অনেকগুলো চুড়ি।

বিমল আবার চেয়ারে গিয়ে বসলো।

রাণীর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যায়।

ঘড়িতে টিক টিক শব্দ।

হঠাৎ কান্নার শব্দে বিমল চমকে উঠলো। চেয়ে দেখলো, রাণী ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গেল,—রাণী, রাণী, ওকি? ওঠ! কাঁদছো কেন? ওঠ।

কয়েক ডাকেই সে উঠলো। ঘুমজড়িত চোখে বললে, কি হয়েছে?

তুমি কাঁদছো?

রাণীর হয়তো কিছু মনে হলো, তাই যেন খুব ভীত হয়ে আবার বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

বিমল আর একটি কথাও বললে না, নিঃশব্দে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। ঘরের কোণে, আর নানা জিনিষ-পত্রের পেছনে ছোট ছোট অন্ধকার, টেবিলের উপর সবখানে পৌছতে পারেনি। পেরেছে দেয়াল আর মেঝেতে, খাটে শায়িত রাণীর গায়ে······

বিমল এই আলোর সঙ্গে সমদৃষ্টিতে চেয়ে সবই দেখেছে, কিছুই তার চোখ এড়ায়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে কি যেন হয়, তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে, দেহ অবশ হয়ে আসে।

কপালের কুঞ্চন হয়তো বা কিছুক্ষণের জন্যে সরল হয়ে যায়। আলোর কাছে তারই নিকটতম অবস্থিতি; তাই মুখের কোনখানে এতটুকু ছায়াপাত হয়নি, সব পরিষ্কার দেখা যায়। অথচ কিছুই বলতে পারে না।

রাত বেড়ে চলেছে।

পরদিন অফিসে যাবার ইচ্ছে বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। তবু বিমল গেল এই ভেবে যে বাসায় থাকলে সামর্থ্যহীনতা আরো বাড়বে। কারুর দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু সামান্য কাজ করেই ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

রাণীর ঘরের দরজা বন্ধ। বিমল সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আলোকের ঘরে এসে দেখলো, সেখানে কেউ নেই। নীচে নেমে চাকরকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললে অশোকবাবু চলে গেছে, এই একটু আগে।

—মালপত্র নিয়ে?

—হ্যাঁ বাবু।

—কিন্তু আমাকে জানায় নি তো।

বিমল ব্যাকুল হয়ে ওপরে এলো, রাণীর বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়ালো।

এই কি বন্ধুত্ব? যাবার সময় আমাকে একবার জানাতেও দরকার বোধ করলে না?

জোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে বিমল ডাকলো, রাণী রাণী, দরজা খোলো।

দরজা খুললো। রাণীর মুখ নীচু।

বিমল তার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, অশোক কি চলে গেছে? কেন গেল? তুমিই বা ওকে বিদেয় দিলে কেন? কেন দিলে?

হঠাৎ রেগে গেল রাণী, বললে, কি বলছো তুমি? ইচ্ছে হয় মেরে ফেলো, তবু ওসব কথা বোলো না।

—বলবো না? আমাকে সে না বলে কয়ে চলে গেল কেন? আমি একটা মানুষ নই? বিমল একটু নরম হয়ে বললে, কিন্তু তুমি অত রাগলে কেন? কাল সারারাত জেগে রয়েছি, মেজাজের কি ঠিক আছে? কি বলতে কি বলে ফেলি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনে।

বিমল চলে এলো, নীচের ঘরে চুপ করে বসে রইলো।

এমনি কতক্ষণ কাটবার পর হঠাৎ বাইরে জুতোর আওয়াজ পেয়ে চম্‌কে সে মুখ তুলে দেখলো, অশোক আবার আসছে।

সে ভয়ানক খুশী হয়ে বললে, আমার ওপর রাগ কেন বলো তো বন্ধু? আমাকে বলা নেই, কওয়া নেই—সে যাক—কি হ'লো, গাড়ী ফেল করলে?

—হ্যাঁ।

—বেশ হয়েছে। ওপরে চলো।

সমস্ত বাড়ীটির মধ্যে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই। যেন কেউ মরেছে।

সন্ধ্যা হ'তে বেশী বাকী নেই, আকাশের পশ্চিমদিক লাল, কতকগুলি চিল এখনও উড়ছে আকাশে।

বিমল অনেকক্ষণ বেরিয়েছে, এখনও ফিরে আসে নি।

রাণী তার ঘরে বসে এমনি একটা বই-এর পাতা ওল্‌টাচ্ছিলো। কিছুতেই মন বসে না, আর ক্ষণেক পরেই চোখ ছলছলিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা ভাঁজ-করা কাগজ বেরিয়ে পড়লো বই থেকে। রাণী খুলে দেখলো, তাতে লেখা: তোমার জীবনের পথ থেকে স্বেচ্ছায় সরে

দাঁড়ালাম। অনেকদিন ধরেই একথাটা ভাবছি কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি। আজ সুযোগ হলো তাই করলাম। যেহেতু আমি জানি, সন্তান না হবার জন্য দায়ী আমি, আমারই দোষ, আমিই অনুপযুক্ত। নিজের জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখ হয় তোমার জন্যে। স্বামী হ'তে না পারলেও ভালোবেসেছিলাম সত্যি।

—তোমার আর অশোকের দীর্ঘ মাধুর্যময় জীবন কামনা করি। এ চিঠিখানা রেখে দিও, তোমার দরকার হতে পারে।

অকস্মাৎ একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে দারুণ চমকে উঠলো রাণী। তারপর সে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলো।

রাণু ও স্যর বিজয়শঙ্কর

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সান্ধ্যভ্রমণ শেষ হয়নি; পার্কের যেদিকটা জনবিরল সেখানে কখনো লাল কাঁকরের পথে, কখনো নরম ঘাসের উপরে স্যর বিজয়শঙ্কর নীরবে পায়চারি করছিলেন। অদূরে মানুষের ভীড় থেকে, যানবাহন পীড়িত পথের চলায়মান জনতা থেকে, একটানা কোলাহল শোনা যায়। মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল আলো এসে পার্কের দেহাবরণ খুলে সমস্ত প্রকাশ করে দিয়েছে।

স্যর বিজয়শঙ্কর নিজের মনে এদিক-সেদিক হাঁটছিলেন।

—বাবা, ও বাবা!

কান্নায় বিকৃত একটি ছোট্ট মেয়েলি স্বর যেন কাছে কোথাও শোনা গেল! স্যর বিজয় থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হলেন।

—আপনি আমার বাবাকে দেখেছেন?

মেয়েটি তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে—ফ্রকপরা, স্যর বিজয়শঙ্কর চশমা-চোখে সেই স্বল্পালোকেই তাকে দেখলেন। ঘাড় পর্যন্ত চুল, দু'হাত আর পা নিরাভরণ, মুখ চোখের জলে ভেজা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে।

—বলুন না, আমার বাবাকে দেখেছেন?

স্যর বিজয় তার ছোট একটি সরু হাত ধরে বললেন, তোমার বাবা বুঝি হারিয়ে গেছেন?

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে,—বাবা আমায় খুব ভালবাসে কিনা, আমি প্রায়ই বাবার সাথে এমনি বেড়াতে আসি, আজও এলাম, কিন্তু বাবাটা কি দুষ্টু, আমাকে একা ফেলে কোথায় চলে গেল, আমায় একবার ডাকলোও না, আমি কত খুঁজলাম, এমন দুষ্টুমিতো বাবা কখনো করে না। আমি তো আর সব পথ চিনি না, কেমন করে বাবাকে খুঁজে বের করি! আপনি দেখেছেন আমার বাবাকে?

স্যর বিজয়শঙ্কর তার মাথায় হাত রেখে বললেন, দেখিনি, কিন্তু খুঁজে বার

করে দেবো, তুমি কেঁদো না খুকি। আচ্ছা, তোমার বাবার কেমন চেহারা বলো তো?

—আপনি যেমন লম্বা না, ঠিক এমনি লম্বা। কিন্তু আপনার মতো দাড়ি-গোঁফ নেই, আর থাকবেই বা কেন, আপনার মতো বুড়ো তো নয়—কিন্তু আমি একদিন দুপুরবেলা দেখেছি, মাথায় ছোট একটা টাক, চুলও পেকেছে খুব, আমি কত ফেলে দিই তবু পাকে!

কথার বেগে মেয়েটির কান্না কমে আসছিলো। স্যর বিজয় পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার করে সস্নেহে মেয়েটির চোখের জল মুছে দিলেন। বললেন, খুকি, তুমি কেঁদো না। কোন ভয় নেই, আমিই তো আছি, তুমি কেঁদো না। আমি তোমার বাবাকে খুঁজে বার করে দেবো।

মেয়েটি তার মিষ্টি কথা শুনে, আর চেহারার আভিজাত্য, গাম্ভীর্য দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়েছিলো। ঘাড় কাত করে বললে, কলকাতার সব রাস্তা আপনি চেনেন?

কী একটু ভেবে স্যর বিজয় হেসে বললেন, তা নাহলে আর এত বুড়ো হলাম কেমন করে বলো? সব রাস্তা চিনি।

মেয়েটি মনে মনে তাঁর যুক্তি স্বীকার করলো।

—রূপসিং?

—হুজুর?

স্যর বিজয়শঙ্কর মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বললেন, এসো।

প্রকাণ্ড গাড়ী। আর কেমন চক্‌চক্ করে! মেয়েটি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। মাডগার্ডের ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, এটা আপনার গাড়ী! আমিও উঠবো না?

—হ্যাঁ! স্যর বিজয় হাসলেন।

—কতো দাম? তেমনি হাত বুলোতে বুলোতে সে জিজ্ঞাসা করলে।

স্যর বিজয় আবার হেসে বললেন, কুড়ি হাজার।

মেয়েটি আশ্চর্য্য হলো না; কারণ কুড়ি হাজার কাকে বলে তা সে জানে না। কেবল চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

—এসো। স্যর বিজয় ভিতরে গিয়ে বসে তাকে পাশে বসালেন। গাড়ী ষ্টার্ট দেওয়ার আগে বললেন, রূপসিং?

—হুজুর ?

টাকা বার করে তিনি বললেন, কুছ ট্যফি ঔর লজেন্স—

একটু পরে রূপসিং কতগুলো ট্যফি আর লজেন্স এনে হাজির করলো। সেগুলো সীটের একপাশে রেখে স্যর বিজয়শঙ্কর বললেন, তোমার খিদে পেয়েছে, না? খাও।

কিন্তু সেগুলো কয়েকটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বসে রইলো, আর তাঁর দিকে তাকাতে লাগলো—কেমন করে খাবো ?

স্যর বিজয় ওপরের কাগজ ছিঁড়ে তার মুখের কাছে ধরে হেসে বললেন, আচ্ছা, তোমার নাম তো বললে না ?

—রাণু। মেয়েটি চিবুতে চিবুতে বললে।

রাজপ্রাসাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কক্ষসারির প্রতি জানালায় দেখা যায় উজ্জ্বল আলো। কোলাহল নেই, স্তব্ধ পাষাণপুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দু'ধারে প্রকাণ্ড বাগান, চারিদিকে ঘিরে নীচু মেহেদির বেড়া, মধ্যে লাল পথ। বাতাসে নানা ফুলের সৌরভ। বিস্ময়ে অভিভূত রাণু প্রাণভরে সেই সৌরভ শুঁকতে লাগলো। সে কী বলবে ?

স্যর বিজয়শঙ্কর তার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পায়ের নীচে রঙিন পুরু কার্পেট। রাণু নীচের দিকে চেয়ে-চেয়ে উঠতে হোঁচট খেলো। আর, চারদিকে কী আলো! মুক্তার মতো ঝরে পড়ে। জায়গায়-জায়গায় মানানসইভাবে ভাস্কর মূর্তি সাজানো। আর ঘরগুলো, যেন একেকটি মাঠ; কৌচ, আলমারি, নানা দামী আসবাবপত্রে ভরা, কেবল কার্পেটে মোড়া—কোথায় মেঝে ? রাণু অবাক হয়ে ভাবে।

—এইখানটায় বসো। স্যর বিজয় একটা কৌচ দেখিয়ে দিলেন।

না ডাকতেই বয় এসে হাজির। স্যর বিজয়ের সিল্কের চাদর, জামা, লাঠি, জুতো ইত্যাদি খুলো রাখলো।

দেখবার জিনিষের ভিড়ে রাণুর মনে সব জিজ্ঞাসা এলোমেলো হয়ে গেল। তাঁর দিকে গভীরদৃষ্টিতে কতোক্ষণ চেয়ে তারপর বললে, আচ্ছা আপনার

দাড়ি এখান দিয়ে অমনি ছুঁচলো হয়ে এসেছে কেন? রাণু নিজের ছোট চিবুকটিতে হাত দিলে।

এরও আবার কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। স্যর বিজয়শঙ্কর হেসে বললেন, অমনি আমি ইচ্ছে করেই করি রাণু। একে ফ্রেঞ্চ-কাট্ বলে। তোমার ভালো লাগে না?

—না, একটুও না, কাউকে তো অমনি দেখিনি—রাণু হঠাৎ কিছুক্ষণ তাঁর মুখ আর মাথার দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা আপনি তো বুড়ো ঠাকুর্দা, আপনার চুল এত কালো কেন?

স্যর বিজয়শঙ্কর হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, আমি বুড়ো ঠাকুর্দা নাকি? কিন্তু আমার যে ইচ্ছা করে না বুড়ো হতে, একটুও ইচ্ছা করে না। একটা ওষুধ বলে দিতে পার রাণু—যাতে বুড়ো না হয়ে এমনি জোয়ান হওয়া যায়? তিনি হাতদুটো পাশে ছড়িয়ে জোয়ানের ভঙ্গী করে দেখালেন। বয় এসে ডাকলো, হুজুর?

—কিরে?

—ডাগদারবাবু।

—পাঠিয়ে দে।

ডাক্তার এলেন; পিছনে ইনজেক্সনের সরঞ্জাম হাতে একটি পরিচারক।

—হ্যাল্লো ডক্টর, আজ একটু দেরী বলে মনে হচ্ছে?

—না, স্যর বিজয়শঙ্কর, আমি ঠিক সময়েই এসেছি। ডাক্তার হাসলেন।

—ঠিক সময়? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্যর বিজয় বললেন, তাই বটে।

ডাক্তার মর্ফিয়া ইন্জেক্সন দিয়ে চলে গেলেন।

রাণু সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ করে এতক্ষণ দেখছিল, ডাক্তার চলে যাবার পর বললে, লোকটা অমনি ছুঁচ ফুঁড়ে দিলে, আপনি ব্যথা পেলেন না?

—না, রোজই দেয় কিনা, অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি ব্যথা পাইনে।

—ওরে বাবারে, আমি হলে খুব ব্যথা পেতাম—রাণু যেন ভয় পেয়ে বললে, আচ্ছা, চামড়ার ভেতরে ভরে দিলে কী ওগুলো?

—মর্ফিয়া! স্যর বিজয়শঙ্কর হেসে বললেন, তুমি ওসব বুঝবে না রাণু। এখন তোমায় সব দেখাই এসো, ওদিকে বেড়াই গিয়ে চলো।

রাণু তার ছোট সরু হাত দিয়ে তাঁর লম্বা ভারী হাতটি ধরলো।

—এই দ্যাখো, এই যে আলমারি, টেবিল, চেয়ার, এই যে বড়ো আয়না,

ছবি—সব আমার। আর এই যে আমার ছবিটা, অনেক খরচ করে তৈরী করিয়েছি, ছাখো, আমার চেয়ে কতো বড়ো? এই ঘর-বাড়ী-দোর, সব আমার। আমার বড়ো ছেলে এঞ্জিনিয়ার, ভিন্ন থাকে, কী আশ্চর্য্য ছাখো, আমার চেয়ে বড়োলোক হয়ে উঠেছে! এতে আমার হিংসা হয় না, বলো? আর তিন ছেলের একজন থাকে নরওয়েতে, আর একজন ক্যালিফোনিয়ার হলিউডে, আর একটি শ্রীনগর কাশ্মীরে। আর এই হলটার মেঝেটা ছাখো, এখানে কার্পেট নেই, সাহেবদের নাচের ঘর এমনি থাকে, তার চেয়ে ভালো করতে সখ হলো একটা করেছি, কী চক্‌চকে ছাখো, চেহারা পর্যন্ত দেখা যায়। থাক্‌, ওখানে গিয়ে কাজ নেই পিছলে যাবে—এদিকে এসো।

—আপনি তাহলে মস্ত বড়লোক! আপনি একটা রাজা! বাবা কী বলে জানেন? বলে, বড়লোকেরা দস্যি, ডাকাত, পরের লুঠ করে নেয়—

স্যর বিজয়শঙ্কর থমকে দাঁড়ালেন, রাণুর মুখের কাছে নীচু হয়ে অনাবশ্যক উচ্চস্বরেই বললেন, তোমার বাবা আর কী বলেন?

—বলে, আমাদেরটা চুরি করে নিয়ে তারা বড়োলোক। তাই বুঝি আমরা খুব গরীব, না? বলে, আমাদের বড়োলোকেরা মদ খাইয়েছে—আচ্ছা, মদ খেলে কি হয়? বাবাও মদ খেয়েছে নাকি? বাবা আরও কত সব বলে। সবাই বলে, আমার ভুলো মন, সব ভুলে গিয়েছি।

—তোমার বাবা! স্যর বিজয়শঙ্করের গলার স্বর আরও উঁচু হয়ে উঠলো, কাছেই একটা কোচে বসে পড়ে বললেন, মিথ্যে কথা। তোমার বাবা মিথ্যুক!

—আমার বাবা মিথ্যুক? সব বাবাকে বলে দেবো কিন্তু। আপনি নিজে মিথ্যুক!

চোপ্‌! স্যর বিজয় ভয়ানক চিৎকার করে উঠলেন, তাঁর শরীর কাঁপতে লাগলো, তারপর মুখ নীচু করে কপালে হাত রেখে বসে রইলেন।

—আপনি মিথ্যুক। আমার বাবাকে খুঁজে বার করে দিলেন কই? আমি সব বলে দেবো, সব বাবাকে বলে দেবো। বাবা, ও বাবা, আমাকে একা ফেলে তুমি কোথায় গেলে? আমি তো কোন দুষ্টুমি করিনি, তুমি তো জানোনা, কী কান্না পাচ্ছে! বাবা, ও বাবা, বাবা—রাণু ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি বারান্দা ধরে নামবার সিঁড়ি খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে স্যর বিজয়শঙ্কর মুখ তুলে দেখলেন, রাণু সেখানে নেই। তিনি

তাড়াতাড়ি উপরের সকলকে জিজ্ঞেস করে নীচে গেলেন। সেখানে একজন কেবল বললে, কে একটি ছোট্ট মেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেছে।

বেরিয়ে গেছে! এখনও তো তেমন রাত হয়নি, রাস্তায় লোকজন মোটর ইত্যাদিতে ভরা! অতোটুকু মেয়ে, রাস্তাও চেনে না।

—রূপসিং? রূপসিং?

কণ্ঠস্বরে গুরুত্ব বুঝে রূপসিং ত্রস্তে এলো। —হুজুর?

—সেই মেয়েটা এইমাত্র রাস্তায় বের হয়ে গেছে, কখন কোন্ অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে বসে কে জানে—তুমি শিগ্‌গির গাড়ী নিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি খুঁজে দেখো, রাস্তায় পেলে উঠিয়ে নেবে, হয়তো কাঁদবে আর জেদ করবে, তবু উঠিয়ে নেবে। নইলে এমনি বেঘোরে মারা যাবে নাকি? যাও শিগ্‌গীর—

হুশ্—রূপসিং গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো।

—পেলে না?

—নোহি, হুজুর।

স্যর বিজয়শঙ্করের আর ভালো লাগলো না: হয়তো মেয়েটা এতক্ষণে কোন প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী বা বাসের নীচে—উঃ, সে তো তাঁরই জন্যে, তাঁর দোষেই যে সে চলে গেছে!

বহুমূল্য খাট আর তার ওপর পুষ্পকোমল শয্যায় স্যর বিজয়শঙ্কর না খেয়েই শুয়ে পড়লেন। পরিচারকরা ডাকতে এসে তিরস্কার শুনে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখলেন: রাজপথ—তিনি মিটিংএ যাচ্ছেন, হঠাৎ একটি ছোট মেয়ের চীৎকার জনতার গোলমালে মিশে গেল; তিনি নেমে দেখলেন তাঁরই বিপুল মোটরের তলায় রাণু চাপা পড়েছে—তার ছোট ফর্সা মুখ কেমন চ্যাপ্টা, আর কী রক্ত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই অবস্থাতেও রাণু কথা বলছে—বাবা, ও বাবা, তুমি কোথায় গেলে? রাজার মতো বড়োলোক, আর ছুঁচলো দাড়িওলা একটা বুড়ো তোমাকে গাল দিলে, মিথ্যুক বললে! বাবা, ও বাবা, আমায় একা ফেলে তুমি কোথায় গেলে?

স্যর বিজয়শঙ্করের বিলাসী ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। বাকি রাতটুকুও আর ভালো ঘুম হলো না।

এক্স্‌-সোলজার

ছোট দোতালা বাড়ী, তবুও আমাদের পক্ষে বেশী হয়ে যায় বলে নীচের ঘরে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় একজন ভাড়াটে আনলাম।

লোকটির নাম শৈলেশ, সঙ্গে স্ত্রী আর চারটি ছেলে-মেয়ে।

যেদিন তারা প্রথম এলো তখন রাত্রি, লোকটাকে সেদিন আর দেখিনি। কিন্তু পরদিন কলের পাড়ে মুখ ধুতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম তার চেহারা দেখে। মিশকালো তার গায়ের রঙ, চোখ দুটি বড়ো, লম্বা আর ভয়ানক জোয়ান, সমস্ত গা লোমে ভর্ত্তি, মাথায় চুল উলটানো। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর যা, তা হচ্ছে তার গোঁফ জোড়া। স্যর আশুতোষেরও বোধ করি এমন গোঁফ ছিল না। নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম, এই ভেবে যে রাতে না দেখে ভালোই করেছি, দেখলে হয়তো মূর্চ্ছা যেতাম। এখানে বলে রাখা দরকার যে, তাকে যে আমার নীচের ভাড়াটে ঠিক করেছিলাম, আমি নিজে দেখে নয়, কথাবার্তা চলেছিলো অন্যের মধ্যস্থতায়, আর সে বাসাও দেখে গিয়েছিলো আমার অ-সাক্ষাতেই।

সে যাক্।

আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। বাইরেরটা দেখে প্রথম যা ভেবেছিলাম তেমন কিছুই নয়। লোকটা গল্প করতে পারে খুব, যখন একবার আরম্ভ হয় কিছুতেই আর শেষ হয় না। কথা শুনে যা বুঝলাম তাতে অবস্থা ভালোই মনে হয়।

একদিন রাত্রে নীচ থেকে একটি ছেলের ভয়ানক কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেকক্ষণ অমন চিৎকার শুনে আর থাকতে না পেরে বারান্দায় এসে ডাকলাম,—শৈলেশবাবু, ও মশাই—

শৈলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? ছেলেটাকে অত মারছেন কেন?

—আর মশাই! এমন দুষ্টু ছেলে কারুর ঘরে নেই। সন্ধ্যে থেকে বলছি

পড়তে বসতে, না, ওর কানেই যায় না! আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখনও পর্যন্ত 'নাউন' কাকে বলে জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে বসে থাকে, আবার ইদিকে পড়তেও বসে না। তাই এমন রাগ হলো যে খুব মার দিলাম।

—তা বলে কি এমন ভাবে মারতে আছে?

শৈলেশ চেঁচিয়ে বললেন, কি জানেন, আমরা ওর চেয়ে বড়ো হয়েও বাপের কাছ থেকে অনেক বেশী মার খেয়েছি। এমন কি, হাত-পা বেঁধে পর্যন্ত ঘরের ছাদে ঝুলিয়ে রেখেছে। এত শাসন ছিল। আর সেই শাসন পেয়েই না আজও সবকে ভয় না করে চলি! আমি চাই, আমার ছেলেও তেমনি হোক। লোকে বলুক হ্যাঁ, এ ছেলে শৈলেশ চক্রবর্তীর নাম রেখেছে বটে!

ছেলেটার কান্নার শব্দ ক্রমে কমে আসছে।

নীচের থেকেই শৈলেশ বললেন, দেখুন চক্রবর্তী পরিবারের আমরা তখন একটি দুটি নয়, পঞ্চাশটা ভাই ছিলাম। শুনে আশ্চর্য হবেন। আমার বাবারা ছিলেন পাঁচ ভাই, সব একসাথে। আজকালের মতো নাকি যে দুটি ভাইয়েতেও একান্নবর্তী সংসার চলে না? হাঁ, তখন আশে পাশের সমস্ত গাঁ আমাদের নামে ভয় পেতো। এত নাম ছিল চারদিকে।

হাসি পেলো খুব, কিন্তু না হেসে বললাম, এখন আপনার আর ভাই সব কোথায় গেল?

এখন কি আর সব একখানে আছে! এই তো ধরুন, আমি এখানে, কেউ কোলকাতায়, কেউ থাকে চাটগাঁ, কেউ জলপাইগুড়ি, কয়েক ভাই গাঁয়ের বাড়ীতে থেকে জমি-জমা দেখছে, আর কয়েকজন মারা গেছে।

শৈলেশ অনায়াসে একটা হিসাব দিলেন, আমি হাসি চেপে চুপ করে গেলাম। সেদিন এই পর্যন্ত।

তারপর এক রবিবার দুপুরবেলা, আমি বসে একটা বই পড়ছি। সুরমা গেছে খেতে। বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

—কি করছেন? শৈলেশ কিছু না বলেই একটু হেসে ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

দুপুরবেলা সুরমার বদলে এই লোকটির নিমন্ত্রণহীন উপস্থিতিকে উৎপাত ভেবে বিরক্ত হলাম। এখন দুঘণ্টা বসে অনর্গল বকুনি শুনতে হবে আর কি! কিন্তু মুখে কিছু না বলে বললাম, এ কয়দিন আপনাকে দেখিনি যে?

—আর বলেন কেন মশাই! গিয়েছিলাম বন্ধুর বিয়েতে, ধরে নিয়ে গেল, কি আর করি? মেয়ের বাড়ী-গাঁ-দেশে। কিন্তু গিয়ে দেখি একেবারে অজ পাড়াগাঁ, যত ছোটলোকের আড্ডা। এর চেয়ে খারাপ জায়গা আমি আর জীবনে দেখিনি। আরে বাপরে, কী জঙ্গল! তার ওপর আবার ক'দিন সমানে বৃষ্টি, এখানেও হয়েছিল কিন্তু ক'দিন সমানে তো নয়? ওখানে হয়েছিল খুব। আর কেবল কাদা। আমি তো ঘরের বারই হইনি।

তার কথার দিকে বেশী মনোযোগ অমোর নেই দেখে আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, কি বই ওটা?

—এমনি একটা ইতিহাস। বইটা পাশে রেখে বললাম, বসে আছি তাই টেনে নিয়ে পাতা উল্টোচ্ছিলাম।

—তাহলে এই দেখুন, শৈলেশ খুশী হয়ে বললেন, ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম। আপনি আমাকে ডাক দিলে তো পারতেন।

লোকটার নির্বুদ্ধিতা ক্ষমার যোগ্য নয়।

গোঁফে কয়েকবার হাত বুলিয়ে শৈলেশ বললেন, মানুষের কাণ্ড দেখে অবাক হতে হয়।

—আবার কি হলো?

—শুনুন একটা ব্যাপার। আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। কিছু খারাপ কথাও আপনাকে শুনতে হবে, কিছু মনে করবেন না যেন। সেদিন বিকেলে বাইরে বেরুচ্ছিলাম। গলির মাথায় যে বাসাটি আছে—এখনও তো ভালো করে এ পাড়ার সকলকে চিনিনা—সেই বাসার দোতলার বারান্দায় কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেতে যেতে আমি লক্ষ্য করলাম, তারা আমাকে দেখে হাসলো। আমি ভাবলাম, আমাকে দেখে হাসবার কি আছে, না, অন্য কারুর দিকে চেয়ে হাসলো? আশে পাশে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই। তারপর চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ খিল খিল হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ওরা আমাকে ঠাট্টা করছে। একটা মেয়ে তার ঠোঁটের দুদিকে দুহাতে আঙুল দিয়ে টেনে আর একজনকে এমনি করে দেখাচ্ছে—শৈলেশ নিজের হাতে তা দেখিয়ে বললেন, মানে তোরা ছাখ, লোকটার কতো বড়ো গোঁফ! এ নিয়েই হাসাহাসি। আচ্ছা বলুন তো, এ সব কী? এগুলো কি ভালো? বড়োলোক বলে মানুষকে এমন ঠাট্টা করে নাকি? অমন দু চারটে বড়োলোক আমি এখনও কিনে রাখতে পারি।

এমন ব্যাপার শুনলে কার না হাসি পায়, হেসে বললাম, তারপর কি হলো ?

—আপনি হাসছেন, কিন্তু বলুন তো এরকম করা কি উচিত ? তারপর কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইচ্ছে হলো একবার বলি, পুরুষের পরিচয় হলো এক জোড়া গোঁফে আর মেয়েদের সৌন্দর্য হচ্ছে—

পরের কথাটুকু আন্দাজ করে বিরক্ত হয়ে বললাম, থাক, থাক, ও সব কথায় কাজ নেই। কিন্তু শৈলেশ থামলেন না। বললেন, তোমরা যদি তা কেটে ফেলতে পারো, আমি আমার এই গোঁফ জোড়াটিও তা'হলে মাত্র দু পয়সা খরচ করে কেটে ফেলবো।

—আহা, শৈলেশবাবু আপনি এসব কি বলছেন ?

—কি আর বলবো বলুন ? এতে কার না রাগ হয় ? আমি পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি পুরুষ মানুষ, আমাকে নিয়ে ওরকম ঠাট্টা যারা করে তাদের ওপর আপনারও কি রাগ হয় না ? আগে মানুষ আমার মুখের পানে চেয়ে কথা বলেনি, এত ভয় করতো ! শৈলেশ চক্রবর্তীর নাম কেনা জানে ?

শৈলেশ বলে গেলেন, যখন স্টিমার অফিসে চাকরি করি তখন আমাদের ওপরওয়ালা মরিসন সাহেবের সাথে কি খাতিরই না ছিল ! ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক-এর এখানকার ম্যানেজার—জানেন নিশ্চয়ই তাঁকে, সেই বীরেন মুখার্জী আমার আপন মাসতুত ভাই, তারপর সেদিন অজিত বসাক বলে যে ছেলেটি বিলেতে চাটার্ড একাউণ্টেন্সি পড়তে গেল, সে তো আমাকে ভয়ানক সম্মান করতো। এরকম কতো লোক আমার ঘনিষ্ঠভাবে চেনা ! আর তাছাড়া—I am an Ex-soldier of the last Great war—

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন নাকি ?

হ্যাঁ। শৈলেশ বললেন, জীবনে কি না করেছি। ভেবে দেখুন, না করলেও পারতাম। কেউ আমাকে তাড়িয়েও দেয়নি, অবস্থাও খারাপ নয়, তবুও তো জীবনের বেশীরভাগ সময় কেবল বাইরে ঘুরে কাটিয়েছি। আচ্ছা বলুন কি দরকার ছিল আমার যুদ্ধে যাওয়ার, না গেলেও তো পারতাম।

আরও কতক্ষণ বক্‌বকানির পর রেহাই পাওয়া গেল।

সুরমা এসে বললে, এমন কি কথা হলো এতক্ষণ ?

—আর বলোনা, ক'দিনেরই বা চেনা, এর মধ্যেই কিরকম সব কথা বলে যায় ! এতটুকু মুখে বাধে না !

—আর যাই বলো, আমি লক্ষ্য করেছি, ও বৌটিকে ভয়ানক ভালোবাসে।

এটা ওর চেহারা আর কাজকর্ম দেখে দুর্লভ মনে করেছিলাম।

কয়েকদিন পরে এক অদ্ভুত খবর শুনতে পেলাম। শৈলেশ কার সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে গেছেন। খবর শুনে আশ্চর্য্য বেশী হইনি, হতুম এই ভেবে যে, এটাই শুধু এতদিন কেন হয়নি। বৌদি কেবল কাঁদছে, এমন বিপদের সময় একটা লোক নেই যে তাকে একটু দেখে শোনে। অথচ নিজের যাবারও সাধ্যি নেই।

সুরমা সব বললে।

ভাড়াটে এনে মহা মুস্কিলে পড়া গেছে আর কি! কি আর করি, একদিন গেলাম। ফাষ্ট´ সার্জিকেল ওয়ার্ডে চৌদ্দ নম্বর বেড। শৈলেশ আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন; বললেন, আপনি এসেছেন!

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু শৈলেশবাবু এসব কি?

—আর বলবেন না, ব্যাটারা ভয়ানক পাজী।

—সে কারা? কেমন করে এমন হলো?

—সামান্ত একটা কথা নিয়ে তর্ক হলো, সেই তর্কেই শেষ পর্য্যন্ত মারামারি। ওরা ছিল পঁচিশ জনের ওপরে, আর আমি একেবারে একা। তবু শৈলেশ চক্রবর্ত্তীর হাতে যা মার ওরা খেয়েছে সেটা ওরাই জানে। আর আমার এই যে দেখছেন, মাথা ফেটেছে, হাতে একটু ব্যথা পেয়েছি, জানেন তো, মার দিতে গেলে মার খেতেও হয়। দেখুন কী সাহস, আমাকে ওরা চেনে না, মনে করেছে, ওদের মতো আমিও এক পথের ধুলোরই মানুষ। ওদের এও খেয়াল নেই যে আমি একজন Ex-soldier.

শৈলেশ উত্তেজনায় বসে পড়লেন, উত্তেজনায় তাঁর শরীর কাঁপছে।

বললাম, থাক্ থাক্ আগে সেরে উঠুন, তারপর যা হয় করা যাবে। কিন্তু ওরা কে তাতো বুঝতে পারলাম না?

—চায়ের দোকানের মালিক।

শুনে সত্যি একটু রাগ হলো। বললাম, তাহলে দেখছি, ভয়ানক পাজী তো! সামান্ত তর্কের জন্তে এমন করলো! ওদের পুলিশে দেওয়া হয়নি?

শৈলেশ হেসে বললেন, সে কখন।

—বেশ হয়েছে। আপনি এখানে আর ওদিকে সকলে আপনার জন্যে ভয়ানক চিন্তায় পড়েছে।

—সকলে কে কে?

—এই ধরুন, আপনার স্ত্রী, কেবলই কাঁদছেন।

শৈলেশ বাইরের আকাশের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন, চোখের উপরে ম্লান ছায়া। সুরমার কথা বিশ্বাস করতে হলো, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় এখন পেলাম। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অত চিন্তার কি হলো? একটা অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকবে, ওরকম জীবন শৈলেশ চক্রবর্তী রাখে না। আর এই তো প্রথম নয়, সারাজীবন তাই করে এলাম, মরণকে এতটুকু ভয় করিনি; এখনও করি না, সেইজন্যই তো লোকে অত ভয় করে, সম্মান করে চলে। আর সে জায়গায় ব্যাটারা কিনা সামান্য চায়ের দোকানের মালিক হয়ে—

বললাম, সে যাক এখন ওসব বলে লাভ নেই। এখন যাই।

—এখনই যাবেন? আচ্ছা, যান। গিয়ে বলবেন, ভালোই আছি, ডিস্‌চার্জড হবার আগেই ফিরে আসবো। এখানে থাকা আমাদের পোষায় না।

—আচ্ছা, বলবো। চলে আসছিলাম আবার পেছন থেকে ডাক এলো, দেখুন—

কাছে গেলাম, বললাম, কি?

—নার্সগুলো বড়ো অযত্ন করে, মনে করেছে একটা সাধারণ লোকই আমি। আপনি একটু আর-এম-এ বা ছাত্রদের বলে যাবেন আমার কথা।

ভাবলাম আমি কি লাটসাহেব নাকি যে ওরা আমার কথা শুনবে? তবু বললাম, আচ্ছা বলবো।

প্রায় মাসখানেক পরে শৈলেশ এলেন।

এতদিন পরে নীচের ঘরের মেঝেতে ছেলেপিলেদের অশ্রান্ত দাপাদাপি আর হাসির শব্দ পেয়ে ভালো লাগলো। আর একজনের ব্যাকুল প্রতীক্ষারও এতদিনে অবসান হয়েছে।

কিন্তু দুইদিন পরে আবার সব ঠাণ্ডা।

সুরমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

সে কিছু বলতে পারলো না।

বলার দরকারও হলো না, একদিন ভোরবেলা সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাকে নিভৃতে ডেকে শৈলেশ বললেন, দেখুন, এতদিন পরে এসেছি, হাতে একটি টাকা নেই, একেবারে না খেয়ে থাকবার মতো অবস্থা। এই বিপদের সময় যদি কয়টা টাকা দেন তো বড়ো উপকার হয়। ইংরেজী মাস পড়লেই দিয়ে দেবো।

চুপ করে রইলাম।

—দেখুন আপনাকে মিথ্যা বলেছি। আসলে অবস্থা আমার একটুও ভাল নয়। আর সেই যে চায়ের দোকান, ওরা আমার কাছে অনেক টাকা পেতো, তাইতো অত বচসা, মারামারি। ভিতরে আর কোন কারণ নেই। আপনাকে সত্যি কথা বললাম। দেন কয়েকটি টাকা, আমি ঠিক দিয়ে দেবো।

তার গলা ভিজে এলো। এতাবৎ ভাড়াও একটি পয়সা পাইনি। বললাম, টাকা আমি দিতে পারি কিন্তু আপনি এ বাসা ছেড়ে কালই চলে যাবেন। আমারও বা এমন অবস্থা কি যে আপনার জন্যে আমি অত ক্ষতি স্বীকার করবো? টাকা আমি আর চাইনে, আপনি কেবল চলে যান।

শৈলেশকে টাকা দিলাম।

বাসা ছেড়ে শৈলেশ সত্যি চলে গেলেন, তবে রাত্রে নয়, দিনে। বাড়ীওয়ালার ধরবার ভয় নেই। যাবার সময় দেখলাম, দুটো টাকা পেয়ে আগের মতো সেই খুশি এতটুকু অন্তর্হিত হয়নি, ঠিক সেইরকম লম্বা গোঁফে আঙ্গুল বুলিয়ে বললেন, Ex-soldier of the last Great War.

অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন

সতীশ ওঠেনি, শিবু ওঠেনি, মনুর মা ওঠেনি, এমন কি সূর্য্যও আকাশে দেখা দেয় নি, তার শুধু আলো পৌঁচেছে পৃথিবীতে।

কিন্তু শ্রীবিলাস উঠেছে।

বিছানা থেকে উঠেই প্রথমে খুঁজলো লাঠি,—এটা ছাড়া সে চলতে পারে না, তার অন্ধত্বকে সে কতকটা উপহাস করে ওই লাঠির সাহায্য নিয়ে। ওই লাঠি তার মস্ত বড়ো সাথী। খুঁজতে খুঁজতে সাথীকে সে খুঁজে পেলোও, তার ডগাটি একবার ডান পাশে, একবার বাঁ পাশে ফেলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো এবং আন্দাজে দিক ঠিক করে করযোড়ে সূর্য্যকে প্রণাম করলো।

ঘরের ভিতর তার স্ত্রী বিন্দু দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ভোরের বাতাসের ছোঁয়াচে বেঘোরে ঘুমুচ্ছে।

লাঠিটা একপাশে রেখে শ্রীবিলাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসে পড়লো। একটু বসে থেকে ডাকতে লাগলো, ও বৌ, বৌ? ওরে কেলো, ওরে হেবো, ওঠ্ বাবা ওঠ্, আর কত ঘুমুবি বল্, রোদ্দুর উঠে গেছে যে, ও মা সদু—

অনেক ডাকাডাকিতে বিন্দুর ঘুম ভাঙলো, বললে, রাত না পোয়াতে কি আরম্ভ করেছ শুনি?

শ্রীবিলাস বললে, এখনও কি তোমার রাত রয়েছে? কত লোক উঠে গেছে। আমি কতক্ষণ ধরে উঠে ব'সে আছি।

ছেলেপিলেগুলো ওঠেনি, বিন্দু বাইরে এসে ধপ করে মেঝের উপর বসে চোখ রগড়ালো, গা মোড়ামুড়ি দিলো, হাই তুললো, তারপর স্থির হয়ে বললো, এই তো এখন উঠলে, আমি বুঝি দেখিনি? কত লোক উঠেছে! একটিকেও তো দেখিছিনে বাপু!

—তাতে কি হয়েছে, সকলে পাগল হ'লে কি তুমি পাগল হবে বৌ?

বিন্দু কি একটা কাজে ভেতরে গেল, যেতে যেতে বললে, আমি বলছি, কেন মিথ্যে কথা? সারারাত যে গরম গেছে, ঘুম একরকম হতেই চায় না, তার ওপর—

—মিথ্যে কথা? শ্রীবিলাস জোরে বললে, আমি মিথ্যুক আর তুমি খুব সত্যবতী, না? দেখবে, সকলে উঠেছে কিনা? দেখবে দেখবে?

—দেখবো, বিন্দু নিঃশব্দে হাসলো।

—ওরে সতে, ওগো শিবনাথ, ও মুন্নুর মা,—কিছুক্ষণ এমনি নিষ্ফল ডেকে হতাশ হয়ে শ্রীবিলাস বললে, আর মেয়েমানুষের অত ঘুমই বা কেন!

—মেয়েমানুষের ঘুমেই চোখ টাটায়, না! বুঝি ঘুম শুধু পুরুষের?

শ্রীবিলাস রেগে কি বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় ঘরের পাশে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

—ও দাদা, কি করছো?

—কে, বীরু?

—হ্যাঁ!

—এই তো দাদা বসে আছি একা, যাব একা, শ্রীবিলাস যেন এক মুহূর্ত্ত বদ্‌লে গেল, বললে, কিছু সাথে যাবে না, কেউ সঙ্গে যাবে না, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, ভাই নয়, বোন নয়, ধন, দৌলত নয়—শ্রীবিলাস গুন্ গুন্ করে পরলোকতত্ত্ব-বিষয়ক একটা গান ধরলে, তারপর থেমে বীরুর দিকে তাকিয়ে বললে—বাঁশী বেজেছে। কারখানায় চললে এত সকালে?

বীরু বললে, ঠিক এসময়ই তো রোজ আমি যাই দাদা।

—রোজই এসময় যাও? তা হবে, শ্রীবিলাস বললে, ঘড়ি তো নেই যে সময় ঠিক রাখবো, কি বল বীরু?

এই একটু আগেই এই নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছিলো।

—কিন্তু আছে মন, আছে তাতে কাঁটা, মিনিটের নয়, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা। তাই ঠিক করে বলতে পারিনে ছ'টা বেজে ক'মিনিট হয়েছে, কিন্তু এটা বলতে পারি যে ছ'টা বেজেছে, কি বলো?

শ্রীবিলাস হাসলো, বললে, ওই যে কথায় বলে মন না গতি—

বিন্দু আবার বাইরেই এসে দাঁড়িয়েছিলো, বললে, আমাদের বীরু এখন একটা বিয়ে থা করুক, ঘরদোর কে দেখে বলো? তাছাড়া,

অসুখ-বিসুখও তো আছে? করো ভাই করো, আমরা একটা নেমন্তন্ন খাই।

বীরু যেন লজ্জা পেলো।

শ্রীবিলাস হেসে বললে, ওই তো মেয়েমানুষের দোষ, কেবল বিয়ে থা করো! আরে, বিয়ে তো করবে, খেতে দেবে কি? তারপর ছেলেপিলে হ'লে!

তার কথা শুনে বিন্দুর খিল্ খিল্ করে হাসতে বা ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো, কে কাকে বলে? কিন্তু সে তা করলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্রীবিলাস বললে, তাই অল্প মাইনে, দুজনের পেট কি করে চলবে এতে? হ্যাঁ বীরু তোমার না মাইনে বাড়বার কথা ছিল?

—ছিল কিন্তু বাড়াচ্ছে না তো।

—বাড়াচ্ছে না? কথা দিয়েও!

—তাইতো দেখা যাচ্ছে।

—কি বলো, এত অন্যায়? কথা দিয়ে কথা-না-রাখার মতো পাপ আর আছে? বাইরেরটা দেখে মনে হয় শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে উঠেছে, পরক্ষণেই বেড়ালের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বললে, ভগবান করুন, দিনে দিনে যেন তোমার উন্নতি হয়।

—আমি যাই?

—এসো ভাই।

কাছেই বিন্দুর নিঃশব্দ উপস্থিতি টের না পেয়ে শ্রীবিলাস জোরে ডাকতে লাগলো, বৌ, ও বৌ—

—কি?

—এখনও দাঁড়িয়ে আছো? কাল যে বললে, আজ তোমাকে খুব সকালে যেতে হবে, বাবুদের বাড়ীর ছেলের ভাত! যাও তাড়াতাড়ি। আবার যদি রেগে-টেগে যায় তাহলে কি করবে বলো? যাও শিগ্‌গির।

—যাই।

—আর ভাখো, ঘরে কোন খাবার নেই কিন্তু, ছেলেপিলেগুলো খাবে একটা-কিছু, দুটো পয়সা যদি থাকে রেখে যেয়ো না হয়, দু'পয়সার মুড়ি কি চিঁড়ে কিনে এনে খাবে'খন।

—হুকুম করবার বেলায় তো খুবই মজা, আর পয়সা নেবার বেলায় কেবল গৌরী সেন! আঁচলে বাঁধা ছিল পয়সা, বিন্দু তা বার করে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে চলে গেল। শ্রীবিলাস হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে আপন মনে বললে, আমার হাতের ওপর দিয়ে গেলে কি দোষটা হতো শুনি? এখন পয়সা দুটো আমি কি করে পাই? কোথায় না কোথায় গড়িয়ে চলে গেছে কে জানে? লোকে বলে, টাকা-পয়সার হাত পা আছে।

ছেলেপুলেদের মধ্যে কেলো সকলের বড়ো।

শ্রীবিলাস ডাকলো, ওরে কেলো—

কাছেই কোথায় সে খেলছিলো, দৌড়ে এসে বললে, কি বাবা?

—তোদের খুব খিদে পেয়েছে না রে?

—পেয়েছে।

—খুব?

—হ্যাঁ বাবা, খুব।

—হেবো, সদু, ওরা কোথায়?

—ওই তো, আমি যেখানে খেলছিলাম সেখানেই তো খেলছে। সদুটা পিট্ পিট করে কাঁদছেই কেবল, বলে ক্ষিদে পেয়েছে দাদা।

কেলোটা অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলে ফেললো।

—আর হেবো, ওটাও কাঁদছে?

—হুঁ, কেলো বললে, ভয়ানক কাঁদছে।

—কই আমি তো শুনতে পাইনি?

—পাবে কি গো! কতক্ষণ আর কাঁদবে? দিলাম এক চড়, বললাম মা এলে খাবি ছোঁড়া। তারপরই তো ফট্ করে চুপ করে গেল।

—চড় দিলি! শ্রীবিলাস তার লাঠিটা হাতে তুলে নিলো, সেটা দিয়ে মেঝের ওপর এক শব্দ করে বললে, কেন চড় দিলি বল, নইলে আজ তোকে—

যে এত মিথ্যে কথা বলতে জানে, সে তার সাফাই গাইতেও জানে, বিশেষভাবে তার কাছে—যে ব্যক্তি চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

কেলো বললে, খুব জোরে নয় বাবা। আমি কেন জোরে মারবো ওকে বলো! এই এরকম আস্তে করে—সে শ্রীবিলাসের গায়ে আস্তে মৃদু একটা আঘাত করে বললে, হাতটা কেবল একটু লাগিয়েছিলাম, আর অমনি

কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। এমন ছিঁচকাঁদুনে আর কখনও দেখিনি, বাপ্‌রে।

শ্রীবিলাস আবার শান্ত হলো। মাটির ওপর একপাশে লাঠিটা রেখে, আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা দুটো বার করলো, বললে, শিরীষ দোকানীর কাছে যা, মুড়ি নিয়ে আয় দু'পয়সার, বুঝলি?

—আচ্ছা।

শ্রীবিলাস কেলোর হাতে পয়সা দিয়ে বললে, মুড়ির সাথে একটু তেল আর নুনও চেয়ে নিস্ বাবা, ভুলিসনি যেন, বুঝলি?

কেলো কি আর সেখানে রয়েছে, পয়সা পেয়ে তক্ষুনি দৌড়ে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে—

আসতে দেরী দেখে শ্রীবিলাস ডাকলো ছেলেটাকে, কেলো—

ঘরের পূবদিকের দরজার সামনেই একটা ভাঙা উঠোন ছিল, সেখানে বসে ওরা খাচ্ছিলো। শ্রীবিলাস ছিল এপারের বারান্দায়, টের পায়নি।

—কেলো!

উত্তর এলো, কি বাবা?

—খেলি?

—হুঁ বাবা।

—হেবো আর সদু, ওরা?

—ওরাও তো খাচ্ছে, কিরে হেবো, খাচ্ছিস না তুই আমার সঙ্গে? কেলো ফিসফিস করে হেবোকে বললে, বল্‌না, চেঁচিয়ে বল।

হেবো চেঁচিয়ে বললে, হুঁ, আমি খাচ্ছি।

শ্রীবিলাস লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজা পেরিয়ে বললে, সবই খেলি?

—সবই তো বাবা।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি তাদের কাছে যেতে যেতে বললে, একটুও রাখিসনি?

—হুঁ, সে তো আছেই বাবা, এই একেবারে তলায়, এই আধমুঠোও হবে না।

শ্রীবিলাস দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, পাজী ছেলে, সবই খেয়ে ফেললি? বয়েস আমাদের বেশী হয়েছে বলে বুঝি ক্ষিদে পেতে নেই মোটেই?

শয়তান ছেলে, হতচ্ছাড়া, তোর হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবো আমি—

কেলো ভয়ে দৌড়ে পালালো।

—বৌ এলে পর বলবো, এরকম ছেলে পিঠমোড়া করে বেঁধে চাবুক লাগানো দরকার, শুধু নিজের খাওয়া, সাতদিন না খাইয়ে রাখলে তবে ঠিক হয়—হবে না এমন, কেবল ছোটলোকদের সাথে মিশলে এরকম হয়ই। বৌকে কত বলেছি, না ওর কেবল টাকা আর টাকা! আরে বাপু, ইদিকে যে ছেলেপিলেগুলো অমানুষ হয়ে গেল তা চোখে পড়ছে? আবার কোথায় গেল ওটা?

শ্রীবিলাস দরজায়, চৌকাঠে, দেওয়ালে কয়েকবার খুব কষে লাঠির আঘাত করে বললে, ছেলেটা কোথায় গেল?

হেবো আর সদু কাছেই ছিল, বাপের রাগ দেখে ভয়ে এতক্ষণ কিছু বলেনি, এখন কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, দাদা পালিয়েছে বাবা।

—পালিয়েছে বাবা! ন্যাকামি! যা আমার সুমুখ থেকে, যা বলছি, নইলে মার খেয়ে মরবি বলে দিলাম।

হেবোটা সত্যিই ছিঁচকাঁদুনে, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।

শ্রীবিলাস বললে, আবার কাঁদছিস কেন?

—দুমুঠো করে আমাদের দিয়ে দাদা আর সবই নিজে খেয়েছে বাবা।

নিজে খেয়েছে! রাগে শ্রীবিলাসের চোখ ফেটে জল আসে আর কি! সবই নিজে খেয়েছে, আর আমরা বুঝি ভেসে এসেছি। দাঁড়া তো আসুক!

শ্রীবিলাস গুম্ হয়ে বসে রইলো।

প্রায় এগারটা অবধি বসে বসেই কেটে গেল। কাজই বা কি? অন্ধের আবার কি কাজ!

কিন্তু শ্রীবিলাসের কাজ আছে, সে দিনরাত কেবল বকে, বারান্দায় আর ঘরে আসা-যাওয়া করে, ছেলেপিলেগুলোকে নিষ্ফল শাসন করে, আরও কত কি করে!

বিন্দুর আসতে দেরী হচ্ছিলো, আজকে বেশী কাজ, উৎসব আয়োজনে রোজকার চেয়ে একটু দেরী হবেই তো।

বেলা বারোটা বাজলো।

ছোটছেলেদের এমনি একটা স্বভাব, যেমন ভুলে থাকতে পারে খুব,

তেমনি অনেক সময় যার জন্যে একবার ঝোঁক চাপলো তার জন্যে একেবারে মরীয়া হয়ে ওঠে।

কেলো ওরাও ক্ষিদে ভুলে তখনও কোথায় খেলছিলো।

শ্রীবিলাস নিজেই অস্থির হয়ে উঠলো।

চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু'একটা কাকের ডাক।

পাশের ঘরে থাকে সতীশ। এক বাদ্যযন্ত্রের দোকানে কাজ করে। বিয়ে করেছে বেশীদিন হয়নি, এখনও সন্তান হয়নি।

শ্রীবিলাস বললে, ও সতীশ, গলার আওয়াজ যে পাচ্ছি, কাকে কি বলছো? কি হয়েছে?

ওপাশ থেকে জবাব এলো, এই তো দাদা, একটা কাচের গ্লাস গেল ভেঙে। গ্লাসটা ভালো দাম দিয়ে কিনেছিলাম, এই ভেবে যে অতিথি মানুষ-টানুষ এলে পর জল দেওয়া যাবে—তাও আবার ভেঙে গেল। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের এমন হলে কি চলে, বলেন?

—কে ভাঙলে?

—ভাঙবে আবার কে? এই হলো কি—

ওদিকে দেওয়ালের ওপাশে সতীশের বৌ তাকে চুপিচুপি বলছে, বাইরে থেকে ভয়ানক তেষ্টা নিয়ে এসে আমায় বললে, বৌ, দাও এক গ্লাস জল, সেই গ্লাসটি করে। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে আমার। আনলুম জলের বদলে সরবৎ করে, এসে দেখি তুমি হাসছো, হাত থেকে সরবৎ তো নিলে না, নিলে আমাকে, গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল, আমি কি করবো বলো? আমার কি দোষ। আবার হাসছো, আরে, আরে, দ্যাখো, অত ফাজলামি করো না। দেবো মুখের ভিতর এই ভাঙা কাচ ফুটিয়ে—

এদিকে আবার শ্রীবিলাস সতীশের দিক থেকে কোন আওয়াজ না পেয়ে বললে, সতীশ, ও সতীশ—

—কি?

—ক'টা বাজলো বলতে পারো?

—একটা হবে আর কি! কেন জিজ্ঞেস করছেন?

শ্রীবিলাস বিনা আয়াসে বলে ফেললো, ওই দ্যাখো, আমিও কিন্তু ওইরকমই আন্দাজ করেছিলুম। ঠিক হলো দেখছি। এখন আমি প্রায়ই পরীক্ষা করে দেখি, কি জানো, ঠিক হয়। কম আশ্চর্য্যের কথা নয়, কি বলো?

—হ্যাঁ। আমি চান করতে চললুম দাদা।

—ওকি, এখনও খাওনি? হা ভগবান! এমন করলে কি শরীর থাকবে? এই অবেলায় খেয়ে জোয়ান বয়সেই না হয় কোন কিছু তোয়াক্কা না করে চলতে পারো, কিন্তু বুড়ো বয়সে এর জন্যে ভুগতে হবে বাপু। যাও তাড়াতাড়ি যাও—

অন্যের কাছে খুব ভাল মানুষ সেজে শ্রীবিলাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

একটু পরেই বিন্দু এলো, সঙ্গে কেলো আর হেবো। সদু ঘরে ঘুমিয়েছিল।

হাত থেকে সব নামিয়ে বললে, ছেলেগুলো এমন দুষ্টু দ্যাখো, আবার বাবুদের বাসায় গেছে। কি সাহস! কতদিন মানা করলাম তবু—সেই নেঙটা দিগম্বর সেজে গিয়ে উপস্থিত।

শ্রীবিলাস বললে, কোনদিন গাড়ী ঘোড়ার তলে পড়ে খুন হবে।

—হবেই তো।

শ্রীবিলাস বললে, আর যাস্‌নে কিন্তু। তারপর, বৌ, কেমন খাওয়া-দাওয়া হলো?

—খুব ভালো। আমরা তিনজনেই পেট পুরে খেয়ে এসেছি।

—আর?

—আর এনিছিও তোমার জন্যে।

—তাহলে এবেলা আর রাঁধতে হবে না বলো, শ্রীবিলাস কাছে এগিয়ে বললে, বসবো?

—চান করেছো?

—সেই কখন।

—আচ্ছা দাঁড়াও, পিঁড়ি পেতে দিই।

শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি বললে, না থাক্ থাক্, আমি মাটির ওপরই বসতে পারবো।

বিন্দু তাকে খেতে দিতে দিতে বললে, আজ আর ভাত, ডাল, মাছ নয়, পুরনোর মুখ বিষিয়ে উঠেছে। আজ পাকা লুচি, মাংস, দই, সন্দেশ।

শ্রীবিলাস হঠাৎ একমুখ হেসে উঠলো।

—হাসছো যে?

—এম্‌নি গো, এম্‌নি।

—এম্‌নি কেউ হাসে?

—বৌ, আমি হাসি।

খেতে খেতে হঠাৎ একবার শ্রীবিলাসের গলায় ঠেকলো।

বিন্দু তাড়াতাড়ি বললে, আহা, অত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন?

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা পান চিবোতে চিবোতে শ্রীবিলাস বললে, সেই কড়িগুলো কোথায় গো বৌ, সেই যে কিনেছিলে, না কোত্থেকে এনেছিলে?

—আছে বুঝি কোনখানে, কেন?

—এসো না একটুখেনি?

বিন্দু বললে, না আমার ঘুম পেয়েছে। সারারাত একরকম ঘুমুইনি। আর তুমিই বা খেলবে কিগো, আমি যদি মিথ্যে চাল দিই?

—না, না, আমি খেলবো, তুমি আনো।

বিন্দু একটা ছেঁড়া পাটী পেতে তার ওপর একটা বালিশ ফেলে শুয়ে পড়লো।

শ্রীবিলাস বললে, তাহলে আমি কি করবো, ঠায় বসে থাকবো?

—রোজ যা করো তাই করো। ঘুমোও, কিছু পেতে দেবো?

—দাও।

শ্রীবিলাস যখন ঘুম থেকে উঠলো, বিন্দু তখন অনেকক্ষণ কাজে চলে গেছে। সন্ধ্যার আর বেশী বাকী নেই।

শ্রীবিলাস সদুকে বললে তাকে কলতলায় নিয়ে যেতে।

সদু তিন বছরের মেয়ে, কিন্তু কথা বলে পাকা-পাকা। সে তার বাবার হাতের লাঠি ধরে তাকে কলের পারে দিয়ে এলো।

অতগুলো গরীব পরিবারের জন্যে একটি মাত্র কল, তা-ও সারাদিন জল পড়ে যায়।

শ্রীবিলাস হাত মুখ ধুতে এসেছিলো। তাকে দেখে একজন কল ছেড়ে দিলে। সে হাত মুখ ধুয়ে আবার ফিরে ঘরে এসে বসলো।

সকলে যে যার কাজ থেকে ফিরছে।

আর শ্রীবিলাস তার ঘরের সামনেকার বারান্দায় বসে আছে চুপ করে। অনুভব করছে মানুষের পদচারণা, কথা বলা। এমনি সে রোজই বসে থাকে একা।

তার চোখের রঙ ধূসর, মাঝে মাঝে জল পড়ে, মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। পা'দুটো এক করে হাঁটুর ওপর এক হাত রেখে, তার ওপর মুখটি স্থাপন করে সে বসে থাকে। এই সময় কেউ সেধে কথা বললে উত্তর দেয় খুব বিনীতভাবে কিন্তু অতি সংক্ষেপে।

রাত ন'টার সময় বিন্দু এলো। আজ সে একটু সকালেই এসেছে। ছেলেরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু শ্রীবিলাস জেগে আছে। বিন্দু জিজ্ঞেস করলে, ওরা সব খেয়েছে?

—হ্যাঁ। তুমি তো রেখে গেছলেই খাবার। কিন্তু বৌ, আজ তুমি সকালে এসেছ বলে মনে হয়।

বিন্দু বললে, হুঁ। ছুটি দিয়ে দিলে। ওদের বাড়ীতে আজ মেয়েরা নাচবে গাইবে। তারপর মেয়েপুরুষে মিলে থিয়েটার করবে গো—কিন্তু আমি তাতে কি কাজে লাগবো বলো? তাই চলে এলাম।

—তা নাচ গান দেখে এলে না কেন?

বিন্দু মুচ্‌কি হেসে বললে, যাবে?

—কি বলো? এখন? এত রাতে?

—এত রাতেই তো এলাম। তা ছাড়া আমার ওসব লোকের ভয় নেই।

খেয়ে-দেয়ে শ্রীবিলাস বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, নেই কেন?

বিন্দুর গরমটা সত্যি একটু বেশী, সে বাইরে গিয়ে বসেছিলো।

একটু ঝিরঝিরে বাতাস বাইরে পাওয়া যায় বটে। কিছু দূরেই একটি মাধবীলতার গাছ আছে, তাতে অজস্র ফুল, সেই থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে, মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে ভেসে।

বিন্দু বললে, কারণ আমি জানি, আমি সত্যি, ওরা মিথ্যে। ওরা ভীতু।

—তবে কাকে ভয় করে শুনি?

বিন্দু বললে, তোমাকে!

শ্রীবিলাস শুয়েছিল, উঠে পড়লো, ধীরে ধীরে বাইরে এসে বললে, আমাকে কেন?

বিন্দু ফিক্ করে হেসে বললে, ভয় করবো না তো কি? এই দ্যাখো, ছেঁড়া কাপড়, তালি দিয়ে শেলাই করে কোনরকমে পরি। কিছুতেই আর সংসার চালাতে পারি না। এই তো আজ অর্দ্ধেক মাস মাত্র গেছে, আমার কাছে মোটে একটি টাকা। ঘরে শুয়ে আছে তিন ছেলে মেয়ে। ওরা বেঘোরে ঘুমুচ্চে। কিন্তু ওগো, তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আর পারিনে।

—আমি এখন শোবো না।

—শোবে না?

—না, আমার শুতে ইচ্ছে করছে না।

শ্রীবিলাস কাতরস্বরে বললে, ত্মখো, আমি অন্ধ মানুষ, কত দুঃখ। তার ওপর আমাকে আরও কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বিন্দু, ও বিন্দু—

—না, না, আমাকে আর ডেকো না। এই বয়সে আর অত সোহাগের ডাক ভাল লাগে না। একটা রাতও……

—অত অহঙ্কার ভালো নয়।

—আরে, এতে অহঙ্কারের কি হলো?

শ্রীবিলাস শক্ত গলায় বললে, তুই কি সারারাত ওখানেই দাঁড়িয়ে কাটাবি?

'তুই' সম্বোধন আরম্ভ হলো।

বিন্দু চুপ করে রইলো।

—আমি চোখে দেখতে পাই না ব'লে মজা পেয়েছিস্ বুঝি? খুব মজা না, খুব মজা?

কাছেই ছিল লাঠি, শ্রীবিলাস ভয়ানক রেগে সেটা ছুঁড়ে মারলো আন্দাজে।

বিন্দু এবার হেসে উঠলো। লাঠিটা গায়ে লাগে নি। সে তা উঠিয়ে রেখে দিলে ঘরের এক কোণে।

শ্রীবিলাস উঠে দাঁড়ালো, কাঁপতে কাঁপতে বিন্দুকে ধরবার জন্তে রুখে এলো, কিন্তু বিন্দু নিঃশব্দে সরে এসেছে আর এক দিকে।

একটা পুরানো বাক্সের সাথে শ্রীবিলাস খেলো ধাক্কা, আছাড় খেয়ে

পড়লো, তারপর, আশ্চর্য—কেঁদে উঠলো ডাক ছেড়ে, আমাকে মেরে ফেল্‌লে রে, ওই রাক্ষুসি আমাকে মেরে ফেল্‌লে রে।

আশেপাশে অনেক লোকজন, তারা শুনতে পেলে কি মনে করবে, হয়তো ভীড় জমবে এসে এই রাতে, বিন্দু ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি শ্রীবিলাসের কাছে এলো, হাঁটু গেড়ে বসলো, তার হাত ধরে বললে, চুপ চুপ; কেন অমন করছো? এই দ্যাখো, আমি একটু ভয় পাই না তোমাকে।

শ্রীবিলাসের চেঁচামিচি এক মুহূর্তে গেল থেমে, ব্যথা গেল উড়ে।

বিন্দু দরজা বন্ধ করলো।

আবার ভোরও হলো, কেউ না উঠতেই শ্রীবিলাসও উঠলো, আকাশে না-দেখা সূর্যকে প্রণামও করলো, পরলোক-বিষয়ক একটি গানও ধরলো।

English Translation

Mice

Mice have so vastly multiplied in our house that it seems they will drive us out one day. One is amazed at their cheek. Right under our nose, with adroit steps, they manoeuvre like armies on a battlefield, scurrying along the corners of the floor and walls. When anything is in their way, a box or anything bulky, they just climb over and disappear. But at night it is more terrible. Then they just ignore us and go on their rounds. Strange, incessant sounds emerge from broken packboxes, old kerosene tins, broken stools and earthenware : Strums and taps that would easily persuade anybody to imagine that a whole brood of humped worthless creatures have just commenced their soiree for the night in those packing cases.

I am quite exasperated with these invaders, my nerves are on edge. I wonder why although one can do something about them, nobody does anything ? Wouldn't there money to spare to buy a mouse trap ? I shouldn't be surprised, though, if there wasn't any.

My mother is simply scared stiff of mice. A small mouse to her is like a bear. She would jump yards if a mouse came near her feet. She is scared if she smells a mouse, she hates them as much as she is frightened. People are like that. I knew one who was just frightened out of his wits by earthworms, and I knew another who used to be the same with spiders. As for me, I am mortally afraid of leeches. In childhood when I was quite and innocent as a cow I would often visit my mother's people, especially in

the rains. Going through the vast sealike bil, drinking in the smell of the rains and the wet earth, I would come out from under the hatch, the sheer stretch of water bewitching me; I would pluck water lilies with cruel hands or bending on the water would dip my arm. But the fear was ever their: I was going to be bitten; in instant fright I would lift my hand! In my mother's place I would play with children who were not of my class: but there was no bar. or at least I had no bar, no fear or suspicion: these had not yet dawned on me.

And those my friends would take out there cattle to their fields. Their hair long and reddish like marsh grass, their skin and eyes almond—coloured, their legs absurdly thin, bow-legged, a towel at their loins. their fingers rough with much work. They were so foul of speech and their manners so obscene that they excited my sexual fancies, but conditioned by my class as I am I would not talk about them. They ragged me, which drew the blood to my face. One of them was called Bhim. One day he picked up a tremendous leech from the fresh rain-wated in the open field and regarding me with a smile called out: 'Suku shall I throw it on you?'

I staggered at his courage, my hair stood on end. Moving back a safe distance with tactful slowness I said, 'Look here, Bhim, this is more than a joke, I'll show you.' Like a fool Bhim giggled and said, 'Hi' look, here you are, catch it?'

I still remember the day, I am quite amazed to think of Bhim's courage. People are like that, you know. Many are frightened of earhworms. I am not scared of earthworms, but I shudder to see a leech. I wonder if any bourgeois custom or convention is at the root of it all.

As I have said before, my mother just gets wild if she sees a mouse, she is so frightened. On such occasions we have to let the mice have their play, while we attend to her. Once

it so happened that a mouse was found on her clothes. One could see the mouse making desperate bids to escape. Mother, standing yards away, called out in broken tones, 'Suku, Suku.'

It was my habit to ignore the first call. So I kept silent.

—'Suku, suku'

Now I replied.—'yes ?'

Mother, eyes wide open. Stretching her thin turmeric-stained hand to the spread-out sari, said, 'Look, there.'

I was very angry. These vermins were going to drive us mad. Why so many ? And are we alone going to be their prey ? Holding the cloth I was going to take it away when mother said, 'Let it go, do, please.'

—'It's not going to gobble me up, I'm sure !'

—'Must you play the brave man ?'

—'Mother. you are so easily frightened. The mouse grew desperate. I said, 'Look, mother, couldn't you even ask to buy a trap ? I'm sure they will start nibbling us off one day.'

—'But whats the good of killing those innocent dumb creatures ? And speaking of traps, where is the money ?' Her voice did not falter a bit, it never falters, it never falters even when she speaks of something important and she is always very brief. No sooner finished than she goes away. And this time too she went away.

It had not occured to me that it costs money to buv a trap. If I had remembered I would not have said it. For words like these evoke a kind of picture that resembles the limited desert. You may chance upon water even in a desert, but in this desert all hope is lost. I know it's history too. The sand under my feet, the sand around me, whisper that history into my ears. And engrossed, I listen. As far as I can cast my mind back till my

eighteenth year I have often indulged in vague fancies, but random thinking is not worth a brass farthing. Of fits of belief and distrust in God I had plenty, and so calling Him Krishna I have often prayed 'Krishna, My Lord, give me a boon so I can in an instant make all men rich ?' I have read Rabindranath's 'Touchstone. And so I have asked many men if one could really come across a touch-stone yet, and if so, would they tell me where to took for it.

When I was a child the gloom of poverty had not darken yet the clean bodies of our large family. The cracking up of the bourgeois era had still to begin on a real scale. When I say it had not begun I mean that most fathers had not begun to be visited by doubts about the future of their sons. And speaking of that, how many hopes, indeed, accompanied my birth ? But where are their branches now ? I shall not hesitate to admit that far from flourishing they have gone under the earth. The only good thing has been that I have escaped the octopus of family ambitions and have been left in some peace.

But try as one may it is hard to live in peace. The mice, if anything, will drive me mad. I can see that clearer every day : the mice tinkling away inside a packing case or a broken tin ; however small the noise, yet so insistent that it soon grows to an awful music and sets my teeth on edge. I am sure it will set many people's teeth on edge. When a dog starts whimpering slowly, could any one have the guts to stand it ? I for one cannot. When an ugly sound by its insistence grows into music it becomes unberable. And these rats and their movements were a constant vexation to me.

Of an evening mother cried out, 'Suku, Suku !'

As I have said I lack the stern discipline to respond to a first call.

Mother again cried out in agony, 'Suku !' Forestalling a third cry I drew upto her and following her finger saw something which, after all, did not surprise me. I saw a bowl in which I had brought some milk staring stark empty on one side and by its side a huge mouse scurrying off, blazing a white trail. May I put in here that it has been again and again proved that it is not my line to betray any excitement at anything ? And needlss to say here too I betrayed nothing. I saw my mother's soft face grow pale, her eyes sad as a cow's eyes and tears in them like drops of rain on a leaf on the point of shedding. Milk was a particularly good food, and it was precious for lack of money, and if for something unpredictable it reached nobody's stomach, then tears were not surprising. Mother just wept, I stood by in silence. What else could I do ?' Mother's uncontrollable sobs extended by vision by many a league. They deepended it. I saw the midday sun showering fire from the sky, and the dust of the earth underneath darting out a greater fire. And my heart, poor strip of the soil, just crumpled up, burnt into cinders. Not a blue valley in view, no sign of water in the distance, nor a watersprout : even the mirage had slipped away. I wondered where could I get the invaluable volumes of swami Vivekananda, the priceless precepts of Sri Ramkrishna. And that king of men, Sri Aurobindo, who dedicated his life to humanity ! (For at that time I had not thought that we had yet to see a second imperialist war begin). My face contracted in thought. Drawing my knees to my belly like a dog I lay in bed thinking—I had shut all the doors and windows as an aid—I lay thinking, was there no way out of this horror, no escape ?

Father came after dark. When he heard the news he looked not in the least worried. On the contrary he hurriedly went on to say—although he is not used to

hurried speech—to say : 'It's all right, it's all for the better ?' It would turn out like that, I had thought. And no wonder. When it's a fight to keep one's body and soul together milk is of no consequence whatever.

I observed that father's face, though shrunken, looked very oily with plenty of sweat on it. The heavy sweatsoaked coat on him catered its smell all round the room. I was greatly relieved to see him so unmoved at such a disaster. Relieved at the thought that since what had happened had no redress, any debate which would merely mean plenty of noise had not come off and had spread me from humiliation for sometime at least.

But in a few moments father switched on to another key : 'What are you all really after ? Just fun and play all the time, is there nothing more ? won't you please have pity on me awhile ? Am I made of marble ? Am I not a man ? Here I am, my nose to the grindstone, and there you are having a carnival ? won't you just look at me ? Won't you let me live ?'

To my ear words like these from father sound deadly. I feel that in tham are packed ages of anger and impatience.

As time slipped by, his anger grew and his voice turned shrill. My fears increased. In a few moments this hard hot air would turn out a nakedness that would drown me in limitless shame. Acquainted as I was with such passes they had not toughened my hide, had made me more timid instead. Such a scare was merely one more item of pain in the general picture of naked barreness that I knew the world for. Father said, 'stop it, I say. Go away, off with you, get out ?'

Mother said, 'You are carrying it too for indeed, shouting to the whole world about yourself, much praise will it bring you.'

Then I heard father's voice pierced the silence of the night and burst in like a bomb.—'Are you going, or not ! are

you still there, before me. oh you bitch, you shrew—?' Father spat out many more things. But I did not hear, I plugged my ears with my fingers, my face into my pillow, lay stiff like a corpse, while tears burst into my eyes, because all this was a new lesson that had not been always there, had not been taught to me, the child, though nursed in adversity. I felt as though these moments of my first disaster were knocking at my door like sentries of my doom. I had not been through any thing like this before And yet when had my feeling taught me this, how did it happen ? I can only say this : my education was born in great secrecy, drew its breath and life from the merest earth in the greatest stealthiness, never gave out a whisper. As a flower spreads its fragrant wings in silence so did this too open its eyelids to play in the outer world. I might add that the history of my mind, the history of its birth and upbringing, is as the history of flower. But how did that education help me at this moment, this ruinous hour ! oh how ! Instead, it struck me with a paralysis where all effort is lost, mangled my young hands and dropped me into the water, blinded me with tears for awhile ; oh what should I do ? What could I do ?

—'you bitch, you shrew, get out ?' Floated in again those awful words. Words I did not wish to hear, yet was compelled to. Words that got friendly with the air and rammed themselves into my ears, caught me at my loose ends and kicked and pawed on my mind's earth.

—'Get out I say !'

There was a fresh squall.

After a while mother's tearful voice was heard to say, 'Suku, Suku.'

I was too utterly ashamed to respond at once I was afraid, yet I slowly said, 'yes ?'

'Open the door,' mother said. Trembling I opened the

door, with fear lest this should be a prelude to an unending trial; to face unperturbed things which I am even too frightened to hear. to sit in judgement with not an emotion to help.

But what I was afraid of did not come to pass. Mother entered the room, spread the end of her sari on the cold floor and lay down. Her frail body curved into the shape of a sickle. How helpless she looked! She whom in childhood I had fancied to be vast as the earth, how frail and helpless did she look now! She whom I had imagined the greatest, looked now so small, scarcely past her childhood! And me, how big I now was in the fever of my blood, in the strength of my muscles, in my steps how strong and bright, though nursed by the blood of this slight frame aquiver like a deer, yet now how mighty! What is my introductions today? It might have been a pleasant youth of twenty today, pacing the corridors of ancient London University, lost in reverie, or appropriating all the attention of young women by distinction in athletics, or begging love of a thirty-year old, blue-eyed, homebred English lady. It might easily have so happened. And who was the English lady with golden hair, long lashes, fragrant of body? Where would she be now.

And here was the mother of the golden prince, lying on the cold floor on a mere shred of cloth. How tiny and helpless she looked from here. Filling my chest with a pure meaningless pride I looked at mother, and called out, 'Mother, mother!'

There was no answer. No broken woman's voice broke the silence and knocked at my mind's door. Was she asleep?

The next day too the air was heavy. Mother's unwonted silence egged on my brothers and sisters to greater mischief. They began moving about in the nude. My younger sister

who does not go to school began reading a stupendous love-story, she was breathless with concentration. Very late in the same night the whole house was fiiled with thick smoke, we were almost suffocated. Observing the children sprawling on the floor, I went to the kitchen and asked my mother, 'Is supper ready, mother ?'

Mother, blowing hard into the oven,eyes wet with tears, said, 'No, I've just started cooking.'

'Why so late, mother ?'

There was no answer.

But I understood. It was the same old rehash. I realised this was something you couldn't escape although you very much wished to, which returns with peculiar persistence again and again, confronts you mercilessly, grabs you by the hand if you wanted to bypass it, frantically beckons to you if you fled. If I were to record the full history of all these beckonings I would be able to finish in a lifetime, nobody would ; in it a series of monotonous pictures would jostle arm in arm that would tire out the fashionable reader. I know of course my readers. If I were to please them I must not indulge in tearful sentimentalities ; if I did not, I must sacrifice the idea of money, or with a grim resign myself to fate. Just as my father does sometimes ; gives a philosophic touch to a picture of utter destitution and, grims in relish, Or like old Rakshit, our neighbour with his huge moestachus, who starves his bone-dry wife and numorous family at home and gives himself absurd airs before people in the streets. Or take our pressman Madan —calls an illfated day a fasting day, assuming the Yoga posture beats his breast, and brings God down bodily to terra firma. So it happens : it is always like that, what else could you do ? If Peter didn't open the gates of heaven we would climb down and stand in the middle. If life grabbed us we would spit out withering indifference. If

nature cheated us we would blame the physician, or, arms upstretched, pray to Him. These cogitations led me to believe that if anybody were drowned neckdeep in misery it was our middle class. I belonged to those who swore by the middle class. I wrote mysteriously and allusively to a friend, "Do you know who they are ? They are the salt of the earth, but they starve to death. They are the flowers that wither to dust. They have reared the garden but have not lived to see the flower. They have suffered in starvation but never took out the begging bowl." Irony. Sheer irony. I rejoiced in what I had built up in my imagination in ignorance of the historical interpretations. Fasting, pious lean widows who blandly lived on the earnings of their ablebodied daughters, those women I pitied and I worshipped them all the more.

But that was no matter. It did not count. Like an autumn cloud it vanished as it came. It did not possess me long. Today I feel I am free, out of my bondage. Else I would still be there, caught in the grooves of an incomplete narrow world, closed in, smothered. I would have been wrapt in my dream no doubt but would certainly have retrogressed, picked in the poison of a terrible reactions.

One lazy afternoon one of those days I had the great experience of love. I can not say how much I loved that afternoon : words would not suffice. The sky as I looked up that day looked a deeper blue than ever, it soothed the eye like a cold balm. Striding across my mind's space I reached my destiny that afternoon, where I planted my beliefs with a firm hand. Drinking their fill of the deep blue my eyes saw on either side of broad streets rows of enormous houses, sounds of numerous, strong, happy, healthy feet in the rooms, on the stairs, the voices of men and women mingled, calling out to stout doors, bringing forth to earth a strong rugged race. I saw forests of electric and

telegraph wires, tractors crossing field upon field—breaking, pounding, furrowing the obstinate soil, cronfull in the ear, glad songs of the golden cron, and a harmony of men's joyous songs and the grinding machines commingled, pervading the air. The air that once mocked mortal man now claps its wings in the leaves. Who hears it ? Blessed he that does. And so I came to love that idle afternoon. I saw in the middle of the street a nacked boy absorbed in figures with a piece of brick. Somewhere a kitchen gave out a pleasant smell of cooked stale fish, a man sang out a song savagely out of tune to the accompaniment of a harmonium, a wife belonging to that house there just finished her bath under the street-tap and gathering herself up entered the house showing off her pointed breasts, two workmen just washed down their tuck somehow and hurried off in coalstained pants. It was bewitching—not because it was the familiar canvas of a bourgeois artist. My picture hurts as it pleases. I loved this day because I was able to walk the world of scientific analysis. Wonderful ! wonderful, indeed !

Late at night the mice began their business again, started their violent antics in tins and packboxes, valiantly strode accross the floors, and sticking out their tails through boxes put us to violent ridicule.

Her cooking finished, mother came and called everybody, 'Mantu, Chhabi, Naru. Get up, my child, come !'

Mantu woke up and instantly started howling. Although Chhabi was still at her romance she threw up the book and closed her eyes.

'Chhabi, come along, cone to supper'.

But no sound came from Chhabi. Mother's broken voice said, 'But why blame me ! Oh, you are cross ! But if you are born poor.'......'Mother's eyes listened, her voice

quivered. I grew huffy, said, 'you should give them their supper, mother, it's up to them to take it or not.'

At midnight it was still more strange.

I suddenly woke up to hear a low voice—I heard father calling very low, 'Kanak, oh Kanak, are you asleep ?'

Father was calling mother by her name. I was so charmed ; in my mind I gave father back my age and thought of his love. The young man Sukumar too would call out to his wife and fill every room with echoes of its ringing music.

'Kanak, o Kanak.'

Middle—aged Kanaklata did not answer for a long time, once she moaned in sleep, or turned on her bed. Here. breathless,I smothered myself, my face into my pillow, I wished myself lost. I felt shy and uncomfortable and perspiring.

Outside, the midnight moon was up. the earth was wrapped in white muslin and brought with it a breeze cool like a stream of water, the momentary somnolence of the street dogs had ushered in a reign of cool silence. But between whiles the monkeys on the neigh-bouring roof groaned. When would I sleep ?

At last Kanaklata in the prime of her age walk up and lit up again in her glory ; pulled her veil on and wrapping herself up well in the ample length of her sari went up with slow steps like an untutored bride. The music that physical movement creates made everything plain. I felt her clear timid steps melting away in the air.

Far into the night father began crooning a tune. I heard his voice, sweet and soft as a violin's. The music soard and in its play the particles of light grew still more white, it seemed as if the stream of song eddied round and round in a mad happiness along the serpentine stairs of a palace with dawn the night air melted into an ineffable tenderness.

A crow snapped out. I have heard father sing before, but never with such depth and tenderness as now. In his soft grave song the whole world seemed so full of rich humility. Finally I went to sleep.

Next day I woke up in the midst of open laughter in whose richness even the bricks tinkled. Father was calling out, 'Pundit, O Pundit, wake up if you please, wake up. How can you be great if you don't rise early ? Come ?'

With an effort of will I opened my eyes, the morning had rolled by. I never smile at father's loving words, they take me half-way ; after all I am grown up, past twenty, too !

Pulling off the mosquito net strings father said, "All great men, you see were early risers. My father, your grandfather I mean, was also like that. However early we might get up we would hear him smoking in the sitting room. Otherwise how could he leave behind so much money and property all made in a lifetime ! He left us everything but we failed to live up to his examples. But get you up : those who get up late never get on in life'.

That was a bit too thick, I thought, taking the whole house by storm, having got up early once in a blue moon.

The whole house tinkled with joy. Mantu there was asking for money to have a haircut in the saloon, if he did not have one in an hour he would howl and make a nuisance of himself. Naru like a wiseacre was entertaining everybody with his pomposity. Chhabi just turned the pages in her novel where the hero steps into the heroine's bedroom, and evidently was in a great state of tension.

Father suddenly grew very active and began exploring the house.

Casually he came to me and said, 'Your theory sounds all right on paper, I must say, but it won't work ; it's too goody—goody. It's the time for the ramrod, do you see,

pundit, Hitler's ramrod'. I laughed inwardly. When father says a thing he says it in such a way that one feels immensely amused. Somehow he got the idea that we are all good-for-nothing fellows, wasting our own substance think of others; parched-throated ourselves we wish to dole out cool water, fallen angels seeking to get others to heaven.

He said again, 'Your Russia has given birth only to saints, but no scoundrels. I tell you they will all be in the soup. Look at Lenin, he was a great sage even as Tolstoy. But would they by able to stick the ramrod ? never ?

One feels like saying, splendid ! Has one ever such originality, such in-genuity ? I could swear that none but father could say things this way. There was never a man born on earth who could make father budge an inch of his round in argument. His face lit up with Hitlerite pride.

But there is just this saving grace that he is never serious in this matter, and he takes long to repeat himself, or I would have been put out of my wits; inspired with paternal possessiveness he would have doubtless carried it too for.

On the other side, I saw mother drowned in work. She looks deeply absorbed, almost breathless. Making vain efforts to pull the veil on her hair hanging like wisps of straw on her shoulder, in a much worn sari, her fair feet lean and bruised with the constant use of water. At her back Naru shadowing her.

From international politics father now joined the domestic conference. He called naru and said, 'Naru, my son, what will you have ?'

Naru showing his small broken teeth side without turning a hair. 'A Motorcycle, father, look how the sergeants move about on them.' But Mantu wss more circumspect. Suddenly he turned his back and bending his face downwards like a gun said, 'Look, father, see ?'

It showed that the shirt on his back was torn into shreds. Eather laughed out and said, 'well done ; Mantu feels so hot. Now he has a couple of windows in his shirt, isn't it ? He won't have to worry, he will always have the breeze fanning in, splendid, isn't it ?'

Mantu like a clever boy laughed out ; Naru displaying his broken teeth tried to outdo him, and father joined in. our humble home resounded with laughter.

Only I did not laugh. But inwardly I rejoiced. I thought, if only these pure moments lasted longer, how full of joy would our lives be ! Man would then begin to live, indeed.

Father then voyaged into the kitchen ; squatting on a stool and leaning against the wall, father said, beaming with laughter, 'what are you going to cook for us today ?'

Mother turned and laughed profusely, said, 'wbat would you like ?'

Father behaved like a child. 'Sure, you will have my menu ? Then I should say, meat, polao, sandesh. you will give me chutney, curry, fish, Sure ? honour bright ?

'My goodness, enough I say, do stop !' Mother stretched her hands and shook her head, bursting with laughter.

Naru was interested, he ran up, glanced them up and down and seeing mother smile said, 'what's up mother ? tell me, why are you laughing ? Has father tickled you ?'

'Go away, you wiseacre. Go and play'—mother showed him the way with her left hand. Father gathered himself up and said, 'well do you remember the day when we first met ?' without turning a hair mother ssid, 'Not at all ?'

'Why, don't you remember ? Near the bil you were herding the cattle ? Mother's eyes grew big. 'What the dickens do you mean ? Do you say that even as a gentleman's daughter I was grazing cattle in the fields ?'

'Why, is it a crime? I am sure, you remember everything which you just wont admit.'

'Right you are, I now remember all, really.'

Father smiled, said, 'From the boat I saw a girl standing on the edge of the water like a solitary flame. Even when I came near, I saw her still, not moving an inch, not flown away like a bird, she stood gazing straight into me, unfluttered. The picture of a goddess in her natural surroundings in an open field by the water, who would look just as natural in the dead rains. Eventually when seated on a broken chair I saw a girl it was her again, but dumb this time and the very picture of shyness.' Father burst out in laughter. After a while he said, 'But you didn't say what you want?'

'Bring me a Sari for kitchen work, would you?'

'What, red coloured?

'Yes.'

What he brought afterwards for them I do not remember, but I know he gave himself a present of a six—anna pair of slippers. Worth only six annas! Father often boasted of the bargain, although he was afraid lest the dogs should fancy the raw leather. I don't know about dogs, but a few days after one slipper vanished, goodness knows where. It was amazing.

Next afternoon, while crossing the railway yard I turned to answer a call. Whom should I see but Sasadhar, the driver, calling out to me. He was my first chum when I came to build up the union here. Comrade Bisvanath was with me that day, when Sasadhar had said gravely, 'Look here, Bisva Babu, the boss sent for me,'

'Why?'

"Do you know what the bastard said?' He said, 'Driver, give up the union or you will be in the soup. I tell you.' I was much upset. I snapped out, 'Hands off my union

please, do you see, you can go and please yourself.' And I marched off like this."

Then he had walked off a length to show how he had flouted the boss, and returned again. I was delighted on my first day's experience. And on that day I laid the foundation of my tractor dreams of that great afternoon. Needless to say, even as history takes our side, I also took history's side. I stretched my greeting hands towards the people and was blessed with their warm welcome. I was blessed. And blessed indeed were those who rescued me from my bonds of helplessness and set me free. I was grateful, grateful indeed, without end. It was not mission work nor humanitarianism ; it was a tireless scientific effort of the highest clarity.

I went up to Sasadhar. He said, 'Step in, please ?' He took me into his engine. And then passing on biri said, 'Here you are, Sukumar Babu.'

At the fall of the day I went to look up a gang. I had to arrange a meeting. Some of them glanced at me, others did not bother. Close by an engine was wheezing away, the pointsman shouted and whistles rang out.

I observed Yasin had just returned from long leave. When he saw me he stopped work and said, 'Do you know what the chaps said ?' I said laughing, 'What is it ? 'They say you should have been a barrister ?' Everybody roared. I too joined in. Mate Surendra pulled a very long face and said, 'we have something to tell you. Yasin Mian, we want to subscribe and get you into school.'

Roars and roars of laughter. All put away their work and closed in. Yasin was angry, said, 'well, well, well, it's always a joke, isn't it ? All quits with an anna each, is it ? A revolution, with an anna ? Right you are. And the revolution is going to drop down the chimney. Quite ?' Cooling off a little Yasin told us a story. It was that this

time at home he had joined a peasants' conference. He who presided at this conference had suddenly turned to Yasin and said, 'Brother Yasin, haven't you got a union at your place ?'

Yasin had struck his chest and said, 'sure ?' and had whipped out a union receipt from his pocket. The president had then grown very chummy and said, 'you are our true comrade ; brother Yasln. You are one of us.' Yasin had laughed knowledgeably. All over the world men were uniting. 'And alone shall sit on the fence, no ? All a great four-pice stunt, no ?' Yasin's face lit up, but the next moment he went tapping away at his work, deeply absorbed.

I returned. I returned with my breast full of the pride of communism, its sharp hope like bright steel, its harvest of gold. Darkness was closing in. The soft breeze wafted the pleasant smell of oil and smoke of unslaked coal from the sheds. Keeping them to the left I strode on. Just a little ahead I saw quite a few engines standing in a row on a rail, as though in a deep reverie. To me they looked quick with life, like men who had retired for the day. In their bodies how many sorts of bones and what mechanism ! Single-eyed it is true, but what a bright eye. Man has their creator. They knew neither laughter, nor tears, only had anger like great workers. And speaking of that, was there ever a greater worker ? Honestly, walking among those engines and their tremendous machinary my hair stood on end. Awe—struck I gazed at their fleshless bodies.

Then in the darkness of the night I came back home.

Sometime soon after this, very early one morning father stood in the middle of the lane, a mouse-trap in one hand, smiling like a fool. Naru and Mantu held his fingers and skipped like monkeys. Another few moments saw a huge bunch of children gathering round. A dog came up. Those among the children that were courageous lined up, some with rods, some with bricks in hand.

It was nothing much really, only some mice had been trapped. *

Translated by Asoke Mitra.

Sign

Not yet had the sky well cleared and numerous birds were proclaiming the coming day at the top of their voices when, raising a dreadful storms in the hard breast of Bongram's dying river, a launch put in to shore.

Blind Dasarath knew it first. Of his two sons one had gone wrong and the younger, laying aside the oar in his hand, was filling the bowl of the hookah with tobacco for his father. Drawing in his net Dasarath sat staring with unblinking eyes at the still dark western sky as he awaited the boy's tobacco. Suddenly a sort of booming sound come to his ears. Listening with deep attention for a while he called, "Rama ?"

Dasarath's son Ramchandra, was busy with the tobacco. He answered crossly for he felt out of sorts, "What ?"

"Don't you hear anything ?"

Without lifting his face Rama replied, "No."

Dasarath was silent again for a little and then said, "Take a look. Not a steamer of something ?"

"Then you can see, can't you, father ?" It was Ram-Chandra's belief that although his father might not see very well he certainly saw a little. Dasarath could not control his rage when told so. Apparently he did not hear this time. Not getting an answer he called again, "Rama ?"

"What ?" But against his will Rama looked in the direction indicated. Dasarath had not been mistaken. What seemed to be a small ship was visible. The sound was more definite now. In great excitement he said, "Huh, father."

"There, didn't I tell you ?" Dasarath laughed and began a tale. It was a story of long ago, before even the strom of '26. The eldest son of the Beltoli Zaminder had just returned from foreign parts and re-entered his village home for the first time. He had undergone all sorts of mishaps on the way and become so annoyed that not many days later an enormous steamer showed up, bringing out on the riverbank all the people of the nearby villages with its terrific hooting. A steamer company had opened a new line. The river of those days was no more. That was a sight Dasarath had seen in his time. Did such things happen nowadays ? Even the people of those times were no more, neither were their feats.

And a minute later Ramchandra's lips had spread the strange news throughout the village.

The person who descended from the launch with his retinue sometime later was well dressed. He was wearing a silk scarf and shiny pump shoes. A cigarette was in his mouth and a soft smile on his lips.

Of those who had crowded round some moved away and stood at a distance while others remained where they were, folding their arms over their chests and staring as if they would drop dead if they dared to move. They were the young ones. Those who were middle-aged or old stood apart and grinned. How insolent they were ; always trying to show off whatever happened.

"Babu, salaam." Old Yasin came out with a respectful greeting. He who, on the strength of his salaams, had kept himself a universal favourite all his life, could not do otherwise, now his last hours were near. The Babu acknowledged the salaam with his soft smile.

Even though it had become known that the Babu was the manager of some cloth mill—that is to say, the Burra-Babu himself, and that he had come here to engage people

for the mill there was no end of speculation as to his intentions.

It was a winter morning. Balaram, passing Rahaman's house, saw someone approaching and stood aside. "Is it you Uncle?" he asked with a laugh as the man drew nearer.

"Huh." Yasin answered.

"I couldn't recognise you so far away or guess who was coming." He laughed again. "You've heard the news? For all you say it doesn't seem quite right to me."

"Get out. You always doubt everything." Yasin looked away in supreme confidence. His manner indicated not another word need be said. There was not a wretch in these parts who could prove false what he heard with his own ears. He spoke on slowly, "There is no doubt that he has come to engage people for the mill." Balaram could take Yasin's word for it. A similar event had taken place. Once in his childhood he had been very small then, a Babu had turned up from somewhere suddenly and upset the whole village.

Akbar Ali had joined them and was listening intently. Chewing tender mango twig he held in his hand, he shook his head, spat and said, "Haven't you heard about the war, Yasin Mian? Don't you know he has come to trick people into going?"

One or two more came up. In fear and surprise they gazed at the speaker.

But seeing everyone drawn towards Akbar, Yasin got angry. Suddenly thrusting his thum into his face he said. "Do you know this?"

Akbar Ali answered solemnly, "They won't take an old man. Don't be alarmed."

The dispute grew. It would have grown louder more if some one had not said, "The Boy Moulavi."

Everyone looked that way. The quarrel died down for

a time in the hope that the boy Moulavi would be able to settle the question.

He was called the boy Moulavi for the sole reason that he was extremely young and had already become a Moulavi. He lived in the neighbouring village and came over sometimes, bringing a paper. He would read out the war news to everybody in the locality until two or two-thirty. He spent fifteen days of the month in the town, and knew town-news also. Everyone knew that he had even dined with the Nawab and that the Nawab himself had kissed his hand.

The beard of the Moulavi was not yet well-grown. He was a dressed in a punjabi and lungi, watch was on his wrist. Nobody ever bothered to notice when the watch started or stopped. Fanning himself with his paper even on this winter morning and holding his watch up in front of his face the boy Moulavi said elegantly, 'I know them.' Relating the history of his long acquintance with the Manager babu he at last observed. "Yes, it's so. He has come to engage people. Rahman, he'll take you first beeause you have a loom at home."

Rahaman hab been listening silently. He grinned. He was newly married. His hair was neatly oiled and watered, his eyes painted and his clothes coloured.

It was growing late. The Moulavi had no time. Glancing at the sun and again at his watch he said, "It's ten o' clock. I must go. Ther's work to do. I have to go to the Choudhury's."

Akbar Ali persisted in refusing to be convinced. But seeing the Moulavi about to go he went up to him quickly, spat, and "Moulavi.".

The Moulavi looked round.

"Will you do something for me" ? asked Akbar Ali. "put in a word for my brother—"

The Moulavi replied distinctly, "I will, I will," and walked rapidly away.

Yasin never betrayed pleasure no matter how pleased he was.

Glancing once in their direction he remarked, "Aren't you convinced yet ?"

Balaram was convinced. He had been doubtful. Appro-aehing Yeasin respuctfully he said, Uncle. I' like to have a talk with you." Who knew what advice Balaram Mandal had come for ? Yasin grinned.

Everything yas glowing in the afternoon sunlight. Seated in th shade of a tree the Maneger Babu was smiling softly as he spoke, "Yes, I have liked your village very much. You are the praid of the country. Before machines came you supplied all the cloth in India. It was event sent abroad. Yet today you are starving. How many know your worth ?" pointing towards the river he said, "There is a river like this there too. You will live in fine barracks beside it. Nearby is the hospital, plying field, the cinema, whatever you want." The Manager Babu smiled softly.

Rahaman gave his name. That night at twelve he was to go abroad by the lunch.

When he got home his old father handed him the hookh and said, "See you eat early and get to bed. I'll call you at twelve. Go on and get to bed."

As usul Rahaman conformed with his father's wishes. Quickly finishing his meal he went to bad without dealy.

But it did not take long for twelve to strike. Old Rahaman went to the door and called, "Bap, it's time. Come on and get up".

There was no reply and no one came out. Waiting a while in silance the old man smiled to himself, remembering his own deceased wife.

But twelve was striking. The old man called again, "Rahaman, get up. The launch'll be leaving before long." With this he went to the verandh outside his own room and sat down to prepare tobacco. After a while he picked up his hookah and went again in to the house. He found Rahamam sitting silently on the inner veranda, an arm around one of the roof poles. Handing him the hookah, the old man said "Get ready quickly, Bap, Don't delay longer."

Rahaman sat on as he was, clinging to the pole.

Taking a very old lantern in one hand and a big shiny Lathi in the other the old man led the way. He never went out without both of these whether there was a fear of snakes and men of the way or not. walking slowly he said, "Write us letters from there. Otherwise I shall worry."

"All right." Rahaman answered as slowly.

Beyond Golam Ali's house wayfares have to pass beneath a great Bokul tree. The air all around is filled with the scent of its flowers. Rahaman's whole body went numb as they walked under it. His eyes filled and closed drowsily. He felt he was still breathing deeply with his head on a girl's flower-like breast.

Striking out with his lathi this way and that the old man called again. "Bap."

"Speak, "but though he listened for some time Rahaman heard nothing further. Perhaps the old man had forgotten what he wanted to say.

A little later the lights of the launch came in sight. A crowd of people stood around. All were talking loudly. Some were trying to climb up the gangway to tne launch. All together there was a great uproar.

Taking his son a little aside old man said again, "Bap" ?

—"Speak".

"I have something to say. I have grown old without your ever having left me to go anywhere at any time. But to-day you are going away. Tell me how I can console myself ?" Tho old man got the words out and last and began to cry. It was Rahaman's first acquaintance with such a a spectacle. He could not think what to do.

In the cool breeze over the river the wan light of the lantern trembled. countless stars were in the sky and there was the smell of water. People were noisy, agitated. by the prospect of coming happiness.

In the old Man's shrunken had his lathi was shaking.

When Rahaman came in board he found the boy Móulavi dashing about the launch like a spinning firework. The fellow was so thin and small he seemed to fly with the wind, making a thousand miles a minute.

Seeing Rahaman he glanced at his watch and, looking restlessly about, spoke rapidly, "So you've come at last. It's time."

The Moulavi did everything on time. Looking at his watch again he moved forward.

Rahaman stood alone at the railing. A few feet below was their village river. Because he was leaving it today it seemed very much his own.

The lights of the launch sparkled in the water. Reflections mirroring people inside the launch from the chest up could also be seen. The trees on the shore, as far as one could distinguish them, appeared to be only a deeper darkness in the bosom of the night. Kinfolk stood like the trees, lantern in hand. lovingly, sorrowfully bidding farewell.

Rahaman lowered his eyes. In the water of the river he beheld the form of a woman. She was calling him and her face was running with tears. Rahaman leaned over. With sweat dripping from his nose and his whole body,

sweaty, he discovered the smell of her perspiration was still on him. He breathed it in deeply.

His eyes were heavy with sleep. Somehow or other he managed to make a place for himself and lay down with his little bundle under his head. A little later he began to dream. There was the forewarning of a storm in the sky. A gale was blowing. The tops of the tall areca and coconut palms tossed wildly ; unruly waves ran in the river. The Boro paddy bowed heads quivering with pain ; birds cried in the sky. Rahaman seemed to hear the cows in the shed lowing plaintively. They had never lowed like that before. Dashing out to see what was the matter he found not the cows but his wife. And the cowshed was not really the cowshed but his bedroom. His wife began to cry at the sight of him. She clung to him and put a hand on her breast and said. "See, it hurts me here. I cannot bear my longing for you. I shall die." A little later Rahaman became aware that his legs were twined like thread around someone else's.

"Rahaman ? O, Rahaman "?

Rahaman struggled awake and trying to look straight, asked,"Who ? Aju".

The Moulavi knew his wife's name. He laughed and said, "No, I'm not your wife. I'm the Moulavi."

Rubbing his eyes Rahaman said, "oh."

But the Moulavi was an efficient person. Looking at his watch he said, "It's almost dawn. How much longer will you sleep ?"

Rahaman looked outside. Layers of darkness were still hanging heavily against each ather. A light was burning in the manager's room.

The Moulavi started talking. realting the history of his experiences, the varied events of life. Rahaman listened in wonder. Mnay were the stories the Moulavi told.

But dawn did not come. They got up and walked about, waking up a person here and there to talk. About two hours passed. Still there was no dawn. Outside it was as dark as ever. Only the sound of water lapping came through the stillness of the deep night.

Rahaman had no idea if the hands of the Moulavi's watch moved or were still. He just stared.

Peeping at this and that on the launch he wandered about by himself for a while. Then he squatted down and thought of his wife.

A long time later the dawn came. Now the river was very big. The other shore was foggy. In the sunlight the water shone as if bright new rupees had been scattered over it. On both river-banks brick kilns and jute warehouses occasionally came in to view.

Far away the chimneys of mills could de seen. But there was no trace of smoke.

The Moulavi turned up again. He must certainly have fresh news.

"We have arrived." He announced.

A stir was created. They had reached their place of work. Everyone rushed forward. That thing like a sort of tower, was that their mill ? The Moulavi kept on explaining to them. He knew everything. They all gazed at it in surprise and joy.

To reach it did not take long. The launch gradually slackended it's speed and approached the shore.

The Manager Babu put in an apperance. He has beaming with satisfaction. All made way for him ; where four feet would have sufficed they gave way ten.

But before the launch could cost anchor a terrible noise become audible, the mingled shouting of thousand of voices They all pricked up their ears. Rahaman, not having wholly given way to dilight at beholding ths mill,

had noticed it somewhat earlier than the others. Separating himself from them he now tried ro make out what it was about. The Moulavi showed no trace of surprise. He went and stood beside the Manager entirely unperturbed looking up into his face in the hope of understanding what was the matter before everyone else. But the Manager had suddenly gone pale ; the soft, malicious smile was no longer on his lips. He went hastily inside to give some instructions to the crew of the launch.

What came into sight a few seconds later was without a doubt something amazing.

There was a large sandbank near the shore. Beyond it were the mill premises. As the uproar grew the entire sanbank filled with thousands upon thousand of people. They were running for all they were worth, for life or for death. There was endless surprise in Rahaman's eyes as he watched them ; such a sight he had never seen in his life, nor dreamt of. It was as through a great river had suddenly broken loose and was sweeping the whole earth away with its rushing waters. Rahaman's breast quaked, his breathing quickened.

Some of them splashed down into the water and surrounded the launch. Most stood on the shore. They were all terribly excited, some waving their arms and saying something, others only shouting. From their expressions and attitudes it seemed they would like to have sunk the launch then and there if they could. And what a noise. It seemed the very sky would be rent and the earth cave in beneath such earnest and furious trampling. Even the water of the river was agitated by the sound of there shouting.

But Rahaman noticed that the strength of all seemed united in the person of one in the front. The man was young. There was a difference in his appearance noticeable

even among these thousands of people. He was waving his arms and shouting at the top of his voice. At first nothing could be heard but at length the noise died down of itself. Amazed, Rahaman heard him declaring proudly, "Comrades, don't be surprised to see us.

"We are the workers of this mill. We have spent our lives in the place where you have come to work. They told you only about jobs, this we know, they didn't tell you the truth. The mystery about those jobs has been kept from you. Comrades ! Listen to us just once, believe us ! You do'nt know those who have brought you here in the hope of jobs; but we know them. we went to them only to make known what we needed, to tell them our complaints. We made some request but they took no notice. Instead they hit us in the face with lathis. Why should we put up with it ? We struck. The work of the mill is stopped. We made our protest. To crush this strength of ours, to beat us down, to deprive us of our daily food, they lied to you and brought you here. Don't believe them. Brother all, the world is to us what it is to you, We are as poor. as exploited, as hard up as you are. We have no homes. if we are driven away from here today we will have no places to go to to-morrow. My brothers, pity us. Don't deprive your brothers of their food ! Be brothers to us. Remember, those who are turning us away with lathis today will not spare you from those same lathis to-morrow. Comrades, you are our brothers. Listen to what we tell you, believe a comrade—don't kowtow to the person who is taking away your brothers' food today".

Rahaman was stunned. His thoughts became disorderd ; he could thing no farther.

The Manager Babu was no longer smiling. Flushed with anger he issued orders ; "Put down the gangway ! Put down the gangway !".

The Moulavi moved about smilingly he explained to then all, "It;s nothing. Where fifty people apply for one job, fifty thousand come for fifty. They want to take the jobs by force, as in the days of Mug rule..." Priyanath, Supati, Badsha Mian, Chand mian and a lot of others agreed with the Moulavi. Pointing at the vast crowed on the sandbank they laughed like sillies.

The gangway was down. By one and two the men descended. Rahaman went down last of all. He looked around him. No one from his village was near. They had mingled with the crowd. He wandered about alone and went up on the bank. The crowd was not so dense now. It had scattered and become hesitant.

Someone pulled at his clothes and said, "Listen".

Rahaman saw he was a very young boy, not more than sixteen or seventeen. His face was fair though flushed and sweaty in the sun; his hair was long and tousled, the buttons of his shirt undone. His fair throat and chest struck the eye. In a winningly sweet voice the boy asked, "Where do you live, brother ?"

Rahaman stared at him in surprise.

The boy repeated, "Please tell me ? Where do you live ?"

Rahaman answered, "Bongram."

"Bongram ? Why ? What a pretty name ! How far is it from here ?"

Rahaman figured out the distance and told him.

"You've just arrived here, haven't you ?" the boy said, "why have you come ? just for an outing, no ?"

The insinuation annoyed Rahaman at first but the sweetness of the boy's speech and a glance at his face made him forget it. He said, "I have come hare to work."

"Oh." the boy looked around carefully and then said, "But what will happen to those who are working now ? Do you know what has happened ? They are being dismissed

for no fault of theirs and you will be put in their place. Would you like to deprive a man of the only food he has ?"

Rahaman said nothing.

"Tell me, Do you want to do that ?" the boy said, "Don't think you'll be able to keep in their good books either for always. They'll turnyouout some day too like this." With a slight smile he went away. Rahaman would have liked to offer him a cigarette but he was already gone.

The heat was growing. The sandbank was simmering. The breeze from the river was as harsh as the sun.

Rahaman walked towards the mill. He saw people standing with linked arms before the gate with the intention of preventing any one from going in. some of his fellow-villagers were standing in groups with folded arms at a distance. Rahaman joined one. Badsha Mian was the chief speaker. Seeing Rahaman he said, "They won't let us go in, Rahaman. They threaten."

Rahaman laughed. As if it had suddenly occurred to him, he said, "Well, Badsha Mian—"

"Seak."

"What would they do if we forced our way in ?"

Badsha Mian was thrown into a quandary. Although he had heard of such things he did not know their sequel. "Well, what could they do ?" he said irresolutely.

"Really, what could they do ?" Some one said, "What'd they do ? Beat us up !"

Badsha Mian found his feet, nodded and said, "Huh. They'll beat us up. Right, right."

So it was decided that if they tried to force an entry they would be badly beaten.

Later the Moulavi came up and said they must go round to another gate in front. Everyone was there. Why were they still standing here ?

They quickly agreed with the Moulavi. But when they got to the other gate they found people standing with linked arms in front of it also.

Badsha Mian lost his temper, "Why do they hang about like Leeches wherever we go ?" he said.

The Moulavi snapped his fingers and said, "Come on all of you."

They were lucky to have a person like the Moulavi with them in such troublesome circumstances. Otherwise who knew what they would have done ? Banding together they advanced. But in the meantime the people had lain down, completely filling the gateway.

What tactics were these ? Badsha Mian was astonished. They did not threaten to beat them. Seeing how things were developing Rahaman moved away to a distance. With him went some of the others. The Moulavi was unable to enter the gate.

A long time passed. The sun was now overhead. The uproar all around was unabated. Rahaman could not imagine how or when the issue would be decided running about and from one gate to another he had grown hungry. His wife had tied some puffed and flatened rice in a small parcel with a slab of molasses it to him.

Rahaman turned aside, found a comparatively uncrowded spot and sat down. He opened his parcel and began to eat. Afterwards he washed his hands in the river. Then he felt the need for a smoke, and bought a pice worth of biris from a shop a short distance away. Every time he put a biri to his lips somebody turned up to demand a share. The pice's worth was quickly used up. Rahaman was newly married. How could be refuse ?

Events were moving swiftly. Minute by minute the most astonishing things were happening. Thousands and thousands of people were excitedly moving around.

Rahaman stood under a tree and watched, puffing at a biri. His surprise grew greater and greater.

Hours passed. It was afternoon. The men looked like ghosts. They had no food, been out in the hot sun all day, run from one gate to another, and were wracked by anxiety. The Moulavi summoned them again. They could not wait longer. A lot of time had been lost.

They dashed around to another gate and stopped in front of it. The noise grew louder. All sorts of sounds ripped through the air. Ears were almost splitting. Rahaman was behind everybody else in the rear of the crowd. He did not see what was going on in-front. Those ahead of him had pushed forword a long way. He was by himself. When he looked around he saw the young man again, his face flushed with excitement, his hair disheneled. He was shouting at the top of his voice. Rahaman could not make out what he was saying. He looked in-front. People were lying on the ground blocking the entrance. Then the Moulavi walked over the prostrate bodies and went through the gate. Some followed him. Rahaman could not believe his eyes. He stared for a long time.

The outcry was fearful. He had never in his life heard anything like it. His ears were hurting but he listened. People were running. Some were waving their fists. Others were fleeing. One clambered on to a mound and began to speak. Rahaman was amazed to see it was the same young man who had spoken before, on the riverbank as the launch had put into shore. Rahaman had not forgotten what he had said then. He went closer. The angry crowd grew denser. The young man was speaking determinedly, saying in a voice deep with conviction :

"Friends, my peasant brothers—"

The sky was red with the evening light. The heavens glared down on the turmoil as if cursing it liberally. The

ground was cracking under the pounding of the thousands of feet pounding upon it. If the noise had burst into flames the world would have been instantly consumed. The speaker struck the ground with his lathi, raised his strong right arm on high, waved his clenched fist and shouted,

"Friends, my peasant brothers—"

The sound of firing erupted suddenly, fearfully. People fled in all directions, running like mad, oblivious of everything, ignoring those who dropped. Each was trying to save himself. The plain filled with armed soldiers almost instantly.

Rahaman did not notice it at first. His head reeled when he realised what was happening, his legs shook. There was a roaring in his ears. He ran. Behind him he heard the screams and groans of those who were injured. When he glanced back he saw bloodied boides rolling on the ground, men stumbling and dropping and they struggled to keep on their feet. A red stain was spreading in the yellow winter dust.

Rahaman did not stop untill he had no strength left. He sat down at the foot of a gul mohar. He had got away. His legs were still trembling violently and a storm was raging in his breast. He tried to look back but he could not. His eyes closed, filling as he remembered what had happened. He lay there, limply.

It was late at night when Rahaman woke. There was not a sound any where. He sat up slowly. Every bone in his body was aching. He forced himself to his feet and limped to the river bank. It took him a long time to reach it. The breeze was cool and strong. Small and large boats were riding on the water. He could hear it lapping against them, Rahaman remembered the young man. "Friends. Those who are turning us away today will not spare you tomorrow."

Rahaman's eyes glistened as he stared at the water.*

* *Translated by Lila Roy*

পরিশিষ্ট—১

॥ ক ॥ সোমেন চন্দ : স্মৃতিকথা, আলোচনা

তিরিশের দশকের শেষদিকে—১৯৩৬/৩৭ সালে নির্মলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সোমেনের পরিচয় হয়। শ্রীঘোষ ঐ সময়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে সোমেন 'বন্যা' উপন্যাস, 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন' —'এন্ন সোলজার' প্রভৃতি গল্প লেখেন এবং সেগুলি শ্রীঘোষ সম্পাদিত 'বালিগঞ্জ', 'অগ্রগতি' প্রমুখ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে।

সোমেনের মৃত্যুর পর শ্রীঘোষ 'সবুজ বাংলার কথা' নামক পত্রিকায় সোমেনের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ লেখেন তা উদ্ধৃত হল। সমসাময়িক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রীঘোষের উন্নাসিকতা সুস্পষ্ট এবং দৃষ্টিকোণজনিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বলে সমালোচনার বিষয় হলেও 'কর্মে ও কথায় গানে' আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান বিপ্লবপন্থী সোমেন তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

> "উত্তেজিত বিরুদ্ধপক্ষীয় ছুরিকার আঘাতে রেলশ্রমিক সমিতির সেক্রেটারী সোমেন্দ্র চন্দ নামক জনৈক যুবক ঘটনাস্থলে মারা যায়। সোমেন্দ্র চন্দ্র সাহিত্যিক ছিলেন।.........'
>
> "প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে অসংখ্য মৃত্যুকাহিনী ও অন্যান্য দুর্ঘটনার সংবাদের ন্যায় এই সংবাদটিও সংবাদপত্র-পাঠকরা অন্যতর আবশ্যিক সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।
>
> "অন্যান্য সাময়িক অজস্র সংবাদের মতো এই ঘটনাটিও যথা-সময়ে জনগণ বিস্মৃত হোতো। কিন্তু জনকয়েক বুদ্ধি ও বিদ্যাব্যবসায়ীরা আবিষ্কার করলেন, (অথবা পরম্পরায় শুনলেন,) সোমেন্দ্র চন্দ্র তাঁদেরই মতো 'বিপ্লবপন্থী সাহিত্যিক'

ছিলেন। অতএব, যথাসম্ভব সমারোহ ক'রে তাঁরা সভা আহ্বান করলেন, সংযত ভাষায় এই দুষ্কৃতির মারক ফ্যাসিস্ত-পন্থীদের কার্য্যের প্রতিবাদ করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করলেন, এবং যথাকর্ত্তব্য করা হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

"তারপরে ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সোমেন্দ্র-স্মৃতি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। (অবশ্য, এই সংগ্রহ সোমেন্দ্র কিংবা স্মৃতি কোনোটার সম্পর্কস্থ না হওয়া সত্বেও প্রকাশক ও লেখকরা অকুণ্ঠিতভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন।)

"সৌভাগ্যের বিষয় (এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক যে), পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি ও বিদ্যাজীবীরা এবং কলকাতার বর্ত্তমান ছাত্র সম্প্রদায়ের 'পুরোগামী সমিতি'র সভ্যবৃন্দ সোমেন্দ্র চন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানতো না; এবং একথাও অনস্বীকার্য্য যে তাঁর রচনাও তাদের অনেকেই চাক্ষুষ করে নি, সুতরাং এই অবস্থায় যা হবার, তাই হয়েছে।

"আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, গত কয়েক বৎসর ধরে কল্‌কাতায় তথা বাংলাদেশে 'বিপ্লবী সাহিত্যিক' মার্কা নিয়ে ভাবপ্রবণ এবং অপরিণত ও সহজাত শ্রেণী-সংস্কার-বোধে সীমাবদ্ধ একদল লেখক ও বুকনি-বাজ বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা মারফৎ নিজেদের প্রচারে অত্যধিক চেষ্টাপরায়ণ হয়েছে। এরা সমাজে ও সাহিত্যে সত্যিকার বিপ্লব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এবং যে চিন্তাবোধ, সামাজিক মনন এবং কর্মপ্রবণতা মানুষকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তৎ তৎ সম্পর্কে বিপরীত প্রয়াস-সম্পন্ন। বৈপ্লবিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরা, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় decadent। বলা বাহুল্য, এই ডিকাডেন্ট সাহিত্য রচয়িতারা আর যাই হোক্ সত্যিকার বিপ্লবী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মর্য্যাদা রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

"সোমেন্দ্র চন্দ্রকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। আমাদের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ। তার মৃত্যু-সংবাদ যখন আমি পাই, তখন আমি পারিবারিক একটি শোকে ব্যাপৃত। এবং যুগপৎ এই দুই শোকের ফলে আমি সোমেন্দ্রের মৃত্যুকে দূরবর্ত্তী পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করে দেখতে

পারিনি। এবং এটা অতি সত্যি কথা যে স্বজন বিয়োগকে নিরপেক্ষভাবে দেখবার সামর্থ আমার মতো সাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

"এই সব কারণেই, নিজের অযোগ্যতাবশতঃ তথাকথিত 'প্রগ্রেসিভ' বা পুরোগামী সাহিত্যিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সোমেন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষার প্রয়াস-ব্যাপার বিশেষ আগ্রহ সহকারেই লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখা গেল যে স্মৃতি রক্ষা ব্যাপারটাই প্রায় ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে, এবং সোমেন্দ্রের মত, আদর্শ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও কৃতকর্মের সঙ্গে সামান্যমাত্রও সংশ্লিষ্ট না হয়ে নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের ঘটাবিশিষ্ট হয়ে উঠছে তখন ব্যথিত অন্তঃকরণ নিয়ে শুধু এই কথাই বলতে ইচ্ছা হয়, 'এই সব উচ্চ নিনাদিত সমবেদনা যেন বিগত-আত্মার স্মৃতিকে স্পর্শ-মলিন না করে।'

"আমার এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সোমেন্দ্র চন্দ ছিলো আন্তরিকভাবে বিপ্লব-বিশ্বাসী ও নিজের পরিমিত কর্মক্ষেত্রে বিপ্লব-প্রয়াসী। তার সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘকালের নয়। (তার লিখিত প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে,) জীবনের ক্ষেত্রেও তার বয়স অল্প ছিল—মাত্র একুশ বৎসর। এই অল্পকালের জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে অপরিসীম প্রয়াস করেছিল। এই প্রয়াসের প্রমাণ তার রচনা-সমূহের মধ্যে বিশেষভাবেই পরিস্ফুট।

"বিক্রমপুরের দরিদ্র মধ্যবিত্ত-সংসারের মধ্যে নিয়ত অভাব অভিযোগের মধ্যে জন্ম তার। অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে মিটফোর্ড মেডিক্যাল্ স্কুলে ভর্তি হয়েও পড়াশুনা এগোয়নি তার। মনের মধ্যে ছিল একটা দুর্জয় অভিমান, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রতি; এবং সেই অভিমানবোধ তার সাহিত্য-সাধনার প্রতি ছত্রে উঠেছিলো ফুটে। কিন্তু যে অনাগত বিপ্লব রাত্রির শেষপ্রহরের প্রথম অরুণোদয়ের মতো, তার পূর্ণ-প্রকাশের আগেই তার মৃত্যু ঘটলো। প্রাক্-বিপ্লবের অনুরাগরক্তিম নয়নে সে যে স্বপ্ন দেখেছিলো, অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে তা ধরা পড়বার আগেই সেই চোখে ঘনিয়ে এলো রাত্রির নিঃসীমতা।

"অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে সে 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন' নামে একটি গল্প পাঠায়, সেই প্রথম লেখা পাঠ করেই আমার মন ওঠে চমক দিয়ে,—পাকা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। তার পর হোলো পত্রযোগে আলাপ। ক্রমে তার আরো অনেক গল্পই ঐ পত্রিকায়

প্রকাশিত হোলো। রচনার ভেতরে যা প্রকাশ করতে পারতো না, তা লিখে পাঠাতো অজস্র চিঠি পত্রের ভেতর দিয়ে। আমাদের অন্তরঙ্গতা ক্রমে জমে উঠল।

"অগ্রগতি" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর আমি "সবুজ বাংলার কথা" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলাম। সোমেন্দ্র তাতেও তার লেখা দিয়েছিল।

"এই পত্রিকাটিও কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর উঠে যায়।

"ইতিমধ্যে আমি বর্মায় যাই। নানারকম কাজে আমাকে অনেকটা সময় সেখানে কাটাতে হয়। এই সময়ও সোমেন্দ্র চিঠিপত্র ও মাঝে মাঝে তার লেখা গল্প আমাকে পাঠিয়েছে। তারপর দেশে ফিরে এসে "বালিগঞ্জ" নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করি এক বৎসর। এবং বলা বাহুল্য, প্রথম সংখ্যা থেকেই তাতে সোমেন্দ্র গল্প ও উপন্যাস লেখে এবং ঢাকা শহরে বন্ধু বান্ধবের সহযোগে পত্রিকাটি বিক্রি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

"উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া, 'নবশক্তি' পত্রিকায়ও তার লেখা একটি গল্প বেরোয়। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র রবিবাসরীয় সংখ্যার জন্যে তার লেখা একটি একাঙ্ক নাটক 'গৃহীত' হয়ে আজ প্রায় দু বছর ধ'রে পড়ে রয়েছে বলে শুনেছি।

"ঢাকা শহরের প্রগতি-পন্থী সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে, প্রধানতঃ সোমেন্দ্রের উদ্যোগেই "ক্রান্তি" নাম দিয়ে পুস্তকাকারে একটি রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সোমেন্দ্রের একটি বড় গল্প এতে ছিলো।

"বলতে গেলে, সোমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস এ-ই।

"সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই কথা বলা চলে যে—সাহিত্যের যে পরিণত অবস্থা সমালোচনার কষ্টিপাথরে পাকা দাগ রেখে যায়, সোমেন্দ্র-সাহিত্য সে অবস্থায় পৌঁছায় নি। বহুকালের স্তরবিন্যাসের চাপ লেগে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বস্তুপিণ্ডের যেমন আনবিক পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে তা একদিন হীরকে পান্নায় চুনি ও সোনায় ঝলমল করে ওঠে,—সোমেন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা তেমন বহুস্তর অভিজ্ঞতার চাপ পেয়ে উঠতে পারে নি। এক এক জায়গায় হয়তো কিছুটা প্রায় পরিণত অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে কিন্তু তা সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে নি।

"আমার কাছে, সোমেন্দ্র চন্দের সাহিত্য অপেক্ষা তার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়ো হয়ে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার ছিলো অগাধ আগ্রহ। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও পারিপার্শ্বিক বিমুখ পরিবেশের মধ্যে তার সাহিত্য-পাঠের ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করতে পারে নি, কিন্তু তারই মধ্যে থেকে যেখানে যা কিছু সামান্য পেয়েছে, তাই সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। তার চারপাশের দেউলিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনই ছিলো তার সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা। Anthropology, Economics এবং Philosophy of Religion তার পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট হয়েছিল। এবং পুঁথিগত নীতিবাদকে সে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে দেখে তবে তা গ্রহণ করতো। তার একাধিক চিঠির ভেতর দিয়ে তার এই অন্তর-প্রয়াস ফুটে বেরিয়েছে।

"যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অভিজ্ঞতা মানুষকে বড়ো সাহিত্যের খোরাক যোগায়, যে অভিজ্ঞতা বাঙালী সমাজের দরজায় প্রায় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সোমেন্দ্র চন্দ সেই অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে পুরোপুরি উপলব্ধি করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

"বিপ্লব একটা মনগড়া বা মাত্র অনুভূতির ব্যাপার নয়। পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থায় সঞ্জাত অসন্তোষ চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে তোলে আন্দোলন, তারপর ক্রমে কর্মের মধ্য দিয়ে তার ব্যবহারিক প্রকাশ হয়। এবং যখন সর্বজনীনভাবে এই চিন্তা ও মনন দেখা দেয় তখনই সার্থক বিপ্লব সম্ভবপর হয়। সমবেতভাবে জনগণ কোনদিনই বিপ্লবের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে না, তাদের পরিচালনা করে থাকে গুটিকয়েক অগ্রগামী লোক। সোমেন্দ্র ছিল এই অগ্রগামী শ্রেণীর লোক। তাই বিপ্লবকে পূর্ণতর করবার জন্য, সে জেনেছিল যে বিপ্লবের এই মাত্র পথ, এবং সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে কর্মপ্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করবার মূল্য সে নিজের জীবনের বিনিময়ে দিতে পেরেছিল। আততায়ীর প্রত্যেকটি আঘাত তার শরীরের সম্মুখভাগেই পড়েছিল, পশ্চাদ্-ভাগে পড়ে নি।

"কলকাতায় এসে সে মাসাধিককাল আমার সঙ্গে ছিলো। ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে। সেই তার প্রথম কলকাতায় আসা। কলকাতা সম্বন্ধে তার কৌতূহল ছিলো বিস্তর। এখানে অসংখ্য সাধারণ পাঠাগার, জ্ঞান জগতের আহরণী ক্ষেত্র। এখানে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানজীবীর

মিলনক্ষেত্র। যাঁদের নাম ছাপার অক্ষরেই মাত্র দেখা গিয়েছে, এই কলকাতা-তেই তাঁরা রক্তমাংসের দেহে বিচরণ করে থাকেন! স্বপ্নাক্ত দৃষ্টি নিয়ে সোমেন্দ্র আধুনিক বাংলার তীর্থক্ষেত্র সেই কলকাতার পথে বেরোলো!

"তারপর চল্‌লো একমাস ধরে তার তীর্থপরিক্রমা। আর এদিকে আমি বেঁচে থাকবার সমিধ-সংগ্রামের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সন্ধ্যার দিকে ফিরতাম ঘরে। অস্তোন্মুখ সূর্যের রশ্মিছটায় তখন কলকাতার আকাশ পরিব্যাপ্ত, পূর্বাচলের পথে রাতের অন্ধকার আস্‌ছে নেমে। প্রত্যহই দেখ্‌তাম জানালার পাশে বসে সোমেন্দ্র ধূলিমলিন রাজপথের জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সে তাকাবার ভঙ্গি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

"আপনি যে লিখেছিলেন আপনার বাড়ীর সামনে কৃষ্ণচূড়ার শিখরে লাল ফুলের সমারোহ, তারা কোথায়?'—সোমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করছিল।

"আমি বলেছিলাম, 'সম্প্রতি সেটা কাটা গেছে, আর সে জায়গায় উঠেছে ঐ চারতলা বাড়ীটা।'

"না কাট্‌লেও কি মানুষের বাস করবার স্থানাভাব হোতো কল্‌কাতায়?"

"আজ ভাব্‌ছি, শুধু কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল নয়, অনেক মানুষের লাল হৃৎপিণ্ডকেও টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হয়,—তা' নইলে যে একদল লোক নিঃশ্বাস ফেলবার স্থানাভাব বোধ করে!'

"হয়তো বা তাই। সোমেন্দ্র চন্দ তো একটি উপলক্ষ্য মাত্র। নিঃশ্বাস ফেলবার নিশ্চয়ই স্থানাভাব ঘটেছে, তা নইলে আজকের দিনে এতো মৃত্যু-মহোৎসব কেন?'

"একদিন হঠাৎ সোমেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলকাতায় এলে, কি কি দেখ্‌লে, কার কার সঙ্গে দেখা হোলো বল্‌লে না?'

উত্তরে সে বলেছিলো সামান্য চারটা কথা, কলকাতাকে জয় করতে হবে।'

'মানে?'

"মানে, আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অনিবার্য্যভাবে পচন ধরেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবী সমাজেই,—অর্থাৎ যাঁরা প্রগতি-পরায়ণ লেখক তাঁরাও বাদ যান না,—সবার ভেতরেই পচন ধরেছে। এরা বলেন অনেক, জানিনা, কিছুই বিশ্বাস করেন কি না! জানেন,'—স্বভাব-গম্ভীর চাপা প্রকৃতির সোমেন্দ্র উত্তেজিত হয়েছিল, 'কিন্তু জানেন,

এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই ভেতর থেকে একদল যাবে নীচে নেমে; তাদেরই ভেতর থেকে আগামী দিনের বিপ্লবের পুরোহিতরা বেরিয়ে আসবেন।'

"রোমানফের লেখা একটি গল্পগুচ্ছ সোমেন্দ্র তখন পড়ছিল। বললো, 'এই ধরণের গল্পের উপাদান আমি ঢাকা বিক্রমপুর থেকেই আপনাকে হাজার হাজার দিতে পারি। কিন্তু রোমানফ্ কেবল খারাপ দিকটাই দেখেছে।'

"ভালো দিক যেদিকটায়, সেদিক যে এখনো সম্ভাবনার বাইরে!"—আমি বলেছিলাম।

"সেই সম্ভাবনার বাইরে যে ইঙ্গিত ছিলো, সোমেন্দ্র তারই সন্ধান করছিলো নিঃসঙ্গ মানস অরণ্যে, উদয়গিরির পথে। মনে মনে স্বপ্ন-যাত্রায় আমরা সে পথের সন্ধান যে করি নি, তা নয়। কিন্তু নিঃশব্দ অথচ সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে যারা সেই তিমির গহন অরণ্য দিয়ে চলেছে, সোমেন্দ্রও তেমনই, সেই অজস্র পুরোগামীদের মতোই নিঃশব্দ সুদৃঢ় পদসঞ্চারে তাদেরই প্রায় মুছে-যাওয়া পদচিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়েছিল। উদয়গিরি উদ্ভাসিত করে একদিন নতুন দিনের সূর্য্যালোক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে,—কল্পনায় তা' অনুভব করছি যেন! সেদিন জাগবে বনস্পতির শাখা প্রশাখায় মুক্ত হাওয়ার শিহরণ, উঠবে পাখীর কলতান নতুন দিনের অভ্যর্থনায়, রাত্রির অন্ধকারে যারা পথ করে নিয়েছিল, তাদের পদচিহ্ন ঢাকা থাকবে শুকনো পাতার আবরণে। আমরা বিস্মৃত হবো পুরনো কালকে।

"যারা সোমেন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানতো, তাদেরও অনেকে ভুলে যাবো। সে যা দেখ্‌বার আশায় এগিয়ে চলেছিল, হয়তো তার আভাস আমার জীবনেও সম্ভবপর হবে না, হয়তো পরবর্ত্তী কোন এক যুগে তা' ঘটে উঠবে। কিন্তু আজকের দিনের ইতিহাসে আজকের ঘটনাই সব চেয়ে বড়ো। আগামী দিনে সূর্য্য দেখা দেবে, কিন্তু বর্তমান রাতের অন্ধকারের দিকে আমাদের অসহায়ের মতোই তাকিয়ে থাকতে হবে। সোমেন্দ্রের ভাষাতে বলি, 'মৃত্যুর কথা নয়, মানুষ মরিলেও অনেক সময় শান্তি পায়, কিন্তু পৃথিবীর বুক হইতে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে মৃত্যুকে নিয়া জীবনের এমন বিশ্রী কাড়াকাড়ি, যার শেষ দৃশ্য আরও নিষ্ঠুর, আরও বিকট, সেই দৃশ্যের তীব্র হীনতা যে চোখে জল আনিবে, এটা বিচিত্র নয়।'

"চোখের জল কর্মপ্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে। সেই জন্যই, সোমেনের বীভৎস মৃত্যু দেখেও আমরা শপথ করে বলতে পারছি না যে, যারা অন্ধকারকে আরও দীর্ঘতর করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আরও কঠোরতরভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—যতদিন না তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটছে।

"কারণ, সেই শপথ যারা করতে পারে, এবং সেই শপথের মর্মানুযায়ী কর্মে নিজেদের উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত রাখতে পারে,—আমি জানি,—আমি তাদের নই। জন্মগত বৃত্তিগত সংস্কারগত সীমাবদ্ধতায় আমার বোধশক্তি পঙ্গু। কল্পনার ক্ষেত্রে নিজেকে যতোটা বৈপ্লবিক আদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকি না কেন, আমি জানি আমার মতো অন্যান্য শ্রেণীসচেতন মধ্যবিত্তরা সকলেই,—সমাজের বাম ও দক্ষিণের মাঝখানে শুধু হাইফেন-এর মতো হয়েই বর্তমান সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করবো। কেন না, মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার ঐ একমাত্র শাশ্বত উপায়।

"কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই একদিন শ্রেণীস্বার্থবিরোধী বেরিয়ে আসবে। তারা বেরিয়ে আসছে, তাদের অবিশ্রাম অসংখ্য পদচিহ্নে অরণ্য ছেয়ে যাবে। তারাই ভাঙবে একদিন সমাজের এই বর্তমান আপ্রাণ-প্রয়াসকৃত কৃত্রিম ভারসাম্য। তাদের শপথের নিঃশব্দ বাণীসঞ্চার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কোনো প্রতিক্রিয়াশীলেরই নেই।

"মন ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তাই অনাগত দিনের দুর্বহ ভয়াবহতাকে নিকটতর করে পাবার কামনা করছি।'

॥ খ ॥ 'লীলা রায় তাঁর 'A challenging Decade' গ্রন্থে সোমেন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

The tragic death in last March of Somen Chanda, a promising young Leftist writer, has aroused indignation and regret in literary circles here. Only twenty-one years old, Chanda was assassinated while leading railway workers belonging to a union of which he was the organiser to attend an anti-Fascist meeting at Dacca. Writers united to issue a manifesto expressing their horror and grief at the manner of his death and protested against conditions which made it possible. Pramatha Chaudhuri headed the list of distinguished signatories. Leftist writers held a conference in Calcutta at which they sought to consolidate anti-Fascist forces and a book of poems dedicated to the memory of their colleague resulted. Amiya Chakravarty, Buddhadeva Bose, Bishnu Dey, Samar Sen and Subhas Mukherjee are among the contributors. The book takes its name 'Prachir' (The Barricade) from the spirited chorus of the opening poem by Amiya Chakravarty :—

We build barricades !
Let the spirit's sword
Stay the destroyers !
Take up the song—
Not a blackshirt shall remain,
no, no !

Bishnu Dey in a short poem called "History" defines the attitude of the young progresssive writer to the tragic times. He writes :—

Forgotten today is the bourgeois virtue of almsgiving,
The luxury of inhaling the deep saltiness of the seaside,

Not ours the cool quiet joy of sunrise of the Himalayas,
Forgotten the armfuls of varied merchandise we bought in shops,
Nowadays ships come and go but seldom.
Though some trade still is carried on by train,
Yet count them on the roads of vast India, in her villages and towns,
—the thousands upon thousands, half-alive, lifting their heads. Hear their call.
We laugh victoriously, disdaining despicable clinging to life.
We know the broken knife is useless, useless weapons,
Yet we know that with these Dadhichi's bones, these broken arms,
We will cut a page of history today and inscribe our triumphs there.

Last month the Parichaya magazine published a posthumous story of Somen Chanda named "Mice". A departure from the conventional form of the short story, it shows imagination and originality. Autobiographical in character. the story describes how a young boy, growing up in an impoverished middle-class family, develops into an organiser of labour. Incidental ancedotes of mice and men are interstingly told. Chanda describes his vision as follows :—

On one such day I fell terribly in love with a languorous noon. It will not be enough merely to tell you how good that noonday was to me. As much as I could see of the sky was so deep a blue that it seemed someone had rubbed cold water on my eyes. Pacing up and down in the realm of thought I reached the limits of my conceptions that noon, and placed there my deep faith. Moistening my eyes with the blueness of the sky, I beheld broad streets lined on both sides with spacious, in buildings, in every room of which walked the feet of strong and healthy people and on whose stairs sounded the tread of many kinds of shoes. The voices of men and women mingled together, strong breaths knocking at strong doors on the roads of the words, strong people

giving birth........I saw a forest of electric and telegraph wires and tractors crossing field after field, breaking and crumbling the endless land, golden crops singing for joy—an unparalleled music rising from the humming of machines and the happy shouting of men. The breeze which was wont to taunt men of clay with such loud and sardonic laughter applauds them now, clapping the leaves of the trees. Does any one hear? My greetings to those who do.

. ...Further revealing a remarkable talent comes a small volume of short stories, Premonition (Sanketa), almost all that remains to us of the young Communist writer, Somen Chanda, assassinated in March 1942. He had an extraordinary purity of mind and an unblushing eye for beauty. Several of the stories are romantic in the very best sense of that much abused word. "The Riot" gives an intimate picture of Dacca at the time of the communal trouble. The elder brother is a Communist, the younger a communalist. Their bickering, the failure of their father to return before the curfew on pay-day, the stealthy search for a telephone, inquiries that confirm their fears, all combine to convey perfectly the atmosphere of dangerous tension. In "Premonition" an unsuspecting village weaver is signed on as a blackleg labourer in a mill. His village, the journey by launch, the crowds of strikers, picketing, speeches, firing and the manager are all shown to us through his eyes. Humble members of the "masses," Somen Chanda's characters come alive in their own right and are as individual and as full of conflict as human beings generally are. With his openhearted love of life he has been able to draw them entire with a tenderness as rare as it is beautifying. He is more than a politician here, he is an artist.

গ। সোমেনের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৪৯) সম্পাদকীয়তে লেখেন:

"ঢাকায় তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর হত্যার সংবাদে বাংলার মনীষী মহলে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে তা একান্তই সঙ্গত। প্রথমতঃ, সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে পূর্ব সংকল্প ছিল এবং এর নিছক নৃশংসতাও অকথ্য।

দ্বিতীয়তঃ, নামহীন আততায়ীর রক্তাক্ত ছুরিকায় আঘাতে যিনি প্রাণ হারালেন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ প্রগতিশীল সাহিত্যিক, তার উপর গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কর্মী। ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ থেকে প্রচারিত ক্রান্তি বইটিতে তাঁর রচনায় সাহিত্যের স্বাদ ছিল এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় মঞ্জুরিত হতে পারলে নানা দিক দিয়েই তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনে আপন স্বাক্ষর এঁকে দিতে পারতেন। এই হত্যার সংবাদে মর্মাহত হন নি, সাহিত্যিক ও ছাত্র সমাজে এমন কেউ যে নেই তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তাঁরা শুধু অকালে বিনষ্ট জীবনটির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, যে জঘন্য মনোভাব এই হত্যার জন্য দায়ী তারও তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তারপর সম্প্রতি ছাত্র সমাজ একই সঙ্গে নিহতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও হত্যাকারীর প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীর' নামক কবিতার সংগ্রহটি সোমেন চন্দের স্মৃতিতে উৎসর্গ করে। এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অত্যন্ত শোভন হয়েছে, কারণ প্রাচীর বইটিতে বাংলার অনেক কবি তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যে মনোভাব সংস্কৃতি ও প্রগতির শত্রু। আমরা আশা করি ঢাকা থেকে সোমেন চন্দের বন্ধুরা তাঁর সম্বন্ধে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করবেন, তাতে তাঁর নিজের কিছু কিছু রচনাও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে বন্ধুদের প্রীতিতর্পণ সংগৃহীত হতে পারে। বইটি আকারে যদি ক্ষুদ্র হয় তবু আজকের দিনে তার মূল্য হবে প্রচুর।"

পরিশিষ্ট-২

॥ ক ॥ সোমেন চন্দ : পটভূমি ঢাকা

সোমেন চন্দের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় জানতে হলে চল্লিশের দশকের ঢাকায় কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সমকালের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট কর্মী জ্ঞান চক্রবর্তী মহাশয় চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল :

১৯৪০ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্যদের সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঢাকার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই সংগঠনে যোগ দেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সোমেন চন্দ ইহার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সোমেন চন্দ সেই সময়েই তখনকার সাহিত্যিক মহলে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং গভীরভাবে মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে সাধারণের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইতে না পারিলে কোন সত্যিকার প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্য নিয়া তিনি ১৯৩৯ সালে রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কাজ করিতে থাকেন। এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিকদের অতি আপনার জন হইয়া দাঁড়ান। নূতন সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সামনে রাখিয়া তাঁহার অতি প্রিয় লেখার মত কাজটিও তিনি সেই সময়ে বন্ধ রাখেন। ১৯৪১ সালে সোমেন চন্দ সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘ ও রেলওয়ে ইউনিয়নের কষ্টসাধ্য কাজ তাঁহাকে চালাইয়া যাইতে হয়। সেই সময়ে ঢাকা হইতে পরিচালিত রেলওয়ে ইউনিয়নের কাজও বেশ বিস্তৃত ছিল; একদিকে বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত ও অপরদিকে ভৈরব পর্যন্ত।

সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধের সময়ে সরকারের প্রবল দমননীতি সত্ত্বেও সংগঠনের অবস্থা পূর্বের চেয়ে কিছুটা পাকা-পোক্ত হয়। বিভিন্ন জায়গায় পার্টি সেলগুলি গঠিত হইতে থাকে। পার্টি সভ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। পার্টি সভ্যদের মাসিক চাঁদা তখন ছিল চারি আনা, ইহা ছাড়া প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে পার্টি তহবিলে মাসিক এক টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইত, অনেকে ইহার বেশীও দিতেন। ইহা ছাড়াও বাহিরে সমর্থকদের ভিতর হইতেও কিছু কিছু চাঁদা তোলা হইত। ইহাতে পার্টির নিয়মিত আয় কিছুটা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তখনও সর্বক্ষণের কর্মীদের নিয়মিত কোন ভাতার ব্যবস্থা ছিল না। যার যার খরচ নিজেদের তুলিয়া নিতে হইত, তবে তখন খরচের পরিমাণ কম ছিল। বাড়ী ভাড়ার খরচ প্রায় ছিলই না। মাঝে মাঝে দু একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হইত, কিন্তু তাহা রক্ষা করার মত সাংগঠনিক অবস্থা তখন না থাকতে বেশী দিন ব্যবহার করা যাইত না। স্থায়ী আশ্রয় খুবই কম ছিল। গোপন কমরেডরা বেশীর ভাগই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকিতেন। ইহাতে প্রায়ই তাহাদের খাওয়া খরচ লাগিত না। খাওয়া খরচ তখন জনপ্রতি মাসিক তিন টাকার বেশী ছিল না। পার্টি তহবিলে যাহা আয় হইত তাহার বেশীর ভাগই খরচ হইত গোপন প্রচারের ব্যাপারে। প্রচার ছাড়া তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিম্বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন বড় রকম গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪০ সালে জিলা কমিটির সভ্যরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে যে জিলা কমিটি গঠিত হয়, '৪২ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত সেই জিলা কমিটিই কাজ চালাইয়া যায়, তবে ইহার সভাগুলিতে আগের যে সমস্ত জিলা কমিটির সভ্যদের উপস্থিত থাকা সম্ভব তাহাদেরও ডাকা হইত। জিলা সম্পাদক নিরঞ্জন গুপ্ত যদিও বয়সে অত্যন্ত তরুণ ছিলেন এবং সবেমাত্র তাঁহার ছাত্র জীবন শেষ হইয়াছিল তবুও সাংগঠনিক বিষয়ে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দেন। বয়সে অত্যন্ত তরুণদের নিয়া গঠিত এই জিলা কমিটিও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জিলা পার্টির অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখেন।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা শহরে এবং রায়পুর থানায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সমস্ত জিলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে। ঢাকা শহরের দাঙ্গায় যথেষ্ট-সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়। বিভিন্ন এলাকায় দিনের পর দিন সান্ধ্য-আইন

চলিতে থাকে। ইহার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পার্টির কাজকর্ম যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়, ঢাকা শহরে পোষ্টারিং ও ইস্তাহার মারফৎ ব্যাপক দাঙ্গা বিরোধী প্রচার চালান হয়। অনেক জায়গায় আমাদের কমরেডরা দাঙ্গাকারী জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও সাক্ষাৎভাবে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন। সেই সময়ে আমাদের বড় একটা অসুবিধা ছিল যে, আমাদের প্রায় সমস্ত কমরেডই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু দাঙ্গার বিরুদ্ধে এই সমস্ত কর্মীদের সাহসিকতাপূর্ণ হস্তক্ষেপের ফলে মুসলমান জন-সাধারণের ভিতরে আমাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বেশ কিছু সংযোগও সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে মুসলমান জনসাধারণ আমাদের পার্টিকে হিন্দু রাজনৈতিক দলগুলির একটি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দাঙ্গায় আমাদের মনোভাব ও কার্যকলাপ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে থাকেন যে, হিন্দু হইলেও পার্টির কর্মীরা মুসলমান বিদ্বেষী নয়।

রায়পুরা দাঙ্গার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার নবাব বাড়ীর একটি অংশ দ্বারা এই দাঙ্গা সংগঠিত হয়! রায়পুরায় মুসলমানরা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনসংখ্যার প্রায় ৭৫-৮০ ভাগ হইবে। এইখানে হিন্দুদের ভিতরে বহুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী এবং সুদখোর মহাজন ছিল। তাহারা অতীতে নানা কৌশলে ব্যাপকসংখ্যক মুসলমান কৃষকের জমি হস্তগত করিয়া তাহাদের অনেককে নিঃস্বতে পরিণত করিয়াছিল। ইহার ফলে এই অঞ্চলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একটা তীব্র মহাজনবিরোধী মনোভাব ছিল। ঢাকা শহরের দাঙ্গার ফলে সমগ্র জিলায় যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তখন মুসলীম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবাব বাড়ীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি প্রচার চালাইতে আরম্ভ করে যে, হিন্দুদের এখান হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে তাহাদের জায়গা জমি ফিরিয়া পাইবে। এই প্রচার স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে দারুণ প্ররোচনার কাজ করে এবং থানার বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা দলবদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। আতঙ্কিত হইয়া স্থানীয় হিন্দুরা হাজারে হাজারে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কিছু সংখ্যক আবার মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এই পলায়নপর হিন্দুরা প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করিয়া সমগ্র জিলাগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং সত্যি মিথ্যা মিলাইয়া

দাঙ্গার ভয়াবহ বিবরণ প্রচার করিতে থাকে। রায়পুরা দাঙ্গার একটি বৈশিষ্ট ছিল যে এখানে প্রায় একশত গ্রামের কয়েক হাজার বাড়ী পোড়া গিয়াছে, কিন্তু একজনও নিহত হয় নাই। একজন মাত্র বৃদ্ধ পঙ্গু সময়মত ঘর ত্যাগ করিতে না পারার ফলে আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। রায়পুরা দাঙ্গার বিবরণ সমস্ত ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলিতে ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় এবং তাহার ফলে একমাত্র ঢাকা জিলা কিংবা বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সরকার কয়েকদিন এই অবস্থা চলিতে দিয়া পরে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের জনমত এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা রায়পুরার ঘটনা স্বচক্ষে দেখার জন্য সেখানে যান। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে রায়পুরায় আসেন।

অন্যদিকে রায়পুরার সংলগ্ন নরসিংদি, মাধবদি, প্রভৃতি জায়গায় হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠে। রায়পুর হইতে বহু হিন্দু পালাইয়া এই অঞ্চলে আসে। রায়পুরাতে তখন আমাদের পার্টি সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল ছিল, কিন্তু নরসিংদি ও মাধবদিতে পার্টির বেশ শক্তি ছিল। এই দুই জায়গায় বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী কমরেডও ছিলেন। নরসিংদি ও মাধবদিতে হিন্দুরা রায়পুরার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে। এই দুই জায়গায় সংখ্যার দিক দিয়া যেমন তাহারা বেশী তেমনই সংগঠিত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। আমাদের পার্টির বিশেষ করিয়া উপরোক্ত দুই জায়গার কমরেডদের প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায় সেখানে দাঙ্গার বিস্তৃতি রোধ করা এবং রায়পুরাতে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য ও সেখানে হিন্দুদের দুর্দশা লাঘব করিবার জন্য ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রেরণ করা। আমাদের কমরেডদের আন্তরিক ও প্রাণপণ চেষ্টার ফলে নরসিংদি ও মাধবদিতে দাঙ্গার বিস্তৃতি রোধ করা সম্ভব হয় এবং জিলার বিভিন্ন জায়গা হইতে, বিশেষ করিয়া মাধবদি ও নরসিংদি হইতে বেশ একটা বড় ভলান্টিয়ার দল রায়-পুরাতে পাঠান হয়। এই ভলান্টিয়ার দল সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া কাজ করেন।

এদিকে কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সরকার দাঙ্গা দমনের অজুহাতে রায়পুরাতে গুর্খা ফৌজ পাঠান। এই গুর্খা বাহিনী সেখানে গিয়া মুসলমান জনসাধারণের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালায় এবং শত শতকে গ্রেপ্তার

করিয়া জেলে প্রেরণ করিতে থাকে। গুর্খা বাহিনী শত শত মুসলমানের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে তাহারা অনেকে আতঙ্কিত হইয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। এই অবস্থায় ঢাকার নবাব বাড়ী হইতে যাহারা দাঙ্গার উস্কানি দিয়াছিল তাহাদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

রিলিফের কাজের জন্য আমরা ছাড়াও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু হিন্দু ভলান্টিয়ার সেখানে কাজ করিতে আসে, তাহাদের মধ্যে অনেক সাম্প্রদায়ীকতাবাদীও ছিল। তাহারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে গুর্খা বাহিনীর কাজে সমর্থন দিতে থাকে। এই অবস্থায় আমাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। পার্টির ভলান্টিয়ারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্যদের হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সমস্ত লালঝাণ্ডা ব্যবহার করিতেন। একদিকে তাঁহারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে কাজ করিতেন, সেই রকম অপরদিকে মুসলমানদের উপরে যেখানে নির্যাতন হইত সাহসের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেন এবং গুর্খাদের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন সেই জায়গায় আসেন তখন আমাদের পার্টিও ভলান্টিয়ারদের তরফ হইতে তাঁহার নিকট একটি প্রতিনিধিদল গুর্খা সৈন্যদের অত্যাচারের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদেরও সাহায্য করার কথা জোর দিয়া বলেন। ইহার ফলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ খোলাখুলিভাবে গুর্খাদের প্রতিবাদ করেন এবং কংগ্রেসের রিলিফ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের মধ্যেও কিছু পরিমাণ বিতরণ করার নীতি গ্রহণ করেন। ইহাতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সাহায্য করার সাথে সাথে সৈন্যদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদেরও সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের বেশ কিছু সুবিধা হয়। এই সমস্ত কাজের ফলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে লাল ঝাণ্ডা ও আমাদের পার্টি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে কিন্তু হিন্দুদের একাংশের নিকট আমাদের বিরাগভাজন হইতে হয়। যাহা হউক আমাদের কাজের ফলে গরীব হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে কিছুটা পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

দাঙ্গার অভিযোগে রায়পুরা হইতে প্রায় ১৫০০ শত মুসলমানকে গ্রেপ্তার

করিয়া ঢাকা জেলে পাঠান হয়। জেলে গিয়াও তাঁহারা বেশ নির্যাতন ভোগ করেন, কারণ জেলের সিপাহী ও কর্মচারীরা তখন প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। তাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব হইতে ইহাদের উপরে নানারকম জোরজুলুম করিত! এই সময়ে জিলা পার্টির দুইজন নেতা কমরেড অনিল মুখার্জি ও জ্ঞান চক্রবর্তী তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে এই গ্রেপ্তারকৃত লোকদের সংলগ্নস্থানেই থাকিতেন। তাঁহারা নানাভাবে প্রতিবাদ করিয়া, সিপাহী জমাদারদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালাইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে ইহাদের উপরে নির্যাতন অনেক পরিমাণে বন্ধ করিতে সক্ষম হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ইহাদের মধ্যে দাঙ্গা বিরোধী ও পার্টি সম্বন্ধে প্রচার চালাইয়া যান। ইহার ফলে তাহারা বেশ দাঙ্গা বিরোধী হইয়া উঠেন ও পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। জেলের ভিতরে ও বাহিরে স্থানীয়ভাবে পার্টি কর্মীদের প্রচেষ্টার ফলে একটা বড় সংখ্যক মুসলমান জনসাধারণের ভিতরে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা পার্টি ও লাল ঝাণ্ডার প্রতি অনুগত হইয়া উঠিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টির তৎকালীন নেতা উকিল নলীন্দ্র সেন বিনা পয়সায় তাহাদের মামলার তদ্বির করিতে থাকেন, অথচ নবাব বাড়ী ও মুসলিম লীগের নেতারা মামলা বাবদ রায়পুরা হইতে বহু টাকা উঠান সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের জন্য কিছুই করে নাই।

রিলিফ কাজের জন্য যে ভলান্টিয়াররা গিয়াছিলেন তাহারা চলিয়া আসার পরেও দলে দলে পার্টি কর্মীরা রায়পুরা যাইতেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করিতেন। ক্রমে ক্রমে জেলে আটক লোকেরা জামিনে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসেন। তখন একটা বড় সমস্যা দাঁড়ায় মামলাগুলি নিয়া। মামলাগুলি চলিতে থাকিলে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া দূর করা সম্ভব নয়। তখন আমাদের চেষ্টা হইয়া দাঁড়ায় মামলাগুলি কি করিয়া উঠাইয়া নেওয়া যায়। কিন্তু এই কাজ প্রথম অবস্থায় প্রায় অসম্ভব মনে হয়। কারণ হিন্দুদের এই দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা কিছুতেই মামলা তুলিয়া নিতে রাজী হইবে না। আর সরকারও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব জিয়াইয়া রাখিতে চাহিবে, কাজেই তাহারাও আইন-শৃঙ্খলার নামে ইহার বিরোধিতা করিবে। আর মামলা চলার সাথে পুলিশ কর্মচারীদের আর্থিক স্বার্থজড়িত, কাজেই তাহারা তো বিরোধিতা

করিবেই। অথচ মামলা তো একটি দুইটি নয়, শত শত। পার্টি কর্মীরা এই অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করিতে লাগিয়া যান। তাহারা দিনের পর দিন হিন্দু জনসাধারণকে বুঝাইতে থাকেন যে, এই অঞ্চলে তাহারা সংখ্যায় খুবই কম কাজেই তাহাদের শান্তিতে বসবাস করিতে হইলে মুসলমানদের সাথে বন্ধুভাবে মিলিয়া মিশিয়াই চলিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া চলা সম্ভব নয়। মামলা চলিতে থাকিলে এই শত্রুতা বন্ধ হইবে না, অপর দিকে আমাদের কর্মীরা মুসলমানদের বুঝাইতে থাকেন যে, দাঙ্গায় যে শুধু বিদেশী শাসকরা এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা লাভবান হয় এবং তাহাদের পক্ষে দাঙ্গা কতখানি ক্ষতিকর তাহা তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছেন। দাঙ্গার ফলে তাহারা বহু টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, জেল খাটিয়াছেন এবং মামলা চলিতে থাকিলে তাহাদের আরও কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। আর যাহারা দাঙ্গার উস্কানি দিয়াছিল তাহারা আর এই বিপদের দিনে কোন রকম সাহায্য করিতেছে না। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ লাগিয়া থাকিলে চিরদিনই এইরূপ হইবার আশঙ্কা থাকিবে। এই অবস্থায় তাহাদের উচিত হিন্দুদের নিকটে গিয়া তাহাদের অন্যায় স্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন দাঙ্গার পথে তাহারা যাইবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার ভাব ফিরাইয়া আনা। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ হইতে প্রবল বাধা আসিতে থাকে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমাদের দীর্ঘ, ধৈর্য্যশীল ও আন্তরিক চেষ্টার ফল ধীরে ধীরে ফলিতে থাকে। প্রথমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রচার করিয়া পরে তাহাদের নিয়া একত্রে বৈঠক করিয়া স্থানীয়ভাবে সদ্ভাব ফিরাইয়া আনার চেষ্টা শুরু হয়। স্থানীয় কয়েকজনও এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রদেশে সেই সময়ে জনাব ফজলুল হক ও শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মিলিতভাবে মন্ত্রীত্ব গঠন করেন। তাঁহাদের তরফ হইতে এই ব্যাপারে তখন সাহায্য পাওয়া যায়, তাঁহারা একবার এই বিষয় নিয়া আলোচনা করিবার জন্য রায়পুরাতে আসেন। মাসের পর মাস চেষ্টার পরে প্রায় ৫,০০০ প্রতিনিধি-স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানের স্বাক্ষরিত একটি গণ-দরখাস্তের মাধ্যমে মামলা উঠাইয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। পরে মন্ত্রীদের প্রচেষ্টায় এই মামলা উঠান সম্ভব হয়।

রায়পুরাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করিবার জন্য কমরেডরা যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন তাহা ঢাকা জিলার পার্টির কাজের একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। একদিকে স্থানীয় উদ্যোগ ও অপরদিকে পার্টির সমস্ত শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই ধরণের একটি কঠিন কাজকে সমাধা করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪১ সালের পরে রায়পুরাতে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে নাই। আর এই প্রচেষ্টার ফলেই রায়পুরাতে পার্টি ও কৃষক সমিতি শক্তিশালী হয়।

যুদ্ধের ফলে দেশে সামগ্রিকভাবে কি ধরনের রাজনৈতিক মনোভাব গড়িয়া উঠে এখানে তাহার কিছুটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিল এবং ইহার ফলে ইউরোপে ফ্যাসিজমের উদ্ভবের পর হইতে খোলাখুলিভাবে তাহারা ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। পররাজ্য আক্রমণকেও তাহারা সাধারণভাবে নিন্দা করিয়াছে, জাপান কর্তৃক চীনকে আক্রমণের সময় তাহারা চীনকে সমর্থন করিয়াছে, ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ করিবার সময় তাহারা ইটালীকে নিন্দা করিয়াছে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তাহারা সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন জানাইয়াছে এবং জার্মানীর ফ্যাসিস্ট নাৎসীবাদকে তাহারা পরিষ্কারভাবেই নিন্দা করিয়াছে। কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় চীনে সংগ্রামরত জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য একটি মেডিকেল মিশন প্রেরিত হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক ভারতীয়, স্পেনের ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠিত হয়, তাহাতে যোগ দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু নিজে গিয়া মাদ্রিদ ফ্রন্টে সংগ্রামরত আন্তর্জাতিক বিগ্রেডকে উৎসাহ দান করেন।

ইহা সত্ত্বেও ভারতের ব্যাপক স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ হিটলার ও মুসোলিনীকে আবার বীর হিসাবেও দেখিতেন। ব্রিটিশের যে কোন বিপদকে তাঁহারা সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন এবং যাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করিত তাহাদেরই বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। সংকীর্ণ জাতীয় চেতনা ও স্বার্থবোধের মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ থাকিত, আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের চেতনা ছিল খুবই কম। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইউরোপে হিটলার বাহিনী একের পর এক জয়লাভ

করিতে থাকে এবং তাহাদের হাতে বৃটিশ বাহিনী নানাভাবে পর্যুদস্ত হয়। ইংরেজদের এই অবস্থায় ভারতীয়রা সাধারণভাবে আনন্দিত হয় এবং হিটলারী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর উপরে আরও বেশী করিয়া শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠে, অপর দিকে জাপানী ফ্যাসিস্ট বাহিনী প্রাচ্যে বৃটিশ, ফরাসী, আমেরিকান, ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির উপরে আক্রমণ চালাইয়া সেগুলি পর পর দখল করিয়া নিতে থাকে। ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিশেষ করিয়া ব্রিটিশের এই পরাজয়ের ফলে দেশবাসী খুবই আনন্দিত হয় এবং জাপানের শক্তির উপরে তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়; স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর শত্রু ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের প্রতি ব্যাপকভাবে বন্ধু মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় স্বগৃহে অন্তরীনাবদ্ধ সুভাষ বসু পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়া দেশ হইতে পলাইয়া যান এবং জার্মানী ও জাপানের সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহার ফলে দেশের সংগ্রামী ও বামপন্থী জনসাধারণের মধ্যে বসুর জনপ্রিয়তা অসম্ভব বাড়িয়া যায়। সুভাষ বসুর এই কাজের ফলে দেশবাসীর মধ্যে জার্মানী ও জাপানের উপরে বিশ্বাস ও তাহাদের উপরে নির্ভরতা আরও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের শুরু হইতে ভারতের দেশ-প্রেমিকদের একটি বড় অংশ দুনিয়ার স্বাধীনতার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু মনে করিয়া এক ভুল ও ক্ষতিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ফলে পদে পদে তাহারা ভুল পথ অনুসরণ করিতে থাকে এবং এমন সমস্ত কাজে লিপ্ত হয় যাহা ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির পক্ষে সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্টদের এই ভ্রান্ত পথের মোকাবিলা করিতে হয়।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সমস্ত বিশ্ব রাজনীতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া '৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশকে পদানত করিয়া এবং ইংলণ্ডকে নিজ দ্বীপের মধ্যে একেবারে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া জুন মাসের ২২ তারিখ হিটলার বাহিনী সোভিয়েট আক্রমণ করিয়া বসে। নিজ দেশের বিরাট রণ-সম্ভার ও সৈন্যবাহিনী ছাড়াও ইউরোপের সকল পদানত দেশগুলির সমস্ত রকম সামরিক শক্তিকে হিটলার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। হিটলারের তড়িৎ গতিতে পর পর চমকপ্রদ বিজয় দেখিয়া সমস্ত বিশ্বের ধারনা জন্মে যে সোভিয়েটের পরাজয় মাত্র সময়ের প্রশ্ন। একমাত্র কমিউনিস্টরা

ছাড়া পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রনায়ক ও সমরবিদরা ইহাই বিশ্বাস করে যে হিটলারী আক্রমণের সামনে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর কোন রকমেই দুই মাসের বেশী টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, কারণ হিটলারের রণ-সম্ভার সেই সময়ে সোভিয়েটের চতুর্গুণ এবং সৈন্যবাহিনীও অনেকগুলি যুদ্ধের ভিতর দিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন।

যুদ্ধের ঠিক তিনদিন পরে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র হিসাবে ষ্ট্যালিন সমস্ত বিশ্ববাসীর নিকট ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধে সোভিয়েট জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলারের পরাজয় অনিবার্য, কারণ পৃথিবীর সমস্ত সৎপ্রকৃতির ও স্বাধীনতাকামী জনগণের সমর্থন সোভিয়েটের পিছনে রহিয়াছে। সেই সময়ে কমিউনিস্টরা ছাড়া আর সকলেই ষ্ট্যালিনের ঘোষণাকে জনসাধারণের মনোবল রক্ষার জন্য মামুলী প্রচার অথবা বাড়তি কথা ছাড়া আর কিছু মনে করিতেন না। কিন্তু সোভিয়েটকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাসহ বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মোর্চা গঠনের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় এবং ইহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী মৈত্রী গঠিত হয়। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই মৈত্রী দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামীদের নিকট এক অপূর্ব সুযোগ আনিয়া দেয়। কিছুদিন পূর্বেও যাহা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সামাজিক স্বার্থ রক্ষার যুদ্ধ তাহাই পরিণত হয় সমস্ত বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামীদের জনযুদ্ধে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী সমস্ত দেশ, বিশেষ করিয়া ফ্যাসিস্টদের দ্বারা পদানত দেশের জনগণ এই মৈত্রী জোটের পিছনে সমবেত হইতে থাকে। ফ্যাসিজমের পরাজয়ের ভিতর দিয়াই যে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার পথ সুগম হইতে পারে এই ধারণা বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে।

আক্রমণের প্রথম কয়েক মাস সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর হাতে অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি এড়াইবার জন্য প্রতিরোধ করিতে করিতে কৌশলগত পশ্চাৎ-অপসরণের নীতি গ্রহণ করে। পশ্চাৎ-অপসরণের সময়ও সোভিয়েট বাহিনী হিটলারী দস্যুদের বিরাট ক্ষতি সাধন করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত '৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর প্রান্তে হিটলার বাহিনীকে প্রতিহত করা হয় এবং শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। ১৯৩৯ সালে

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম হিটলার বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং তাহাকে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। হিটলারের ছয় সপ্তাহে রুশ জয়ের সমস্ত রঙীন কল্পনা শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। সোভিয়েটের শক্তি শৌর্য ও সংগঠন প্রতিভা সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে চমক লাগাইয়া দেয়, ফ্যাসিস্ট পদানত দেশগুলির জনগণ নিজেদের মুক্তির নূতন সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া তাহাদের সংগ্রামকে আরও জোরদার করিতে আরম্ভ করে। বিভিন্নমুখী আক্রমণের আঘাতে শুরু হয় দুনিয়াব্যাপী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়ের সূচনা। ১৯৪১-এর ২২শে জুনের পরই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ফ্যাসিস্ট বিরোধী এই জনযুদ্ধে সোভিয়েটের নেতৃত্বে গঠিত মৈত্রী জোটকে সমর্থন জানাইতে আরম্ভ করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে পিষ্ট পরাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই যুদ্ধের প্রকৃত রূপ বুঝিতে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য নির্ধারণ করিতে কয়েক মাস সময় লাগিয়া যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও কিছুদিনের মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধে মৈত্রী জোটকে সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের পরে ভারতের কমিউনিস্টদের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, কারণ ভারতের শক্তিশালী জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ করিয়া বামপন্থীরা এই যুদ্ধকে সঠিক অনুধাবন করিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল হিটলারী আক্রমণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্যুদস্ত হইলে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হইবে। কিন্তু মৈত্রী জোট গঠন হওয়ার ফলে তাহারা ভাবিতে আরম্ভ করিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার পূর্বপ্রতাপ ফিরিয়া পাইবে। কংগ্রেস কর্তৃক ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করিয়া এই মৈত্রী জোটকে সমর্থন করাকে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন বলিয়া ধরিয়া নিল। কংগ্রেস বরাবর ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে এবং হিটলারের বিরুদ্ধে মৈত্রী জোটকেও তাহারা নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছে, কিন্তু মৈত্রী জোটের জয় যে দুনিয়াব্যাপী গণ-শক্তির প্রসার ঘটাইবে এবং ভারতের স্বাধীনতাকেও ত্বরান্বিত করিবে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দুনিয়াব্যাপী ফাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে ভারতবাসীরা যাহাতে ঠিকমত অংশগ্রহণ করিতে পারে এজন্য কংগ্রেস যুদ্ধের সময়ই ভারতবাসীরা হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করে, কারণ তাহারা মনে করে যে, পরাধীন ভারতের পক্ষে এই যুদ্ধকে

সমর্থন করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের দাবী অযৌক্তিক বা অযোগ্য ছিল না, কিন্তু যে জনযুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর ভারতসহ সমগ্র বিশ্ববাসীর ভবিষ্যত নির্ভরশীল সেই যুদ্ধের সমর্থনের ব্যাপারে অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট এই শর্ত আরোপের মধ্য দিয়া তাহাদের সংকীর্ণ জাতীয় মনোভাবই প্রকাশ পায় এবং ইহার ফলে তাহারা বিশ্বব্যাপী এই মুক্তিসংগ্রামে নিজেরা অংশগ্রহণ করিতে পারে না।

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর হইতে সমস্ত শক্তি দিয়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া আসিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করিবার পথ গ্রহণ করে। কাজেই তাহাদের পক্ষে ব্রিটিশ বিরোধী কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে না। ফ্যাসিস্ট বিরোধী মৈত্রী জোটকে তাহারা সমর্থন জানায়, কিন্তু তাহা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক বলিয়া নয়, তাহারা নিজেরা ব্রিটিশের সহযোগী বলিয়া। ইহা সত্ত্বেও মুসলমান জনসাধারণের বিপুল অংশ ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানাইতে থাকে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, ফ্যাসিজমের পরাজয়ের ভিতর দিয়া বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি জোরদার হইবে এবং পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হইবে। সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিস্টদের মত তাহারা ইহাও মনে করে যে বিশ্ববিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজয়ের উপরেই ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র এবং পরাধীন দেশগুলির মুক্তি অর্জন প্রধানতঃ নির্ভর করিবে। আর সোভিয়েট ইউনিয়নের পরাজয়ের অর্থ হইল সমগ্র মানব জাতির পরাজয়, মানব মুক্তি-সংগ্রাম পিছাইয়া যাওয়া। কাজেই পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামীরই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মৈত্রী জোটকে সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিপুল সামরিক শক্তিকে সোভিয়েটের একক শক্তি দিয়া পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে পরাধীন ভারতের জনসাধারণের পক্ষে এই মুক্তি-যুদ্ধকে সর্বশক্তি দিয়া সাহায্য করা তখনই সম্ভব যখন ভারতের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনগুলি মিলিতভাবে ইহায় দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, কারণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয় জনসাধারণ কোন অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায়

সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিলিত হইতে পারে না। কাজেই জনযুদ্ধ ও মৈত্রী জোটকে সমর্থন ও সাহায্য করার নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পার্টি কংগ্রেস ও লীগের মিলিতভাবে জাতীয় সরকার গঠন করিবার দাবী উপস্থিত করে এবং এই দাবী নিয়া ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলার আবেদন জানায়।

পার্টি এই সময়ে সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধ যে ভারতবাসীসহ সমগ্র বিশ্বেরই মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনভাবে এই প্রচার গড়িয়া তোলে। পার্টির প্রচেষ্টায় সেই সময়ে ঢাকায় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা হয় এবং তাহার মাধ্যমে একটি সুদৃশ্য পোষ্টার প্রদর্শনী ঢাকাসহ জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয়। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির আহ্বানে জিলায় কতকগুলি সভারও অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার এইগুলিকে বরদাস্ত করে না। কয়েকটি সভার উদ্যোক্তা ও বক্তাদের গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকালের জন্য হাজতবাস করান হয়। সোভিয়েটের বইপত্র রাখার অপরাধে মানুষকে জেলে দেওয়া হয়। জনসাধারণের চাপে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী জোটে মিলিত হইতে বাধ্য হইলেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন যে পরাধীন ভারতের জনসাধারণের মনে সোভিয়েটের প্রতি সমর্থনের মনোভাব গড়িয়া উঠাকে কতখানি ভয় করে এই ঘটনাগুলি হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। জিলা-পার্টিকে এই সময়ে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হয়, কারণ জিলার সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেড এই সময়ে হয় জেলে আবদ্ধ, নয়ত তাহাদের আত্মগোপনে থাকিয়া কাজ করিতে হইতেছে। আর বাকী প্রায় সকলকেই নিজ গৃহে অন্তর্ধান করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রচার তখন বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সময়ে পোষ্টার ও ইস্তাহারের মাধ্যমেই প্রধানতঃ প্রচার চালান হইত।

আমাদের এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে জাতীয়তাবাদীরা, বিশেষ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পির মত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে। তাহারা মনে করে যে আমরা এই নীতি গ্রহণ করিয়া আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করিতেছি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি। সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদের কমরেডদের উপরে মারাত্মক আক্রমণ

চালায়। ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে প্রদ্যোৎ সরকার নামে জগন্নাথ কলেজের একজন তরুণ ছাত্র-কমরেড দিনে দুপুরে ছোরার আঘাতে নিহত হয়। এই বৎসর ৮ই মার্চ আমাদের কমরেডদের উদ্যোগে সুত্রাপুরে একটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনী হইতে একদল রেলশ্রমিক তরুণ সাহিত্যিক কমরেড সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে থাকেন। পথে লক্ষীবাজারের নিকট এই শোভাযাত্রাটি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপের কর্মীদের দ্বারা বেলা ৩টায় আক্রান্ত হয়। সোমেনকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সদর রাস্তার উপরে তাহা'র চক্ষু দুইটি খুলিয়া ফেলা হয়, তাহার জিহ্বা বাহির করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। তাহার সর্বশরীরে ছোরার আঘাত করা হয় এবং ভোজালি দিয়া তাহার পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তারপর হত্যাকারীর দল তাহার দেহের উপর দাঁড়াইয়া পৈশাচিক জয়ের আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই আক্রমণের সময় সোমেন চন্দ পলাইতে চেষ্টা না করিয়া বীরের মত লড়িয়াছেন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাহার হাত হইতে লাল ঝাণ্ডাটি কাড়িয়া নেওয়া সম্ভব হয় নাই। অতর্কিত আক্রমণে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। একজন মহান সাহিত্যিক ও শ্রমিক নেতা এই শাহাদাৎ বরণ করিয়া ঢাকা জিলা পার্টির সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করিয়া যান। সোমেন চন্দকে হত্যা করার পর এই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী কর্মীরা লাঠি তরবারী ভোজালী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মেলনস্থান আক্রমণ করে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে তাহারা সম্মেলনমণ্ডপ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। এই অবস্থার মধ্যেও সম্মেলনের কাজ বেশ সুচারু-রূপে আশাতীত সাফল্যের মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয়। এই ঘটনার পরিণতি স্বরূপ আমাদের কমরেডদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং আমাদের বিরোধগুলির মধ্যে এমন তিক্ততা ও ঘৃণার ভাবের উৎপত্তি হয় যাহার ফলে গৃহযুদ্ধের মত দীর্ঘস্থায়ী আন্তঃপার্টি দাঙ্গার আশংকা দেখা দেয়। আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক কমরেডদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সেই সময়ে পার্টি-নেতৃত্ব অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই অবস্থাকে সংযত করেন।

সোমেন চন্দের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের প্রায়

প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে এবং আরও অনেক জায়গায় সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সমস্ত ভাষার প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মন্তব্য, বহুসংখ্যক বিবৃতি, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু এই হত্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে কবিতাটি রচনা করেন তাহা তাঁহার জীবনের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পার্টি কর্মীদের উপরে বামপন্থীদের এই হামলা ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই হামলার ফলে কচি নাগ নামে বার্মাপ্রত্যাগত একজন ছাত্র কমরেড, ১৯৪৪ সালে ঢাকা শহরের রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং নারায়ণগঞ্জের অনেকে মারাত্মকভাবে জখম হন। পার্টি এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও ১৯৪১ সাল এবং '৪২ সালের প্রথমার্ধে পার্টি নূতন নূতন এলাকায় এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং পার্টির কর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য হইতে এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু ১৯৪১ ও '৪২ সালে ঢাকায় দুইটি দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে একমাত্র রেলওয়ে ইউনিয়ন ও ঢাকা কটন শ্রমিক ইউনিয়ন ছাড়া এই শহরের আর কোন শ্রমিক ইউনিয়নকে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয় নাই। '৪২ সালের প্রথমার্ধে ঢাকেশ্বরী মিলে একটি সূতাকল শ্রমিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের ভিতর দিয়া সূতাকলগুলিতে আমাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এবং সংগঠনও পূর্বের চেয়ে মজবুত হয়। এই সময়ে বিক্রমপুরের কুকুটিয়াতে একটি মহকুমা কৃষক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের ভিতর দিয়া মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কৃষক আন্দোলন পূর্বের চেয়ে জোরদার হইয়া উঠে।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেয়। আমাদের জিলার যাহাদের উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, অন্তরীণাদেশ প্রভৃতি ছিল তাহাও কিছু দিনের মধ্যে তুলিয়া নেওয়া হয়। জেল হইতেও কমিউনিস্ট বন্দীরা মুক্তি পান। সমস্ত জায়গায়ই পার্টি আইনসঙ্গত ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করে। নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাইবার পর দিনই ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির নাম বহন করিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। এত বড় শোভাযাত্রা ঢাকাতে বহু

দিন হয় নাই। ঢাকা শহরবাসী পার্টির এই শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হন। তখন যে কোন শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইলে সরকারী অনুমতি নিতে হইত। কিন্তু এই শোভাযাত্রাটি বিনা অনুমতিতেই বাহির করা হয়। ফলে পথে কয়েকবারই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সরকারের সহযোগী বলিয়া জাতীয়তাবাদীরা কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে যে অপবাদ প্রচার করিত তাহা যে কতখানি মিথ্যা এই ঘটনা হইতে তাহারই প্রমাণ জনসাধারণ পায়। আত্মগোপনকারী কমরেডরা যখন তাহাদের নিজ নিজ কাজের জায়গায় উপস্থিত হন তখন তাহাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। বিশেষ করিয়া গোপাল নাগ যখন সূতাকল অঞ্চলে উপস্থিত হন তখন হাজার হাজার শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য আসেন।

॥ খ ॥

[চল্লিশের দশকে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যাবে ঐ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের রচনা থেকে। উল্লেখযোগ্য যে সোমেনের মৃত্যুর পরেই এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।]

১৯৩৯ সনের পূর্বেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণার সূত্রপাত হয়েছিল। ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে যেসব রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের অনেকেই জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকেন এবং জেলের বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবন্ত প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গরিষ্ঠ অংশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। এঁদের মধ্যে যেমন পুরোপুরি কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক লেখক ছিলেন তেমনি অকমিউনিস্ট, সাধারণভাবে মানবতাবাদী বা হিউম্যানিস্ট লেখকও ছিলেন। এইসব লেখকদের সহায়তায় ঢাকায় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ স্থাপিত হয় ১৯৩৯ সনেই। ঐ বছরেই, সকলেরই জানা আছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও নাৎসী জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বাঙালি লেখকরা ভারতের ও পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতোই ফ্যাসিবাদের মারাত্মক আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকদের সহযোগে গঠিত আন্তর্জাতিক বিগ্রেড গঠনের ঘটনাটি বাঙালি শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিত করেছিল। স্পেনে গণতন্ত্রীদের পতন হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা উপলব্ধি করতে পারলেন যে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরো জোরদার ও মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা। প্রধানত সেখানেই লেখকরা সংগঠিতভাবে এই ধরণের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কৃষক সভার মাধ্যমে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্ট ছাড়া ঢাকা জেলার বাইরে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বাক্ষর তেমন পাওয়া যায় না। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত এবং কালীপ্রসন্ন দাশ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'বলাকা' পত্রিকাটি প্রগতি সাহিত্যের ভাবধারাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। বলা বাহুল্য, ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে তৎকালীন বাঙালি লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোড়ার দিকে ছিল পুরোপুরি একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; বৃটেনের এই যুদ্ধে হার হলে ভারত তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়ে যাবে এই মনোভাব থেকে অনেকেই নাৎসী জার্মানির আপাত সাফল্যকে খুবই উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানাতে শুরু করেছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের অমানুষিক দমন-পীড়ন এই মনোভাবকে আরো দৃঢ় হতে সাহায্য করে।

১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনী তার সমস্ত শক্তিতে সোভিয়েত দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যুদ্ধের আগুন অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে সমস্ত ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কেও নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘের একটি বর্ধিতায়তন সভায় সারা পৃথিবীর সমাজতন্ত্রের তৎকালীন একমাত্র প্রাণকেন্দ্রের সপক্ষে, ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবাজদের হঠকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার সিদ্ধান্তই প্রগতি লেখকেরা গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্যেই হিটলারের জঙ্গী বাহিনীকে পরাজিত করা দরকার এ কথাটা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে প্রগতি লেখকেরা বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও যুবদের সভা সংগঠিত করতে শুরু করেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা, রাজশাহী, মুন্সীগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থানে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন রূপ পেতে থাকে।

চল্লিশ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারের বর্বর বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবার অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা শহরে সংগঠিত হয়েছিল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি। এই সমিতির তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবার জন্যে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকটে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে একটি সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকারের প্রায় 'শ খানেক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। লক্ষ্য করা গেল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্র প্রদর্শনী গৃহে অজস্র লোকের সমাবেশ। অধ্যাপক, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র প্রদর্শনী দেখতে ভীড় করেছিলেন। হল ঘরের প্রবেশপথে একটি টেবিলের ওপর ন্যস্ত খাতায় ফিরে যাবার সময় অনেক দর্শকই তাঁদের মন্তব্যও লিখে রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে পড়ে সেই প্রিয়দর্শিনী কাজলরেখা সেনগুপ্তার কথা যিনি জানিয়েছিলেন এ রকম একটা অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আগে আর হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েট মেলা'। তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ছিলেন এই প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে প্রাণবান ও উৎসাহী। প্রদর্শনী গৃহে দিনের পর দিন ভীড় বেড়েই চলেছিল অথচ চিত্র-গুলোর পটভূমি ও তাৎপর্য দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞ স্বেচ্ছা-সেবক বা সাংস্কৃতিক কর্মীর সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। সোমেন ছিলেন চিত্র-ব্যাখ্যা এবং দেখা গেল যেখানেই সোমেন ছবি সম্পর্কে কিছু বলছেন সেখানেই দর্শকরা এসে জড়ো হচ্ছেন, ভীড় বাড়ছে। ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সোভিয়েত চিত্র প্রদর্শনীর অসামান্য সাফল্যের পর ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

স্থির হয়েছিল সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ এই সভায় যোগদানের পথে সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে খুন হন। বাঙলাদেশ থেকে অক্টোবর ১৯৭৩-এ

প্রকাশিত 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' বইটির ভূমিকায় এই ঘটনা সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন : "...এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছুসংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এইখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্ত কর্মী ও শিল্পী জীবনের।..."

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরবর্তী বছরেই আন্তর্জাতিক সংকট তীব্রতর হয়ে পড়ে। ইয়োরোপে লালফৌজ নাৎসী শক্তির প্রতিরোধে তখন অবিরাম রক্ত ঢেলে চলেছে, পূর্ব-এশিয়ায় ক্ষমতাগর্বী জাপান সিঙ্গাপুর বর্মা মালয় পর্যন্ত নিজের সামরিক শক্তির প্রসার ঘটিয়াছে। বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিদেশী শাসক আপদকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো জনসাধারণের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধের মনোভাব জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত করতে হলে জনসাধারণকে অন্তত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই সাদামাটা সত্য কথাটি রক্তচক্ষু বিদেশী শক্তি উপলব্ধি না করতে পারায় দিনের পর দিন নতুন নতুন সংকট আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক কর্মী এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিট ও কৃষক সভার শাখাগুলোর মাধ্যমে সে-সময় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট চেহারা নিতে থাকে, কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের আন্দোলন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করেই জোরদার হয়ে উঠেছিল। এর কারণ চল্লিশ দশকের শুরুতেই এই শহরে প্রগতি লেখক সংঘ বেশ সক্রিয় ছিল এবং ইতিপূর্বেই সংঘের নবীন লেখকেরা 'ক্রান্তি' নামের একটি সংকলন প্রকাশ করে নিজেদের

সংঘশক্তির পরিচয় রেখেছিলেন। সোমেনের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপাত্ররূপে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর সম্পাদনায় 'প্রতিরোধ' পাক্ষিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯। এই সময় সত্যেন সেন, অজিতকুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সর্দার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নরুদ্দিন, রণেন মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক 'প্রতিরোধ' প্রকাশের ব্যাপারে নানা দায়িত্ব গ্রহণ করে এই পত্রিকার প্রকাশ অন্তত কয়েকটি বছর অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছিলেন। এখানে 'প্রতিরোধ' সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সেটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে তখন বোঝা গেল সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে হলে কিছু সময়োচিত গণসঙ্গীত রচনা করা দরকার। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যেমন এখন, তেমনি তখনকার দুর্যোগপূর্ণ সময়েও ছিলেন মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু গণসঙ্গীতের প্রবর্তনও দরকার হয়ে পড়েছিল। মনে পড়ছে, এই সময় এগিয়ে এসেছিলেন একজন তরুণ, সাধন দাশগুপ্ত। তিনি নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। মাত্র দু চার জন সঙ্গী নিয়ে তিনি সে সময় পূর্ববঙ্গের নানা সভায় লোকসঙ্গীতের সুরে নানা গান পরিবেশন করেন। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে ফ্যাসিস্টবিরোধী ও স্বদেশপ্রেম-অনুরণিত এই গানগুলি একসময় খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। লোকসঙ্গীতের সুরে তিনি শহীদ সোমেন চন্দকে নিয়ে স্মরণীয় একটি গান লিখেছিলেন। এছাড়া ঢাকায় মুসলিম ওস্তাদদের ছাদ-পিটানো গানের সুরের অনুসংগে তাঁর 'দে দে ষ্ট্যালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে, আর্ব হিটলার মরি লাজেতে' গানটি সে-সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্যেন সেন এই সময়ই তাঁর গণসঙ্গীতগুলি লেখা শুরু করেছিলেন।

সমগ্র বাঙলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়', 'অগ্রণী' এবং 'অরণি' পত্রিকার ভূমিকা এ সময়ে সুস্থ চিন্তার সহায়ক ছিল। এছাড়া ছিল হাওড়া থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র 'অভিবাদন' এবং ঢাকার 'প্রতিরোধ'। ১৩৪৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রতিরোধ'-এর শারদীয় সংখ্যাটি। এই সংখ্যায় ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পসুষমাযুক্ত কয়েকটি কবিতা

ছাপা হয়েছিল, সম্পূর্ণ আলাদা করে তাদের উল্লেখ অনিবার্য। কবিতাগুলো লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ ('শ্বাপদ') জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ('স্লিট ট্রেনচ'), মনীন্দ্র রায় ('স্বর্যের মুক্তি'), সমর সেন ('দুর্দিন'), এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ('স্টালিনগ্রাদ')। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ঐ বছরেই শারদীয় 'অভিবাদন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর ফ্যাসিস্টবিরোধী দীর্ঘ কবিতা: 'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্বে'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রয়েছে এই কবিতাগুলো, একথা এই তিরিশ বছর পরেও জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।

দুর্ভিক্ষের বছরে ঢাকা শহরে নতুন করে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব হিন্দু-মুসলিম তরুণ ছাত্র ও লেখক একাত্ম হয়েছিলেন এবার তাঁরাই বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেন দাঙ্গার ক্ষয়কারী আবহাওয়াকে প্রতিরোধ করার জন্যে। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১লা শ্রাবণ ১৩৪৯-এর 'নানাপ্রসঙ্গে' লেখা হয়েছিল: "...যারা সম্প্রদায় ছাড়া সমাজের বড় কোন রূপ কল্পনা করতে পারে না, তারাও জানে না, তাদের নিজ সম্প্রদায়ের কারা সর্বস্ব হারালো।...এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কি হতে পারে? ...ঢাকা শহরের দুর্ভাগ্য যে, সাধারণ লোকের কাছে এখনও এরা প্রতিপত্তিশালী। এইজন্যই, বেছে বেছে ঢাকা শহরটাকে গুণ্ডারা তাদের হত্যাব্যবসায়ের রাজধানী করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জনসাধারণের চিন্তাস্রোতকে ঘোলা করে রাখে জেনেই, গুণ্ডারা জনসাধারণকে নাচাবার সাহস পায়।...আমাদের চিন্তাকে নির্মল করতে হবে। আমাদের চিন্তাকে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর লোক যাতে ঘোলা করে না রাখতে পারে, সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।" দাঙ্গার ব্যাপারটা উল্লেখ করতে হল এই জন্যে যে, যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ এই তিনের সম্মিলিত কালো হাওয়ায় মুখ রেখেই বিবেকবান দেশপ্রেমিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের সে সময় ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় যে নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। ২০ ডিসেম্বর রাত্রিতে আসন্ন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ও লেখক সংঘের সমকালীন দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা

শেষ হবার পরই মধ্য রাত্রিতে জাপানী বোমারু বিমান রাত্রির শুব্ধতাকে ভঙ্গ করল, দুশমনদের মুখোমুখি হবার সুযোগ মিলল কলকাতার দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের পরে' এই শিরোনামায় ১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯-এর 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "কলকাতার সম্মেলনের পর ইতিমধ্যে দু'মাস কেটে গেছে. এই সময়ের মধ্যে সংঘের মুখপত্র 'প্রতিরোধ' সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানের অধ্যাপক ছাত্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্থানীয় প্রগতি লেখকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রগতি লেখকদের উদ্দেশ্য ও উপস্থিত কার্যসূচী সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে প্রগতি লেখক সংঘের যে সাপ্তাহিক বৈঠক প্রতি রবিবার বসে থাকে তার উপস্থিত অনুরাগীর সংখ্যাও ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে এটাকে নিশ্চয় একটা শুভ লক্ষণ বলা যায়। ঢাকার মতো দাঙ্গাবিধ্বস্ত ও পঞ্চমবাহিনী কণ্টকিত শহরে সাহিত্যিকদের আহ্বানে দেশপ্রেমিকরা যে সাড়া দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তা স্মরণে রেখেই আমরা কলকাতার 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘকে' দস্যুর আক্রমণের প্রাক্কালে জানাতে চাই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের মতো আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো, সঙ্গে থাকবে আমাদের পাশাপাশি শ্রমজীবী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী জনগণ।"

১৯৪১ থেকে ১৯৪২-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এইভাবেই পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এর ফলে অনেক পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশবিভাগের পরে আয়ুবশাহীর আমলে বাঙলাদেশের তরুণ সমাজে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা হয়, যুদ্ধকালীন আন্দোলনের সময়কার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছুটা প্রভাব তার পেছনে কাজ করে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। [পরিচয়]

পরিশিষ্ট—৩

সোমেন চন্দ ও কয়েকটি পত্রিকা

[সোমেন চন্দের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এমন দুটি প্রায়-লুপ্ত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জী সংকলিত হল। সোমেন ও সমকালের রাজনৈতিক-সাহিত্যিক প্রবণতা জানার ক্ষেত্রে এ দুটি পত্রিকা আলোকসম্পাত করতে পারে। 'প্রতিরোধ' সোমেন বিষয়ক আলোচনার জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রতিরোধ' সম্বন্ধে রচনাটি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সমকালে সংশ্লিষ্ট কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের।]

॥ ক ॥ সোমেন ও বালিগঞ্জ পত্রিকা

সম্প্রতি 'বালিগঞ্জ' নামক মাসিক পত্রিকাটির হদিশ পাওয়া গেছে। এটির হদিশ দেন ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের প্রখ্যাত লেখক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ। 'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় সোমেনের 'বন্যা' নামক উপন্যাসের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া 'গান', 'প্রত্যাবর্তন', 'মহাপ্রয়াণ' নামে তিনটি গল্পও প্রকাশিত হয়। গান ও প্রত্যাবর্তন গল্প দুটি সোমেন 'ইন্দ্রকুমার সোম' এই ছদ্মনামে লেখেন। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ আমাকে বলেছেন যে, তিনিই সোমেনের পিতৃদত্ত নামকে একটু অদল বদল করে এই ছদ্মনাম গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। হয়তো প্রতি সংখ্যায় সোমেনের উপন্যাস প্রকাশিত হতো বলেই এই ছদ্মনাম গ্রহণের প্রশ্ন এসেছিল। 'গান' গল্পটি ১৩৪৬-এর ফাল্গুন সংখ্যায়, 'প্রত্যাবর্তন' ১৩৪৬-এর চৈত্র সংখ্যায় এবং 'মহাপ্রয়াণ' ১৩৪৭-এর আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ছিলেন 'বালিগঞ্জ' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি আমাকে বলেছেন যে, 'অগ্রগতি' পত্রিকায় তিনি কিছুদিন ম্যানেজারি করেন। ১৯৩৯ সালে, প্রায় বছর তিনেক 'অগ্রগতি' প্রকাশিত হবার পর যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি 'সবুজ-বাংলার কথা'

নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় মাস পত্রিকাটি বেরু হয়েছিল, গোটা কুড়ি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর তিনি 'বালিগঞ্জ' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

'বালিগঞ্জ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের মাঘ মাসে। প্রথম সংখ্যা থেকেই সোমেনের উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটির উপর লেখা থাকত 'অভিনব বাংলা মাসিক পত্রিকা'। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় কলমে বলা হয়: "বালিগঞ্জের মতো একটি পত্রিকার অভাব আমরা অনুভব করিয়াছি বলিয়া এবং কিনিয়া যাঁহারা পত্রিকা পড়েন তাঁহাদের অবচেতন মনও এইরূপ একটি পত্রিকার অভাবে খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল বলিয়া 'বালিগঞ্জ' পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইল।" এর বেশী কিছু কৈফিয়ৎ দিতে তাঁরা নারাজ। সম্পাদকীয় রচনাটির মধ্যে বেশ একটা জেদী সুর আছে।

পত্রিকাটিতে গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক ছাড়াও থাকত সম্পাদকীয়, 'অপ্রাসঙ্গিক' শিরোনামে একটি ফিচার এবং 'আমাদের' কথা শীর্ষক একটি আলোচনা। 'আমাদের কথা' শীর্ষক আলোচনায় স্থান পেতো সমসাময়িক সামাজিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ঘটনা; যেমন—ব্রহ্মদেশের বাংলা সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্যিকের স্মৃতি, মফঃস্বলের সাহিত্য প্রয়াস, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব, নূতন কলিকাতা কর্পোরেশন, নূতন পাট অর্ডিন্যান্স, ট্রটস্কির মৃত্যু, কংগ্রেস অতঃপর কী করিবে, ভারতের চতুর্বিধ সর্বনাশ, দেশীয় রাজ্য শাসন সংস্কার প্রভৃতি। ১৩৪৭-এর চৈত্র সংখ্যা থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক শিরোনামে গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭-এর শ্রাবণ সংখ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ সমালোচিত হয়।

'বালিগঞ্জ' ১৩৪৬-এর মাঘ মাস থেকে ১৩৪৭-এর মাঘ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই এক বছরের মধ্যে পত্রিকার দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে সোমেন চন্দ ছাড়া ছিলেন অজিতকৃষ্ণ বসু বা অ-কৃ-ব, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন ঘোষাল, অজয় ভট্টাচার্য, হিমানী গুপ্তা, অরুণা সিংহ, সুধীরচন্দ্র রাহা, অমৃতকুমার দত্ত, বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব রায়, আশু চট্টোপাধ্যায়, প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কলকাতার পত্রিকা 'বালিগঞ্জে'র সঙ্গে ঢাকার সোমেন চন্দের সংযোগ স্থাপিত হলো কী ভাবে সে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

বলেছেন যে, ১৯৩৭ সালে তিনি ঢাকায় যান, সেখানে তাঁর সঙ্গে শ্রীঅমৃতকুমার দত্তের পরিচয় হয়। সম্ভবত ২০নং কোর্ট হাউস স্ট্রীটেই তাঁদের পরিচয় হয়। ঐ ঠিকানা ছিল প্রতিরোধ পাবলিসার্শের। এর অদূরেই ১৫নং কোর্ট হাউস স্ট্রীটে ছিল ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। শ্রীদত্তই শ্রীঘোষের সঙ্গে সোমেন চন্দ ও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আলাপ করিয়ে দেন। শ্রীঘোষ সোমেনকে বলেন 'অগ্রগতি'র জন্য লেখা পাঠাতে। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীঘোষ তখন 'অগ্রগতি'র ম্যানেজার। কথামত সোমেন লেখা পাঠান। 'অগ্রগতি'তে তাঁর 'ভালো না লাগার শেষ' এবং 'অন্ধ শ্রীবিলাশের অনেক দিনের একদিন' নামে গল্প প্রকাশিত হয়। তারপর শ্রীঘোষের উদ্যোগে যে 'সবুজবাংলার কথা' প্রকাশিত হয়, তাতেও সোমেন লেখা পাঠান। সম্ভবত এই সময় তিনি তাঁর 'বন্যা' উপন্যাসের প্লট তৈরী করছিলেন। ১৯৩৮ সালের ৯ই নভেম্বর শ্রীনির্মলকুমার ঘোষকে লেখা সোমেনের একটি পত্রে তার উল্লেখ দেখা যায়। উপন্যাসের পেছনে যে শ্রীঘোষের প্রেরণা আছে তার প্রমাণ সোমেন লিখিত পত্রেই বিদ্যমান। সোমেন লিখছেন—"আপনি বিত্তহীন মধ্যবিত্তদের নিয়ে লিখতে বলেছেন, এঁদের ছাড়া আমি আর কাউকে নিয়ে লিখবো না জানবেন। আমার বর্তমান উপন্যাস তাঁদেরই নিয়ে।" শ্রীঘোষ জানিয়েছেন যে, রচনার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে তিনি সোমেন চন্দকে পাঁচ-দশ টাকা করে দু-একবার দিয়েছেন। তারপর সোমেন যখন কলকাতায় আসেন এবং হিন্দুস্থান পার্কে তাঁদের পত্রিকার অফিসে ওঠেন তখন এককালীন পঞ্চাশ টাকা তিনি সোমেনকে দিয়েছিলেন পারিশ্রমিক স্বরূপ। সম্ভবত 'বন্যা' উপন্যাসের জন্যই সোমেন এই পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

'বালিগঞ্জ' পত্রিকায় 'বন্যা' উপন্যাস প্রকাশিত হবার সময় সোমেন উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব লেখাও শেষ করেন। দুই-তিনটি খাতায় লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি তিনি নির্মলবাবুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। নির্মলবাবু মালতীকে নায়িকা করে রচনাগুলি নূতন করে লেখার অনুরোধ জানিয়ে খাতাগুলি ফেরৎ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 'বালিগঞ্জ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কিছুদিন পরে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোমেন নিহত হন। বন্যার ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিগুলিরও হদিশ পাওয়া যায় নি।

[দিলীপ মজুমদার : সারস্বত, কার্তিক-পৌষ ১৩৮১]

'বালিগঞ্জ' নামক 'অভিনব বাংলা মাসিক পত্রিকা'টি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সনের মাঘ মাসে। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার নামকরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয় :—

"মত বলিয়া কোন একটা জিনিসকে গোড়া হইতে খাড়া করিয়া ধরিতে হইবে, ইহা আর যাহারা বিশ্বাস করে করুক—আমরা করি না। নামকরণের প্রতারণার দ্বারা আগামীকালের নিরুদ্বেগ পুঁজি সঞ্চয়ের ব্যবস্থাটা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া যে তাহা আমরাও মানিয়া লইব, এবং সকলেই যে, মানিয়া লইবে, তাহারও কোনো কথা নাই।

সুতরাং আমাদের পত্রিকার নাম 'বালিগঞ্জ' হইল কেন, অন্য কিছু রাশভারী শ্রুতিমধুর নিয়মানুগত নাম কেন হইল না,—তাহা লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে কিছু লিখিব না। এবং এই পত্রিকার মত ও উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধেও কোনো কাব্যসম্মত ভাবগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া কলাবিদগ্ধ সুধী-সমাজকে যুগপৎ উদগ্রীব ও উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চাই না। আমাদের পত্রিকার নাম 'বালিগঞ্জ' দিলাম বলিয়া পাঠকসমাজ যদি মনে করেন যে বালিগঞ্জের ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সাহিত্যিক সামাজিক প্রভৃতি ক্ষিপ্ত প্রত্যয়াস্ত তথ্য সম্বন্ধে কোনো নতুন আলোক তির্যকভঙ্গীতে প্রতিফলিত করিবে, অথবা করিবে না, তাহা হইলে আমরা এইটুকু ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিব যে, সুধীজনের স্বাধীন মনোবৃত্তির উপর আমরা আমাদের অহমিকাকে অন্তত চাপাইয়া দিই নাই।

"সত্যের অপলাপ করিয়া লাভ নাই। পৃথিবীর পাশ্চাত্য অঞ্চলসমূহ হইতে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে যে সব বস্তু ও বস্তুসম্পর্কিত যে সব ধারণা ও চিন্তাবলী উঠিয়া পড়িয়া রপ্তানি করিতেছেন এবং সেই সব বস্তু ও বস্তুসম্পর্কিত চিন্তা ও ধারণা সু-সার পলিমাটির দেশে বীজরূপে বর্ষিত হইয়া অচিরাৎ মহাদ্রুমের আকার ধারণ করিতেছে,—তৎ তৎ সম্বন্ধেও আর্যজনোচিত কোন দার্শনিক ব্যাখ্যার ও বুলির সুপ্রজনন উৎকর্ষ দেখাইতে পারিব বলিয়া আগাম চুক্তি করিতে পারিতেছি না।

"কিন্তু পকেটের পয়সা খরচ করিয়া যাঁহারা অতঃপর আমাদের কাগজ কিনিবেন বলিয়া অনুমান করিতেছি, তাঁহারা এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। কাগজ যখন বাহির হইয়াছে, তখন

একটা প্রস্তাবনা লিখিতে হইবেই, এবং সেই প্রস্তাবনার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য—তাহা প্রচ্ছন্ন হউক—বা প্রকটই হউক, থাকিবেই। ইহাই দেশাচার। আমরা দেশাচারের গণ্ডি অতিক্রম করিব বলিয়া কোন জিদ্ প্রকাশ করি না। অতএব সরল কথায় আমাদের সরল মনের অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিতে হইল।

"তাহার আগে একটি খুচরা খবর লেখা যাক। জনৈক যশোলাভেচ্ছু সাহিত্যিক বন্ধুর খেদোক্তি শুনিতেছিলাম। নামজাদা কোনো সাহিত্য রসিকের নিকট স্বীয় রচনার মাহাত্ম্যকীর্তন করিতে যাইয়া তিনি—বলিতে গেলে—টাক্ খাইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাহিত্যরসিক ইতিপূর্বে সাহিত্যিকটির কোনো রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। এবং জানা গেল কোনো একটি বিশেষ সাময়িক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার রস গ্রহণ তিনি করেন না। অথচ সাহিত্যিকটি অপর এক রসিকের অনুগ্রহলব্ধ অন্য হু' একটি পত্রিকায় রচনা ছাপাইয়াছিলেন। এবং বহুলোকের নিকট সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিভাত হইবার মানসে তিনি অন্য এক বহুল প্রচারিত পত্রিকায় রচনা দিয়াছিলেন। এই বহুল প্রচারিত পত্রিকা কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতে লেখা হয় বলিয়া পূর্বোক্ত সাহিত্য-রসিক নিশ্চয়ই পড়েন না। তদুপরি বহুল প্রচারিত পত্রিকার অগণিত পাঠকসংখ্যার নিকট হইতে কোনো প্রশংসার বাণীও কদাচিৎ কানে আসা ঘটিয়া ওঠে না। এতদতিরিক্ত এইটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সাহিত্যরচনার বিনিময়ে বাংলাদেশে যাহা সাহিত্যিকদের পকেটে আসে তাহা অনির্বচনীয়। সুতরাং রচনার বিনিময়ে টাকাটা সিকিটা মিলিবে না এবং সমঝদারদের সপ্রশংস উৎসাহও পাওয়া যাইবে না,—তাহা হইলে বেচারা সাহিত্যিকেরা দাঁড়ান কোথা? অর্থাৎ কিসের মোহে তাঁহারা লিখিবেন? আপনি অমুক কাগজ পড়েন না, অপর সাহিত্যরসিক তমুক কাগজ পড়েন না, অপর কোনো সাহিত্যরসিক অন্য তমুক কাগজ পড়েন না। বেচারা সাহিত্যিক বন্ধুটি প্রায় খেপিয়া গিয়া প্রস্তাব করিলেন,—ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের সাহিত্য-রসিকরা একজোট হইয়া এমন কতগুলি পত্রিকার লিষ্টি করুন যাহা জানিতে পারিলে যশোলাভেচ্ছু সাহিত্যিকেরা এইসব পত্রিকার কোনো কোনোটায় লেখা ছাপাইয়া এইটুকু আত্মপ্রকাশ অন্তত অনুভব করিবে—'যাহা হোক্, অমুক রসিক আমার অমুক অমুক রচনা পড়িয়াছেন।' —বন্ধুটি খেপিয়া গিয়া প্রস্তাব করিলেও প্রস্তাবটি পাঁচজনকে শুনাইবার মতো।

কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতো অন্যদিককার বিপত্তি সম্বন্ধে বে-ওয়াকিবহাল হওয়াও চলে না। সেই অন্যদিককার বিপত্তির আভাসও দিতেছি :—

বাংলাদেশের অপর নাম সমতট প্রদেশ; এদেশে উঁচুনীচুর প্রভেদ বিস্তর নাই; এদেশে এরণ্ডবৃক্ষকেও মহীরুহ বলিয়া ভ্রম হওয়ার প্রবাদ আছে। অথচ হাঁটুজল বন্যাকেও সেই অগভীর শিকড় এরণ্ড ঠেকাইতে পারে না,—সামান্য আঘাতেই ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এবং শুধু কি এরণ্ড? ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক বৎসর উৎরাইবার আগেই এদেশের মানুষের এবং মানুষের প্রতিভার কৈবল্য-প্রাপ্তি অহরহ ঘটিয়া থাকে। এই দেশেই রাশভারী ও পায়াভারী প্রাতঃস্মরণীয় লেখকদের দামী ও ভারী বইগুলির সংস্করণান্তর যোগে অনৈসর্গিক ব্যাপারের সামিল হইয়া আছে। এবং গোটা বাঙ্গালী জাতির জাতীয় লক্ষণ হিসাবেই কিনিয়া পড়িবার প্রবৃত্তিকে চাহিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি প্রবলবিক্রমে কোণঠাসা করিয়া রাখে।

সুতরাং উল্লিখিত জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া আমাদের সরল অভিপ্রায়টির যথার্থ মর্ম পাঠকগণের মর্ম যথার্থই ছুঁইতে পারিবে কি না অনুমান করিতে পারিতেছি না। তবুও লিখি :—

'বালিগঞ্জে'র মতো একটি পত্রিকার অভাব আমরা অনুভব করিয়াছি বলিয়া এবং কিনিয়া যাঁহারা পত্রিকা পড়েন—তাঁহাদের অবচেতন মনও এইরূপ একটি পত্রিকার অভাবে খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল বলিয়া, 'বালিগঞ্জ' পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইল। এই পত্রিকায় কি কি বিষয় থাকিবে অথবা থাকিবে না, তাহার কোনো তালিকা এখনই দিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াইয়া পাঠকদের ফাঁকি দিতে চাই না। কাহারা এই পত্রিকায় লিখিবেন তাহার তালিকাও অনুরূপ এবং অন্যান্য কারণে দেওয়া সম্ভবপর হইল না। প্রচলিত অনেক জনপ্রিয় লেখকদের নামই দিতে পারিতাম; কিন্তু একবৎসর পরেও যদি টিকিয়া থাকি তাহা হইলে ইতিমধ্যে কেন তাহাদের লেখা ছাপাই নাই বলিয়া জবাবদিহি করিতে হইতে পারে,—এই আশঙ্কাটাও আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। শুধু এই পর্যন্ত সম্পাদকীয় দায়িত্ব লইয়া জানাইতে পারি : যাঁহারা এই কাগজে লিখিবেন—তাঁহাদের লইয়াই আমরা; এবং তাঁহারা যে জনপ্রিয় হইবেনই একথা দ্বিধা না রাখিয়াই লিখিতে পারি।"

রচনাপঞ্জী

১ম সংখ্যা : মাঘ : ১৩৪৬

সম্পাদকীয়

যৌবনের মান রাখ (কবিতা) / সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

শোকসভা (গল্প) / নীহাররঞ্জন ঘোষাল

অপ্রাসঙ্গিক (ফিচার) /

বিদ্যাপতি ও অনুরাধা (কবিতা) / অ. কৃ. ব

ডিটেকটিভ (গল্প) / অজিতকৃষ্ণ বসু

আমাদের কথা

(নূতন পত্রিকা, আন্তর্জাতিকতার বিলোপ, মহাসভা আন্দোলন)

২য় সংখ্যা : ফাল্গুন : ১৩৪৬

স্বপ্ন-দ্বীপ (কবিতা) / অজয় ভট্টাচার্য

গান (গল্প) / ইন্দ্রকুমার সোম

দুইটি কবিতা (কবিতা) / হিমানী গুপ্তা

বর্ণচোরা (নাটিকা) / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

বিদ্যাপতি ও অনুরাধা (কবিতা) / অ. কৃ. ব

অপ্রাসঙ্গিক (ফিচার) /

শোকসভা (গল্প) / নীহাররঞ্জন ঘোষাল

আমাদের কথা

(ব্রহ্মদেশের বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ফিনল্যাণ্ড দখল করিবার চেষ্টা, ভারতের চতুর্বিধ সর্বনাশ, অতিরিক্ত আয়কর বিল, দেশীয় রাজ্যে শাসন সংস্কার, ভারতে আধ্যাত্মিকতার নূতন আততায়ী)

মানুষ অপরাধ করে কেন (প্রবন্ধ) / শ্রী

৩য় সংখ্যা : চৈত্র : ১৩৪৬

২৩শে নভেম্বর ১৯৩৯ (কবিতা) / নির্মল ঘোষ

মাত্রাজ্ঞান ও অতিরঞ্জন (প্রবন্ধ) / বুদ্ধদেব বসু

প্রত্যাবর্তন (গল্প) / ইন্দ্রকুমার সোম

দ্বিপদী (কবিতা) / অ. কৃ. ব

সানাই (নাটিকা) / নীহাররঞ্জন ঘোষাল

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

রজনীগন্ধা (কবিতা) / মানব রায়

অপ্রাসঙ্গিক (ফিচার) /

আমাদের কথা

('মানুষ অপরাধ করে কেন', ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব, প্রগতিকামী-দিগকে স্তব্ধ করিবার প্রয়াস, প্রাদেশিকতা-বোধ প্রগতির অন্তরায়, বিশ্ব-ভারতীর জন্য উদ্বেগ, সাহিত্যিকের স্মৃতি, মনোনয়নের আসল রূপ, অতঃপর তুরস্কের পালা)

মানুষ অপরাধ করে কেন (প্রবন্ধ) / শ্রী

৪র্থ সংখ্যা ঃ বৈশাখ ঃ ১৩৪৭

বৈশাখী (সম্পাদকীয়) /

পলাতকা (কবিতা) / হিমানী গুপ্তা

চিন্তাহরণ (গল্প) / অজিতকৃষ্ণ বসু

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

ভগবান তত্ত্ব (প্রবন্ধ) / অ. কৃ. ব

প্রথমা বৈশাখ (কবিতা) / অরুণা সিংহ

শহর (গল্প) / সুধীরচন্দ্র রাহা

জীবনদেবতা (কবিতা) / বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্রাসঙ্গিক (ফিচার) /

আমাদের কথা

(কংগ্রেস অতঃপর কি করিবে, পাদরী কলেজে ছাত্র আন্দোলন, কুসিনেন্-এর প্রাণদণ্ড, নূতন কলিকাতা কর্পোরেশন)

বালিগঞ্জ (রম্যরচনা) / শ্রীঅমোঘ

৫ম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৪৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা : আষাঢ় : ১৩৪৭

৭ম সংখ্যা : শ্রাবণ : ১৩৪৭

পটভূমিকা (গল্প) / অমৃতকুমার দত্ত

আমাদের কথা / (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

৮ম সংখ্যা ঃ ভাদ্র ঃ ১৩৪৭

জিনিয়াস্ ও কবিতা (প্রবন্ধ) / অ. কৃ. ব

অধুনাতম সাহিত্য ও পাঠক (রম্যরচনা) / আশু চট্টোপাধ্যায়

পরিহাস (গল্প) / সুধীরচন্দ্র রাহা

আজো কি মনে আছে (কবিতা) / নীহাররঞ্জন রাহা

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

'কাব্য দেখে ভ'বি যেমন—' (গল্প) / লতিকা রায়

অপ্রাসঙ্গিক (ফিচার) /

আমাদের কথা /

(ট্রটস্কীর মৃত্যু, চিত্র প্রদর্শনী, মফঃস্বলের সাহিত্য প্রয়াস / ন. ঘ)

যুদ্ধ ঃ গণতন্ত্র ঃ জনসাধারণ (প্রবন্ধ) / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

৯ম সংখ্যা ঃ আশ্বিন ঃ ১৩৪৭

অলকাপুরী (কবিতা) / মানব রায়

সমরলিপ্সায় নৈতিক আদর্শের প্রভাব (প্রবন্ধ) / সচ্চিদানন্দ মিশ্র

প্রান্তর (গল্প) / সোমেন চন্দ

নৃত্যচর্চার হাওয়া (প্রবন্ধ) / প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদায় (কবিতা) / উমাশঙ্কর বসু

সখি (মরিস্ মেটারলিংকের কবিতা) / অনু. বেণুবাণী সরকার

বন্যা (উপন্যাস) / সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

তুমি আর আমি (কবিতা) / নীহাররঞ্জন রাহা

সাহিত্য ও সাহিত্যিক / গ্রন্থ সমালোচনা

(রজনীগন্ধা / মানব রায়—সমালোচনা অরুণা সিংহ

অতনু / গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত—সমালোচনা সুরেশ দস্তিদার,

ভালো মন্দ নয়, ছোট আকাশ / আশু চট্টোপাধ্যায়—সমালোচনা

নীহাররঞ্জন রাহা,

১০-১১ সংখ্যা : পৌষ-মাঘ : ১৩৪৭

॥ খ ॥ সবুজ বাংলার কথা ও সোমেন চন্দ

'ইঁদুর' গল্প লিখে সোমেন চন্দ চল্লিশের দশকে আলোড়ন তুলেছিলেন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তার বাহক ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্যপদ লাভ করেছিলেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে সোমেন ছিলেন সাহিত্যিক। এই তরুণ লেখকের সৃজনীপ্রতিভা তাঁর বিরোধী মতের লোকেরাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে যুগে 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামের আড়ালে শ্রী অন্নদাশংকর রায় লিখেছিলেন : "মসীজীবীদের ডান হাতের লেখা পড়তে পড়তে যাঁদের বাংলা গল্পে অরুচি ধরেছে, যাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন বাংলা গল্পের বই কিনবেন না, অসিজীবীর বাঁ হাতের লেখা এই গল্পগুলি তাঁদের প্রলুব্ধ করবে।·· বাইশ বছর যুবকের পক্ষে রচনাগুলি আশ্চর্য রকম পাকা হাতের।·· তাঁর এই বয়সের লেখাগুলি সম্বন্ধে প্রাণ খুলে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। এগুলি টিঁকবে। এদের ভিতরকার প্রাণশক্তি ও প্রেম এদের বাঁচিয়ে রাখবে।···"(প্রতিরোধ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩)। কিন্তু বেশি দিন সাহিত্য-সাধনা করার সুযোগ ঘটেনি সোমেনের। অকালে, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে, ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের হাতে নিহত হন তিনি। সেমেনের সমগ্র রচনা এখনো সংগৃহীত হয় নি। অগ্রগতি, নবশক্তি, বালিগঞ্জ, শান্তি, বলাকা, অরণি, দেশ ও সবুজবাংলার কথা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে আছে। তাঁর মৃত্যুর পরেও কোন কোন পত্রিকায় তাঁর অপ্রকাশিত রচনা ছাপা হয়েছে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পর্যায়ভুক্ত এই সব পত্রিকাগুলি দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেনি, যেহেতু অপরিমিত উৎসাহ থাকলেও উদ্যোক্তাদের আর্থিক সম্বল ছিল সামান্য। প্রায়ই ২/১ বৎসর প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলত গ্রন্থাগারেও এগুলি সংগৃহীত হতে পারেনি। অথচ, সেমেনের লেখা তো বটেই, সমকালীন এক একটি যুবগোষ্ঠীর মানসপরিবর্তনের ইতিহাস জানায় বলেও এগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন।

'বালিগঞ্জ' পত্রিকার সঙ্গে সম্প্রতি 'সবুজ বাংলার কথা' নামক পত্রিকাটির হদিশ পাওয়া গেছে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের খ্যাতনামা লেখক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ। পত্রিকার মুদ্রক শ্রীবিজয়গোপাল ভট্টাচার্য, ৫-এ নুরমহম্মদ লেন, কলিকাতা; কার্যালয় ১৬৪-র, বউবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। আমরা এতাবৎ উদ্বোধন সংখ্যা থেকে মোট ৮টি সংখ্যার খোঁজ পেয়েছি। যথা: উদ্বোধন সংখ্যা, ৮ই আশ্বিন ১৩৪৫ : ২য় সংখ্যা, ৫ই কার্তিক ১৩৪৫ ; ৩য় সংখ্যা, ১৯শে কার্তিক ১৩৪৫ ; ৪র্থ সংখ্যা, ২৬শে কার্তিক ১৩৪৫ ; ৫ম সংখ্যা, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; ৭ম সংখ্যা, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ; ৮ম সংখ্যা, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫। সংখ্যাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করারই পরিকল্পনা ছিল উদ্যোক্তাদের।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ আমাকে জানিয়েছেন যে, 'অগ্রগতি' পত্রিকায় তিনি কিছুদিন ম্যানেজার ছিলেন। বছর তিনেক প্রকাশিত হবার পর উক্ত পত্রিকাটি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখনই শ্রীঘোষ 'সবুজ বাংলার কথা' প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় কলমে কিছু বক্তব্য লেখা হয়। বলা বাহুল্য, এই সম্পাদকীয় ঘোষণায় পত্রিকার মেজাজটি অনুধাবন করা যায়। পত্রিকাটিতে গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির সঙ্গে থাকত 'চলন্তিকা' নামে ফিচার এবং 'রয়টার' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত সংবাদ পবিবেশনা। ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় আরো একটি বিষয় সংযোজিত হয়, 'সামাজিক সাহিত্য' শীর্ষক পুস্তক সমালোচনা। পত্রিকার লেখকদের মধ্যে ছিলেন: নির্মলকুমার ঘোষ, কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, অমৃতকুমার দত্ত, হরেন ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত ও সোমেন চন্দ।

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ বলেছেন যে, ১৯৩৭ সালে নাগাদ তিনি একবার ঢাকা যান; সেখানে তাঁর সঙ্গে ২০নং কোর্ট হাউস স্ট্রীটে (প্রগতি পাবলিশার্সের ঠিকানা) শ্রীঅমৃতকুমার দত্তের পরিচয় হয়। শ্রীদত্তই শ্রীঘোষের সঙ্গে সোমেন চন্দ ও কবি কিরণশংকর সেনগুপ্তের পরিচয় করিয়ে দেন। নির্মলবাবু তখন অগ্রগতির ম্যানেজার; তাঁর অনুরোধে সোমেন অগ্রগতিতে কয়েকটি গল্প

(ভালো-না-লাগার শেষ, অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন) লেখেন। তারপরে, ১৯৩৮ সালে শ্রীঘোষের সম্পাদনায় 'সবুজ বাংলার কথা' প্রকাশিত হল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে সোমেনের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা জানা যায় তাঁর লেখা একটি চিঠি থেকে। সোমেন লিখছেন :—"সবুজ বাংলার কথা, পেয়েছি। ভালো লাগলো।…আপনি এবং পত্রিকার নীতি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে। বিশেষত—'অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সৃষ্টি করেছে কোন প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়-গিরির লাভা প্রবাহে এক একদিন আত্মপ্রকাশ ক'রে, নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা, যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে।……আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে, যে-বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার।' খুবই ভালো লাগলো, আমি নিজেই অনুভব করছি যেন। …আমার এই বিপ্লবের অনুভূতি আমার সাহিত্য সাধনার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে।

"আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়, আরো অনেক সাহিত্য-সেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করতে পারছে না বা অনেকের কণ্ঠই ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য ডিক্টেটদের গোলমালে। কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই। এই সব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি। আমার উপলব্ধি, অনুভূতি আর আমি নিজে……এই ঢাকা শহরে একা।" (১০-১০-৩৮ তারিখে নির্মলকুমার ঘোষকে লেখা সোমেনের চিঠি)।

'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকার ৮টি সংখ্যায় সোমেনের মোট ৩টি গল্প প্রকাশিত হয়। 'সোমেন্দ্রকুমার চন্দ' এই নামেই উক্ত পত্রিকায় তাঁর নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রকাশিত হয় : উদ্বোধন সংখ্যায় 'অমিল', ৪র্থ সংখ্যায় 'রাণু ও স্যার বিজয়শঙ্কর,' এবং ৮ম সংখ্যায় 'এক্স সোলজার'। ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে কলকাতার ৩১নং আশুতোষ মুখার্জী রোডের মডার্ন পাবলিশার্স 'বনস্পতি' নাম দিয়ে সোমেনের যে গল্প-সংকলনটি প্রকাশ করেন, 'অমিল' তাতে সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু শেষের গল্প দুটি এখনো কোন সংকলনে সংকলিত হয় নি।

[দিলীপ মজুমদার, চতুষ্কোণ]

'সবুজ বাংলার কথা' পত্রিকার
প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ঃ

প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা নয়

প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটা ভূমিকা থাকা দরকার, নূতন পত্রিকার সম্পাদকের কাছেও পাঠকমাত্রই একটা ভূমিকা প্রত্যাশা করে। বাংলাদেশে অগুণতি পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও একখানা নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সার্থকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মাত্রই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন।

বড়ো বড়ো নীতিবাক্য ও সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক পত্রিকা এর আগে বেরিয়েছে, অতিদূর নক্ষত্রের আলোর মতো মহাশূন্য অতিক্রম করে আসবার অনেক আগেই তাদের নিঃশেষ ঘটেছে। অপমৃত্যু-বাহুল্যের দেশে সেই সব ব্যর্থ প্রয়াস কারো মনে দাগ কেটেছে কিনা বলতে পারি না। স্বল্পস্মৃতির পটে তাদের রেখা বিস্তারে আজ অবধি উজ্জ্বল হয়ে যে নেই—এ কথাটাই পরম সত্য।

সুতরাং ভূমিকার ছলে বড়ো আশার বড়ো বাণীর তত্ত্বকথা বাঙ্গালীকে শোনানো আমাদের সামর্থে সম্ভবপর হবে না। আর ভূমিকাই বা কেন? বাঙ্গালী জাতটাই একটা ভূমিকাহীন জাত। বুদ্ধি যেখানে সার্বভৌম বিবৃতি, তত্ত্বকথা যেখানে অনুপ্রাসবহুল কথার মারপ্যাচের সমষ্টি, সেখানে নূতন করে কোন্ ভূমিকার অবতারণা করব?

সংবাদপত্র তো জাতির মর্মকথা উদ্ঘাটন করে না! শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যতের প্রতি অসীম প্রত্যয়ের কোন ভরসা তো বাংলাদেশের সাবাদপত্র লিপিবদ্ধ করে না! সেখানে সমবেতভাবে দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক বলে চালিয়ে আদতে জনকয়েক পুঁজিদারের ভাড়াটিয়া-দালাল-শ্রেণীতে পরিণত হয়ে থাকে, সেখানে জনমত কস্মিনকালেও প্রবুদ্ধ হতে পারে না।

এই সর্বজনীন অবনতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে যে, প্রতিষ্ঠা করবে যে আগামীকালের রীতিনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা—

বাংলাদেশের সেই যৌবন-ক্ষাত্র শক্তিকে, অনাগত বিধাতার রুদ্রতেজকে আহ্বান করার জন্য যে কোন কথার ভূমিকাই তো তুচ্ছ! শুধু কথা দিয়েই তো বিপ্লব হয় না! আজ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা হয়েছে,—যে বিপ্লব দেবে আমূল সংস্কার; সেই বিপ্লব কামনা করবে যে,—সেই যৌবনশক্তির প্রশস্তি হবে আমাদের রচনায়। যদি ভূমিকা কিছু থাকেই, তবে সেই প্রশস্তির নান্দীপাঠই আমাদের ভূমিকা।

ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা ও সাহিত্যে আজ ক্ষুদে ক্ষুদে ডিক্টেটরে গিয়েছে দেশ ছেয়ে। পঙ্গপালের উৎপাতে শস্য লাল হয়। এইসব ডিক্টেটর পঙ্গপালের উৎপাতে আজ একটা গোটা জাতির বুদ্ধি হতে বসেছে বিভ্রংশ। চিন্তা ও বিবেচনা এবং প্রয়াসের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে হুজুগের বেনোজল।

অপরিসীম ক্লেশবরণ ও দুঃখভোগের রাত্রির পরিশেষে অপেক্ষা করছে যে নব সূর্যোদয়ের চরম মুহূর্ত—তাকে হাসিমুখে নিকটতর তুলবার তপস্যা তো জাগ্রত বাংলায় সেই যৌবন-শক্তিরই। আজ শতাব্দীর প্রান্তর আচ্ছন্ন করে মিথ্যা একটা মোহের কুয়াশা যৌবনশক্তির কাছে ঘটাচ্ছে পরিপ্রেক্ষিকের বিভ্রম। কিন্তু এই পরিস্থিতিই চরম নয়; প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের বিদ্রোহী ক্ষাত্রতেজই জেনেছে যে বর্তমানের নাগালের বাইরে রয়েছে যে আগামী দিন তাকে সহ্য করতে পারবে না বলেই বর্তমানের এই চক্রান্ত।

মানুষের সমাজ গড়ে উঠবার পর থেকে আজ অবধি প্রায় একই নীতি সর্বদেশেই অনুসৃত হয়ে এসেছে। এর ফলে সর্বসাধারণের কল্যাণ হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক একথা অনস্বীকার্য যে লাভ ও সুবিধার বলতে গেলে আঠারো আনারই মালিকানা জনকয়েক লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। এই জন্যেই সমাজব্যবস্থার সামান্যতম রদবদলের প্রস্তাবও এদের কাছে অসহ্য হয়ে থাকে। এদেরই উচ্ছিষ্ট দাক্ষিণ্যে পরিতুষ্ট হয়ে এদেরই দালালরা প্রগতিপন্থী মানুষকে দিয়ে থাকে অশেষ নির্যাতন;—প্রভুর প্রশ্রয়ে যেমন কুকুর হয়ে ওঠে অত্যাচারী।

একথা ভেবে আশ্চর্য লাগে যে কি করে কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোক আজ সমাজের নিয়ামক হয়ে উঠেছে। জনগণের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে এরা ভণ্ডামীর মুখোস পরে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনগণের ক্লীব মনোভাবই এদের পুঁজি। বিদেশী শোষকদের সঙ্গে এরা যে বিরোধ করে তাতে থাকে দেশহিতৈষণার ভণ্ডামী কিন্তু শোষণ ব্যাপারে ভাগদখলের অধিকার পাওয়া মাত্রই এদের মৃত্যুপণ স্পিরিট যায় ছিপিখোলা বোতলের স্পিরিটের

মতোই একরাতের ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে। জনগণের মুক্তি প্রচেষ্টাকে এরাই তখন পাশবশক্তির প্রয়োগে রাখে চেপে।

সুতরাং সর্বব্যাপী এই পৌরুষহীনতার দিনে, মেরুদণ্ডহীনতার যুগে, কুকুরদের পা চাটার পরিবেশে এবং ডিক্টেটরদের দাপটের আওতায় নূতন কোনো ভূমিকায় অগ্রসর কোথায়? যৌবনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এইটুকু আসল,—তার জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই প্রক্ষিপ্ত। অতএব, আমাদের আজকের দিনের সবকিছু প্রয়াস সবই যেন নিয়োজিত হয় ঐ একটি পরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে—যেন আর কিছু নয়, শুধু যৌবনশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা।

'সবুজ বাংলার কথার' গোড়ার কথা এই।

অর্থনৈতিক পীড়নের দুঃসহ ক্লেশ যাদের মনে সঞ্চার করেছে কোন প্রচণ্ড ক্ষোভ—যে ক্ষোভ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহে এক একদিন আত্মপ্রকাশ করে,—নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অসাম্য ও বঞ্চনার অহমিকা, যৌবনের পথনির্দেশ তো তারাই দেবে। কোনো অনুবর্তন নয়, দম্ভ নয়, মূঢ়ের মতো মিছিলের কলরব নয়,—বুদ্ধির কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অনুপ্রেরণায় কর্মঠ জাগ্রত বাংলার যৌবনশক্তির জয়গান আমাদের। দিগ্বিজয়ের কোন্ ভূমিকা আছে? জয়গানের কোন্ মুখবন্ধ? 'সবুজ বাংলার কথা'র প্রতি সংখ্যাই বাংলার জাগ্রত সবুজ মনের জয়গানে থাকবে মুখরিত হয়ে। প্রতিসংখ্যাই নূতন পরিচয়।

রচনাপঞ্জী

উদ্বোধন সংখ্যা : ৮, আশ্বিন : ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা নয়) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

মেয়ে ধরার ফাঁদ (গল্প) ॥ কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চলন্তিকা (ফিচার)।

অমিল (গল্প) ॥ সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)

(অযাচিত মুরুব্বী, ভারতের জনস্বাস্থ্য, শ্রমিকদের দাবি, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা)

২য় সংখ্যা : ৫, কার্তিক : ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (আধুনিক বাঙালী) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

(আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি)

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য কি (প্রবন্ধ) ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নোঙর (গল্প) ॥ পরেশ বসু

(ইস্কুলের গোলযোগ, দেশীয় রাজ্যে প্রজাপ্রগতি)

চলন্তিকা (ফিচার)।

ওঁর গোঁফ (গল্প) ॥ কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)।

(পরলোকে, মুসলিম লীগ সম্মেলন, পাটকল শ্রমিক, চিত্র পরিচয়)

৩য় সংখ্যা : ১৯শে কার্তিক ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (অপ্রত্যার্পিত বাংলাদেশ) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

(বাংলার সীমানা)

ছাত্র আন্দোলন (প্রবন্ধ) ॥ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

রসের মাছি (গল্প) ॥ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নাটক ও রঙ্গালয় (প্রবন্ধ) ॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

চলন্তিকা (ফিচার)।

জন্মশাসন (গল্প) ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চিত্র পরিচয়।

৪র্থ সংখ্যা : ২৬শে কার্তিক : ১৩৪৫

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ) ॥ কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী (প্রবন্ধ) ॥ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

নায়িকার আবির্ভাব (গল্প) ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চলন্তিকা (ফিচার)।

রাণু ও স্যর বিজয়শঙ্কর (গল্প) ॥ সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

চয়নিকা (প্রবাসীর যুক্তিধারা, কবির লড়াই)।

গ্রহণের হিন্দু পৌরাণিকী (প্রবন্ধ) ॥ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)

দেশীয় রাজ্যে বিপ্লব, বর্দ্ধমানে কালী-প্রতিমার বিসর্জন, চূড়ামনি যোগ, পতিতাবৃত্তি দমন)

৫ম সংখ্যা ঃ ৩রা অগ্রহায়ণ :১৩৪৫

বাংলার কল্যাণ (প্রবন্ধ) ॥ কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চলন্তিকা (ফিচার)

পর্দার ওপিঠ (গল্প) ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাইরের জগৎ ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

(দক্ষিণ আমেরিকায় ফ্যাসিস্ট উপদ্রব, টাঙ্গানায়েকা)

রমলা মজুমদারের আত্মদর্শন (গল্প) ॥ অমৃতকুমার দত্ত

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)

(পরলোকে, ইহুদি দলন, অশ্লীল পুস্তিকা, নারী সম্মিলনী, ছাত্রধর্মঘট, বিহারী বাঙালী সঙ্কট)

৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ ১০ই অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানা) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

জাহাজের স্মৃতি (রম্যরচনা) ॥ হরেন ঘোষ

ভারতের রাষ্ট্রভাষা (প্রবন্ধ) ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চলন্তিকা (ফিচার) ।

রসভঙ্গ ।

কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্যা (প্রবন্ধ) ॥ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রয়টার (সক্ষিপ্ত সংবাদ)

(পরলোকে, হাওড়ায় বাঙালীর কারখানায় ধর্মঘট, ইঙ্গইতালী মৈত্রী, হিটলারের হুমকি, জাপান ও এশিয়া লীগ, প্রেসিডেণ্ট রজভেল্টের ঔদার্য, নারী হরণের কৃতিত্ব)

৭ম সংখ্যা ঃ ৭ই অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (বাঙালীর ব্যবসায়) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

চলন্তিকা (ফিচার) ।

কোকেন (গল্প) ॥ সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ (প্রবন্ধ) ॥ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)

(দেশীয় রাজ্যে সুমতি, অদ্ভুত পিকেটিং, ডাঃ মেঘনাদ ও এসিয়াটিক সোসাইটি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ)

সাময়িক সাহিত্য (পুস্তক সমালোচনা)

(প্রবাহ, ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫ ॥ নওজওয়ান, বিশেষ নভেম্বর সংখ্যা ॥ মন্দিরা, কার্তিক ১৩৪৫ ॥ গণশক্তি, মার্কসবাসী মাসিক পত্রিকা, নভেম্বর সংখ্যা ॥ The Behar Herald, 22nd Nov. issue)

চিত্র পরিচয়।

৮ম সংখ্যা ঃ ২৪শে অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৪৫

সম্পাদকীয় ॥ (বাংলাদেশের প্রগতির অন্তরায়) ॥ নির্মলকুমার ঘোষ

এক্স সোলজার (গল্প) ॥ সোমেন্দ্রকুমার চন্দ

চলন্তিকা (ফিচার)।

পল্লীবঙ্গের স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ) ॥ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অসমাপ্ত গল্প (গল্প) ॥ পরেশচন্দ্র বসু

রয়টার (সংক্ষিপ্ত সংবাদ)।

(পরলোকে, দিল্লীতে মুসলিম লীগের জমায়েত, বড়দলুই মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্কটমোচন, ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি, শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বিরুদ্ধতা, কৃষক আন্দেলেনে বিরাগ, প্রজাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া, পাটচাষের ক্ষতির সম্ভাবনা)

সাময়িক পত্রিকা ॥ (পুস্তক সমালোচনা)

(প্রবর্তক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ॥ The Indian Journal of Education Nov. 1938 ॥ Independent India, weekly ॥ National Front, 27th Nov. Bombay ॥ The Congress Socialist, Nov. 27th Bombay ॥ সোনার বাংলা, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)

॥ গ ॥ প্রতিরোধ ও সোমেন চন্দ

'মাসিক বাংলাদেশ' পত্রিকায় শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত "ঢাকায় একটি সাহিত্যপত্র প্রতিরোধ" শীর্ষক যে নিবন্ধ রচনা করেন সেটি উদ্ধৃত হল :

'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। মলাটে লেখা ছিল 'মার্ক্সবাদী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্যের পাক্ষিক পত্র'। দাম এক আনা, বার্ষিক সডাক দেড় টাকা। পত্রিকাটি ছিল ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র। প্রথম দু'বছর সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী। পরে সম্পাদক হয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত ও অজিতকুমার গুহ। দেশ বিভাগের পরেও অজিতকুমার গুহ ও রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকায় থেকে যান এবং উভয়েই পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অজিতকুমার গুহ প্রথমে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। আয়ুবের আমলে এক সময় রবীন্দ্র সাহিত্যকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। অন্তত কিছু কালের জন্যে হলেও, এই বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ প্রচার করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি, পূর্ববঙ্গের বৃহৎ মুসলিম সমাজের কাছে অতএব গ্রহণযোগ্য নয়। এক সময় সৈয়দ আলী আহসানের মতো সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীও এই ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন, যদিও অল্পকাল পরেই তিনি নিজেই নিজের ভ্রম সংশোধন করে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র বিরোধিতার এই পর্বে রণেশ দাশগুপ্ত, অজিতকুমার গুহ, মুনির চৌধুরী, আলাউদ্দীন আল আজাদ এবং আরো বেশ কয়েকজন তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই বিভ্রান্তির কুয়াশাকে দূর করবার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠায় আস্তে আস্তে কুয়াশা দূর হয়ে মিলিয়ে গেল; রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। বলা বাহুল্য, অজিতকুমার গুহ, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী প্রভৃতি 'প্রতিরোধ' পত্রিকা ও ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এঁদের লেখাও 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অজিতকুমার গুহ আকস্মিকভাবে ১৯৭০ সনে মারা যান। মুনীর চৌধুরী নিহত হন ইয়াহিয়া খানের সৈন্য ও অনুচরদের হাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব মুহূর্তে। রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে এখনও অক্লান্তভাবে জড়িত, তরুণতর লেখক ও ছাত্র সমাজের কাছে তিনি সুপরিচিত।

পত্রিকা জগতে পূর্ববঙ্গে 'প্রতিরোধ' পাক্ষিক পত্রটির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করতে গিয়েই এইসব বহু পরবর্তী ঘটনাগুলোর কথাও অনিবার্যভাবেই এসে যায়। কেননা, প্রগতিশীল আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'প্রতিরোধ' যে ধ্যানধারণার সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব তখনকার তরুণ মুসলিম ছাত্রসমাজেও অনুভূত হয়। বেশ কিছু শক্তিমান তরুণ লেখক এই সময় থেকেই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক হন। পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই এই সময় হয় সাম্প্রদায়িক নয়তো স্থিতাবস্থার সমর্থক মনোভাবের পরিচয় দিতে শুরু করেছিল। এই সময় মাথা ঠিক রেখে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু মুসলিম তরুণ লেখকরাই লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার প্রসাররোধে এগিয়ে এসেছিলেন।

'প্রতিরোধ' যখন প্রকাশিত হল তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দারুণ বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। সারা দেশে ব্ল্যাক আউট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে ঢাকা শহরে, সর্বত্র দুর্ভিক্ষের ছায়া। 'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১ম সংখ্যার শুরুতেই যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল।

এখনকার পরিস্থিতিটা এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হতে পারে:

"অনেকখানি সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে আমরা দ্বি-সাপ্তাহিক 'প্রতিরোধ' জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করছি। বিস্তর অর্বাচীন সাময়িকপত্রে ভারাক্রান্ত বাংলা সাহিত্যে 'প্রতিরোধ'-এর আকস্মিক আবির্ভাবকে অনেকেই আরও একটা নতুন উৎপাত বলে মনে করতে পারেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা ভীষণ সংকটের মুখে এ রকম প্রচেষ্টা তাদের কাছে

অপচয়েরই সামিল। কিন্তু জীবনযাত্রা আজকে সংকটের মুখে বলেই আমাদের এই প্রচেষ্টার দরকার আছে বলে আমি দাবি করতে চাই।

'...আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আবার আজকে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে যুদ্ধ। ধীরে সুস্থে লাভ লোকসানের কথা বিচার করে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর দিন আজকে নয়। আজকের পদ্ধতি হল 'ব্লীজক্রিগ' উৎগতি। কাজেই যখন আমরা জানলাম, জাপ যুদ্ধ আরম্ভের পরে এক এক করে তিন চারটে মাস কেটে গেল, তবু প্রকাশমান সাহিত্য সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে মানবতাকে পরিহার করার চেষ্টা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে; সংস্কৃতিধ্বংসী জাতীয়তাবাদকে রুখবার জন্য না আছে সত্যকারের সমরকালীন দায়িত্ব পালনের চেষ্টা, না আছে হতভম্ব বুদ্ধিজীবী এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা সহজ অনুপ্রেরণা সৃষ্টির পরিকল্পনা, তখন হঠাৎ একটা গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া আর আমরা কোনো উপায়ন্তর দেখতে পেলাম না।...ক্ষমতা আমাদের সীমাবদ্ধ তাও জানি। তা সত্ত্বেও এ কথাটা অবহেলা করতে পারলাম না যে, আমরা এমন এক সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করেছি যা শ্রেণীসংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর ভাবী সভ্যতা সৃষ্টি করবার ভার নিয়েছে যে শোষিত জনসাধারণ, তার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে অভিন্নগতি হয়েই শুধু সার্থকতা অর্জন করতে পারে।...পুরানো সাহিত্যিক ভাবছেন, অবসর-বিনোদনের খোরাক সরবরাহই যাদের কাজ ছিল, তাদের আজকে বসে থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমরা প্রগতিশীল সাহিত্যকরাও কি তাই ভাবতে পারি? কখনোই না; নতুন সভ্যতার জন্য অবশ্যম্ভাবী যে সংগ্রাম, আমরা তো চিরদিনই তাকে আহ্বান করে এসেছি। ...নতুন টেকনিক আমাদের বার করতে হবে, নতুন ভাষা আমাদের শিখে নিতে হবে। তবু অটল বিশ্বাস বুকে নিয়ে 'প্রতিরোধ' আজ এগিয়ে এল আপনাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে।"

'প্রতিরোধ' পত্রিকার কার্যালয় ছিল ঢাকায় তখনকার ২১ নং কোর্ট হাউস স্ট্রীট—এই ঠিকানায়। এই দ্বিতল বাড়িতে সে সময় ছিল মেসবাড়ী। অর্থাৎ, গ্রামের বাড়ীতে পরিবার ও প্রিয়জনকে রেখে ঢাকা শহরে এসে যাঁরা আপিস করতেন তাঁরা থাকতেন এই বাড়ীতে। 'প্রতিরোধ'-এর অন্যতম সম্পাদক অচ্যুত গোস্বামীও থাকতেন এই বাড়ীতে। তাঁর ঘরেই ছিল 'প্রতিরোধ'-এর আপিস ও আড্ডা। প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকও মাঝে মাঝে এই ঘরেই হত। এই সময় ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের একটি আপিসও ছিল ১নং জি

ঘোষের লেন, এই ঠিকানায়। ত্রিতল এই বাড়ির নিচের তলায় ছিল প্রতিরোধ পাবলিশার্স, প্রগতিশীল বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র। সোমেন চন্দের শোকাবহ মৃত্যুর পর প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প', ডিসেম্বর ১৯৪২ সনে। তেতলার একটি ঘরে ছিল প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয়, লেখকদের সভা সমিতির কাজ এইখানেই হত।

'প্রতিরোধ' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সোমেন চন্দের গল্প 'দাঙ্গা'। গল্পের শেষে ফুটনোটের মন্তব্যটি উল্লেখ্য : "লেখক আর আমাদের মধ্যে নেই। ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে যোগদানের পথে তিনি গুণ্ডাহস্তে নিহত হয়েছেন। নতুন এবং আরও নতুন লেখার আশা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছে। লেখকের ফেলে রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই গল্পটি পেয়ে গেলাম, এ আমাদের সৌভাগ্য। সোভিয়েত অনুরাগী মার্কসপন্থী লেখকের চিত্ত যে ভারতের সমস্যায় কত গভীরভাবে আলোড়িত ছিল, এই লেখা তার প্রমাণ।" (প্রতিরোধ, ১লা আষাঢ় ১৩৪৯, পৃঃ ৯) এই সংখ্যায় দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও মণীন্দ্র রায়। এছাড়া এই সংখ্যায়ই ছিল শহীদ সোমেন চন্দকে নিবেদিত 'প্রাচীর' কবিতাসংকলনের আলোচনা। এই সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে ৫-এ, ইন্দ্র রায় রোড, কলকাতা থেকে। ভাবতে অবাক লাগে সোমেন চন্দের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সংগ্রামবিমুখ কবিও সে সময় একটি উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী কবিতা লিখেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে ঐ কবিতার নিচের স্তবকটি উল্লেখ করা যায় :

রাজপথে স্তূপীকৃত গ্রন্থাবলী দিয়ে সাজায়ে নারকী চিতা সভ্যতার
শবদাহ করে,
ধ্বংস করে বিদ্যালয়, বিদ্যার্থীর
রক্তে করে স্নান।
যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁরা মহাপ্রাণ
কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা
জ্ঞানী যাঁরা,

অরাজক অন্ধকারে একমাত্র
আলোর ইশারা,
অত্যাচারে অপমানে নির্বাসনে
রক্ত চক্ষু শাসনে ত্রাসনে
তাঁদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত।

এবং কবি উদ্দীপিত ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছিলেন:

পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে রেখাবে
আজ হোক উদ্দীপিত।

আমার কবিতা।

গোড়া থেকেই প্রতিরোধ পত্রিকার চেষ্টা ছিল সারা বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন লেখকসমাজকে দেশের দুর্দিনে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এই কারণে সম্পাদকরা কলকতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। ফলে তখনকার বিশুদ্ধ শিল্পের সমর্থক অনেক লেখকও সমাজমুখী তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক রচনাসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র ছিল 'প্রতিরোধ' পত্রিকা। ১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের একটি বর্ধিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই অধিবেশনে পঠিত সম্পাদকের রিপোর্ট প্রতিরোধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রিপোর্ট থেকে নিচে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হল তা থেকে প্রগতি লেখক সংঘের ঐ সময়ের কার্যধারার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়:

"...প্রথম আমাদের কাজ শুধু রবিবাসরীয় সাহিত্যিক আড্ডা জমানোতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাই আমাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল। 'প্রগতি সাহিত্যের মর্মকথা' নামে প্রগতি সাহিত্য বিশ্লেষণ করে একটি পুস্তিকাও আমরা এই সময় প্রকাশ করি। তারপর ১৯৪০-এ আমরা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সংঘের প্রায় ২০ জন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করি। কিন্তু এই প্রকাশের পর অনতিবিলম্বেই বাংলার সুধীসমাজ যে পরিমাণ সমাদরের সঙ্গে বইখানা গ্রহণ করলেন, তাতে আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহ দুই-ই ছেড়ে গেল। বই প্রকাশ ছাড়াও আমরা

কয়েকবার আব্দুল ওদুদ সাহেব, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের সভাপতিত্বে এই ধরনের বর্ধিয়াতন বৈঠকে ঢাকার সুধী-সমাজকে আকর্ষণ করে আমাদের এই আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছি। এই যাবতীয় প্রচেষ্টার ভিতরেই প্রগতি লেখক সংঘ তার একটা দৃঢ় বিশ্বাসকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে। সেটা হল এই বিশ্বাস যে, সাহিত্য এবং শিল্প মাত্রই কেবল সমাজকে কেন্দ্র করেই ফুলে-ফলে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এতখানি আনন্দের খোরাক হিসাবে দেখা দেয়। এবং সর্বযুগের সাহিত্যের এবং শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি এই সমাজ-কেন্দ্রীকতাকে স্বীকার করে, সমাজের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অত্যাচার এবং অগ্রগতির জন্য নিরঙ্কুশভাবে তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে আমরা, আজকের দিনে প্রগতি লেখকরা, এই কথাই বলতে চেয়েছি, যে সমাজকে অবলম্বন করে আমাদের সাহিত্য বা শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তার মধ্যে সেই সমাজের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাকে রূপ দিতে পারি।"

প্রতিরোধ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটিতে যাঁরা নিয়মিত লিখতেন তাঁদের নামের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখক তালিকায় ছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুণ কবীর, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বীরেন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, রণেশকুমার দাশগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণকুমার স্যান্যাল, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ। এঁদের মধ্যে দু চারজন ছাড়া বাকী সবাই 'প্রতিরোধ'-এর কোন না কোন সংখ্যায় লিখেছিলেন। সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল প্রতিরোধ পত্রিকার ১৯৪২ সনের অক্টোবর (শারদীয়) সংখ্যাটি। উপরে উদ্ধৃত লেখকদের অধিকাংশের রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল নবেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প এবং জীবনানন্দ দাশের দীর্ঘ কবিতা।

প্রথম বছরটি 'প্রতিরোধ' পত্রিকার অপ্রতিহত অভিযানের সময় বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বছরে এলো ১৯৫০ -এর সর্বগ্রাসী মন্বন্তর। মিল থেকে আর কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের ক্ষেত্রে তেমনি

সংস্কৃতির জগতেও মজুতদার ও চোরাকারবারীদের কালো হাতের ছায়া সর্বত্র। মিলের তৈরী কাগজের পরিবর্তে হাতে তৈরী দেশী কাগজে অতএব 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হল। ১৩৫০ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাটি এই রকম কাগজেই ছাপা হল। ছাপা ও কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে যে সামান্য ক'টি স্থানীয় বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত তা দিয়ে কাগজের প্রকাশ অব্যাহত রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় যিনি প্রায় এক বছরের জন্য পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন মঞ্জুর করে 'প্রতিরোধ'-কে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে ছিলেন তিনি প্রভু গুহঠাকুরতা, ভারতীয় চা সংস্থার তখনকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, প্রভু গুহঠাকুরতা নিজেও সুশিক্ষিত ও অভিজাত লেখক ছিলেন, তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'এ ও তা' সেই সময় বহু পঠিত ছিল।

'প্রতিরোধ'-এর একটি বিশেষ সাফল্য এই যে তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজকে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় এই পত্রিকাটি অনেক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। যুদ্ধের বছরগুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঢাকা শহরে একটি ব্যাধির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৎসত্ত্বেও প্রতিরোধের পরিবেশে হিন্দু-মুসলিম তরুণদের একটি আদর্শগত ঐক্য ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এই সময় থেকেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন গুণী মুসলিম ছাত্র প্রগতি লেখক সংঘ ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সানাউল হক, মুনীর চৌধুরী, মহম্মদ শফীউল্লাহ, ফজলুল করিম, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দিন এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। এঁদের অনেকেই এখন বাংলাদেশের যথাযোগ্য স্থানে বিভিন্ন পদমর্যাদায় আসীন। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০-এর একটি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে 'প্রতিরোধ'কে মাসিকে রূপান্তরিত করে বের করা হবে। ঐ বছরের আষাঢ় মাস থেকে 'প্রতিরোধ' মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৩৫০-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের সোমেন স্মৃতি সংখ্যাটি। 'স্মরণের গ্রন্থি' এই পর্যায়ে সোমেনের সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের নানা দিকের আলোচনা এই সংখ্যায় করেছিলেন সোমেনের সহকর্মী ও বিশিষ্ট কয়েকজন লেখক। যিনি সোমেনের লেখার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন এই সংখ্যাটির রচনাগুলো তাঁকে সোমেন-সাহিত্য বুঝতে সাহায্য করবে।

'প্রতিরোধ' শেষের দিকে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ছাপা এবং কাগজ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং ঢাকা শহরে দাঙ্গার ব্যাপারটা ঐ সময় একটা নিয়মিত ব্যাপার হওয়ায় প্রগতি লেখক সংঘের লেখকরাও বিভিন্ন

এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, এর জন্যে লেখকদের দারুণ ঝুঁকিও নিতে হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যার পর ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর তাঁতিবাজার অঞ্চলের বাড়ীর সামনে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথায় ভোজালীর কোপ লাগে। সৌভাগের বিষয় আঘাত গুরুতর হয় নি এবং হাসপাতালে ঠিকমত চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন সেই দিনই বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মুসোলিনীর পতনের খবর ব্যানার হেডিং-এ ছাপা হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত মোটামুটি দু'বছর 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭-এ 'প্রতিরোধ' বন্ধ হবার পর 'ক্রান্তি' নামের বার্ষিকী সংঘের লেখকরাই প্রকাশ করেছিলেন। 'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রকাশের মূলে ছিল সোমেন চন্দের সাহিত্যের আদর্শগত প্রেরণা এবং যে উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ সর্বগ্রাসী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষয়কারী পরিবেশে একটি নতুন সুস্থ জীবনের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া; তা অন্ততঃ অংশত সফল হয়েছিল বলা যেতে পারে। কলকাতা থেকে 'অরণি' (যার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার), 'পরিচয়', 'অগ্রণী' এবং আরো কোন কোন পত্রিকাও ঐ সময়ে প্রগতি সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করেছিল : ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' পত্রিকাকে স্বতন্ত্র করে দেখা দরকার, কারণ কলকাতার বাইরে সে সময়কার শ্বাসরোধকারী পরিবেশে সম্ভাব্য আর কোন পত্রপত্রিকা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই ধরনের আন্দোলন অব্যাহতভাবে অন্তত কিছুকালের জন্যেও চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই।

পরিশিষ্ট—২

॥ ক ॥ সোবিয়েৎ সুহৃৎ সমিতি

১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোবিয়েৎ আক্রান্ত হবার পর এদেশে সোবিয়েৎ সুহৃদ সমিতি গড়ে ওঠে। সোমেন চন্দও ঢাকায় সোবিয়েৎ সুহৃদ সমিতির নিরবচ্ছিন্ন কর্মী ছিলেন। এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রদত্ত হল।

স্নেহাংশু আচার্যের প্রবন্ধ

সোভিয়েট জার্মান যুদ্ধ শুরু হবার অল্প কিছুদিন পরেই কলকাতায় প্রথম সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি স্থাপন করা হয়। তারপর প্রায় দু বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সমিতি যে কেবল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে তা নয়, সিংহলে পর্যন্ত এর শাখা গড়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পাক্ষিক 'ইন্দো-সোভিয়েট জার্নাল' চীন দেশেও প্রচারিত হয়েছে।

বাংলায় প্রায় প্রত্যেক জেলাতে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির শাখা আছে। সর্বত্র অবশ্য কাজ সমান ভাল হয় না। কিন্তু কোন কোন জেলায় ছোট ছোট গ্রামে পর্যন্ত সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

রুশ বিপ্লবের পর কিছুকাল বিপ্লব সম্বন্ধে গালাগালি ছাড়া আর কিছু বাইরের জগতে পৌছুতে দেওয়া হয়না। পাছে সোভিয়েট সম্বন্ধে খবর জানতে পেরে সব দেশের জনসাধারণ জেগে ওঠে, সোভিয়েট আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে সর্বত্র শোষণ ব্যবস্থাকে ভেঙে যথার্থ স্বাধীনতার বনিয়াদ স্থাপন করে, এই ভয়ে সোভিয়েট সম্বন্ধে কুৎসা ছাড়া অন্য খবর বাইরে যেতে দেওয়া হত না।

কিন্তু শীঘ্রই নিজের শক্তিতে সোভিয়েট যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করল, তাতে কিছুতেই আর সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহকে চেপে রাখা গেল না। দুনিয়ার সর্বত্র মজুর কিষাণ আন্দোলন

অবশ্য জানত যে সোভিয়েটই সভ্যতার ভরসা, সোভিয়েটই প্রকৃত মুক্তির আলো দেখিয়ে পৃথিবীর লোককে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধনিক শক্তিগুলির একান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সব দেশের মজুর কিষাণদের সোভিয়েট প্রীতি কখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু এখন শুধু মজুর কিষাণ নয়, বুদ্ধিজীবী যারা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা দেখলেন যে জগতের সর্বত্র যখন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃতি আসছে, যখন ধনিকতন্ত্র একেবারে জঘন্য ফ্যাসীবাদে পরিণত হচ্ছে, যখন নাগরিকদের অধিকার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, যুদ্ধের আয়োজন বিকট থেকে বিকটতর হয়ে উঠেছে, তখন ভবিষ্যতের ভরসা দেয় একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর ২৫ বৎসর ধরে সোভিয়েট যে আদর্শ স্থাপন করেছে, সে আদর্শে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা প্রগতিবাদী, তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। তাঁরা আরও দেখলেন যে সোভিয়েট ছাড়া অন্য সব দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে, আর সোভিয়েট সংস্কৃতি ব্যাপারে এমন অসাধারণ বিকাশ ঘটেছে যার তুলনা ইতিহাসে নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়ায় গিয়ে বললেন যে সেখানকার মহাযজ্ঞ না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সেদিন পর্যন্ত যারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত, তারা আজ বিরাট মহারথী।

সোভিয়েটে সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাতে যে অপূর্ব প্রগতি দেখা গেছে, তাতে বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই বেশী আকৃষ্ট হতে লাগলেন। জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হলে সমাজ যে কত অগ্রসর হতে পারে, তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়না কেন?

সোভিয়েট জার্মান যুদ্ধের পর সোভিয়েটের রণ-কৌশল ও অদম্য মনোবল দেখে দুনিয়া যেন চমকে গেল। তখন বুদ্ধিজীবীরা আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় এগিয়ে এলেন সোভিয়েটের প্রতি তাঁদের অনুরাগের কথা প্রচার করতে, সোভিয়েটের আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে তাঁরা মেনে নিলেন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ৭৫ জন বিখ্যাত লেখক, শিল্পী ও অধ্যাপকের স্বাক্ষর সম্বলিত বিবৃতি প্রচার করি। আজ বুদ্ধিজীবী মহলে যেখানেই সোভিয়েটের নাম নিয়ে যাওয়া যায়, সেখানেই আমরা সুফল পাই,

সমিতির কাজে যোগ দেবেন এ আশ্বাস প্রায় সকলেই অসঙ্কোচে দিয়ে থাকেন।

আমাদের দেশের ছাত্রেরা চিরকাল প্রগতিকামী। সংঘবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন যতদিন হয়েছে, ততদিনই আমাদের ছাত্রসমাজ সোভিয়েটকে প্রগতির পথে বিশ্বের নেতা বলে মেনেছে। তাই ছাত্রমহলে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির কাজ ভাল চলা খুব স্বাভাবিক। গত বৎসর আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের নামে যে 'সংগ্রাম' আরম্ভ হয়, তখন পঞ্চমবাহিনী চেষ্টা করে সোভিয়েট সম্বন্ধে অপবাদ বিস্তার করতে। কিন্তু 'সংগ্রাম' যখন জোর কদমে চলেছে, সোভিয়েট সম্বন্ধে নানা কুৎসা যখন পঞ্চমবাহিনী রটাচ্ছে, তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির সভা হয়। বহু অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত হন। কয়েকজন কুচক্রীর অপচেষ্টা সত্বেও সভা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সোভিয়েটের নাম নিয়ে গেলে ছাত্রসমাজে যে আমাদের অবারিত দ্বার, এ ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত। ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সহযোগিতা আরও নিয়মিত হলে ছাত্রমহলে সমিতি আজকের চেয়ে সহজেই অনেক বেশী জনপ্রিয় হবে।

আমাদের মেয়েরা সম্প্রতি দেশের কাজে এগিয়ে আসছেন। ফ্যাসিজম যে কি তা তাঁরা সহজেই বোঝেন। হিটলারের হুকুমে যে মেয়েরা রান্না করবে, গির্জ্জায় গিয়ে ভগবানের নাম করবে আর ছোট ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবে, ব্যাস! এছাড়া কোন কাজ মেয়েদের নেই। গোয়েরিং আরও বলেছে যে পুরুষ যখন যুদ্ধ বিগ্রহ করে এসে বিশ্রাম করবে, তখন তার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করা হচ্ছে মেয়েদের একটা বড় কর্তব্য। 'পতি পরম গুরু' এ উপদেশ যে মেয়েরা হরদম শোনে, পর্দ্দার পিছনে এখনও যারা আটকে রয়েছে, তারা ফ্যাসিজম এদেশে এলে কি অবস্থা ঘটবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারে। এই মেয়েরা যখন সোভিয়েটের কথা শোনে—সেখানকার মেয়েরা কি অপূর্ব স্বাধীনতা পেয়েছে, কি অদ্ভুত নিষ্ঠা, তারা দেশের কাজে আপ্রাণ পরিশ্রম করছে, এসব খবর যখন তারা পায় তখন যেন তাদের চোখের অনেকগুলো পর্দা খুলে যায়। সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির কাজ তাই মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী হওয়া উচিত। এদিকে মহিলা সমিতিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মজুর কৃষাণদের কথা সব শেষে বলব। দেশের প্রাণ হচ্ছে তারা।

দেশের নেতা আজ সত্যই তারা। সোভিয়েটের যথার্থ বন্ধুও হচ্ছে তারা। কখনও তারা সোভিয়েটের কুৎসা শুনে পথভ্রষ্ট হয়নি। অনেক ভদ্রলোকের অপচেষ্টা সত্ত্বেও তারা সোভিয়েটকে ভুল বোঝেনি। সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি শ্রমিকদের নিয়ে কয়েকটি আলোচনা সভা করেছে। ডোমারে কৃষকসভার অধিবেশনের সময় সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতিও একটা সভার ব্যবস্থা করে, বহু কৃষক সেখানে আসেন। শ্রমিকদের মধ্যে সোভিয়েট সম্বন্ধে নতুন খবর জানাবার স্পৃহা সত্যই অদম্য, কিন্তু লজ্জার বিষয় যে আমরা এদিকে খুব বেশী অগ্রসর হতে এখনও পারিনি। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের যাঁরা নেতা তাঁদেরও এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সঙ্গে একযোগে সহজ ভাষায় দেশের জনসাধারণের কাছে সোভিয়েট সংবাদ পৌঁছে দেবার ভার তাদের নিতেই হবে।

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতিকে শুধু একটা বিদ্যাবিলাসীদের আড্ডাখানা মনে করা হবে মারাত্মক ভুল। আমাদের দেশে যে যেখানে প্রগতীকামী আছেন, আজ তাঁদের সমিতিকে সাহায্য করে তার কাজের উপযুক্ত করে তোলা একটা প্রধান কর্তব্য। [জনযুদ্ধ/২৮.৪.'৪৩]

॥ খ ॥ সোভিয়েট সুহৃৎ আন্দোলন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত বছর ২২শে জুন তারিখে যখন হঠাৎ হিটলারের হুকুমে নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করল, তখন কেমন করে সোভিয়েটকে সাহায্য করা যায়, এই হল আমাদের প্রধান চিন্তা। চিরকাল বড়লোকেরা যাদের দাবিয়ে রেখেছে আর জীবনে যা কিছু ভাল তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে সেই চাষী মজুরের দল সোভিয়েট দেশে নতুন সভ্যতার ইমারত মজবুত করে গড়ে তুলেছে দেখে মালিকদের যে গাত্রদাহ হবে তা স্বাভাবিক। তাই বহুদিন থেকে সোভিয়েট ধ্বংসের স্বপ্ন তারা দেখে এসেছে, হিটলারকে এই কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছে। এর আগে হিটলার তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারেনি; লাল ফৌজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামার দুঃসাহস হিটলারের

তখনও হয়নি। গত বছর পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করে উদ্ধত হিটলার বুঝল যে সারা দুনিয়ায় তার জয়ধ্বনি ওড়াতে হলে সোভিয়েটকে ধ্বংস না করলেই নয়। এ আশাও ছিল যে ব্রিটেন আর আমেরিকাও এ কাজে বাধা দেবে না, বরং সাহায্য করবে। তাই হঠাৎ একদিন সোভিয়েট সীমান্তে দেড় হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে জলে, স্থলে, আকাশে এমন যুদ্ধ বাধল, যার তুলনা ইতিহাসে নেই। অবশ্য ব্রিটেন আমেরিকার সাহায্য সম্বন্ধে হিট্‌লারের আশা পূর্ণ হয়নি।

আমাদের সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠল তখন সোভিয়েটকে সাহায্য করার চিন্তা। দুনিয়ার চাষী-মজুর জানে সোভিয়েট তার বন্ধু, সোভিয়েট দেশ তারই দেশ, সেখানে মালিক-মজুর, জমিদার-চাষী সম্পর্ক নিয়ে সব মানুষ মানুষের অধিকার পেয়েছে। শুধু চাষী-মজুর নয়, নানা দেশের কবি, শিল্পী, লেখক, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক, সোভিয়েটের কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়েছে, যারা ছিল গরীব, তুচ্ছ, হেয়, তাদের মধ্যে প্রাণের নতুন স্পন্দন দেখে মুগ্ধ হয়েছে। আর সকল দেশে যারা স্বাধীনতার জন্য লড়েছে তারা সাম্যবাদী হোক বা না হোক অন্ততঃ এটা পরিষ্কার বুঝেছে যে জগতে মাত্র একটা রাষ্ট্র আছে যা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার সত্যই মানে বলে সকলের মুক্তির জন্য সব রকমের সাহায্য করতে তৈরী; স্পেনে, চীনে এর প্রমাণ স্পষ্টই পাওয়া গেছে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আরম্ভ

সোভিয়েট সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। সোভিয়েট দেশে যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণও এদেশে পাওয়া শক্ত। অনেক ভাল বই সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু সরকারী নেক নজরের দরুণ সেগুলো প্রায় এদেশে পৌছায় না। এ অবস্থায় সোভিয়েটের প্রতি অনেকেরই যে অহেতুক বিদ্বেষ আছে, তা দূর করা শক্ত হয়। আজকে দুনিয়াতে সোভিয়েটের স্থান সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যও ভালো করে চালানো যায় না সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা কি শিক্ষা, কি উদ্দীপনা পেতে পারি, তা সবাইকে বোঝান যায় না। সোভিয়েটকে সাহায্য করতে পারলে আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনও কতকটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে, তা অনেকে ধরতে পারেন না।

সোভিয়েটকে ছেড়ে আমরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারব ভেবে আমরা কয়েকজন দেশের সর্বত্র সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি গঠন করার চেষ্টায় লাগি। নাৎসী আক্রমণের প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কা যখন চলছিল, তখন অনেকে আমাদের এ চেষ্টা নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন। হয়তো আমাদের এ কর্তাভজার দেশে হিটলার মুসোলিনির ভক্তের অভাব নেই। নিজেদের তাগদ কম বলে সবচেয়ে দুর্দান্ত যে গুণ্ডা, তাকেও সমীহ করার লোক অনেকে এদেশে আছেন। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বললেন যে জার্মানীর কাছে বলশেভিকরা দাঁড়াতেই পারবে না। তবে তারা এখন একটু ভগবানের নাম করে দেখতে পাবে ফল হয় কিনা! কিছুদিন ভদ্রসমাজের মনোভাব এমন ছিল যে দমে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সোভিয়েটপক্ষীয় প্রচারকার্য্য সহজে বরদাস্ত করতে রাজী হয়নি। সুখের বিষয় উদ্যোগীরা দমে না গিয়ে কাজ করে চললেন। অধিকাংশ সাংবাদিক আশ্বাস দিলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি তাঁরা ছাপবেন। আর ক্রমেই সোভিয়েটের সতেজ প্রতিরোধ দেখে অনেকের চোখ ফুটতে লাগল।

শ্রমিক ও ছাত্রেরাই প্রেরণা দিল

২১শে জুলাই তারিখে কলকাতার টাউন হলে 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়েছিল। সব শ্রেণীর লোকই সভায় যোগ দিয়েছিলেন, সত্যেন মজুমদার ছিলেন সভাপতি। বহুদিন বাদে শহরের রাস্তা দিয়ে শ্রমিক ও ছাত্রদের বড় বড় মিছিল বেরিয়েছিল, তারা আমায় সভাস্থলে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এই সভায় স্থির হয় যে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি গঠন করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হবে। কমিটির কর্ণধার হলেন ডক্টর ভূপেন দত্ত, আর সম্পাদক হলেন হীরেণ মুখার্জী ও স্নেহাংশু আচার্য, কমিটিতে ছিলেন দেশের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অধ্যাপনা, রাজনীতি, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি সব শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে ঐক্যসূত্র ছিল, সোভিয়েটের প্রতি সম্প্রীতি আর সোভিয়েট সভ্যতা যে পৃথিবীতে আমার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে এই বিশ্বাস ছিল।

বাংলার মনীষীদের সমর্থন

ইতিমধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, যামিনী রায় প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতির নায়কদের স্বাক্ষর নিয়ে একটি বিবৃতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েট সভ্যতার তাৎপর্য্য আর যুদ্ধে সর্বপ্রকারে সোভিয়েটকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি এঁরা দেশকে জানান। ভারতবর্ষের সর্বত্র এই বিবৃতি নিয়ে সাড়া পড়ে যায়।

তারপর সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দুতে ছোটবড় বই আর ইস্তাহার বার করা হয়েছে। ইংরেজীতে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল, দেশের নানা ভাষায় তার অনুবাদ সম্পূর্ণ ও (আংশিক) বেরিয়েছে। লেখকরা সবাই পুরোপুরি মার্কসবাদী না হলেও সোভিয়েটের বন্ধু; এঁদের একত্র করাই সমিতির সাফল্য। সোভিয়েটে এ দেশ থেকে যে টাকা পাঠান হয়েছে, তার প্রথম কিস্তি গিয়েছিল সমিতির সভা চিরঞ্জীলাল মারফৎ। তারপর নানা উপলক্ষ্যে আরও কিছু টাকা গিয়েছে, মলোটভ, আর মাইস্কির কাছে তার পাঠানো হয়েছে—কিন্তু এসব নিয়ে কাগজ গরম করার চেয়ে সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালানোই আমরা বেশী জরুরী মনে করে এসেছি। এতে যে কিছু কুৎসা আমাদের শুনতে হয়নি তা নয়; কিন্তু যারা "Prespective dynamism Soviet aid" সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিয়ে কাগজে নাম জাহির করেই তাঁদের কুৎসায় সমিতির ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় নি।

নিখিল ভারত কনফারেন্স

নভেম্বর মাসে কমিটির উদ্যোগে নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃৎ সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান করা হয়। ৭ই থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অনেক জায়গায় সভাসমিতি হয়, শোভাযাত্রা আর পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। কনফারেন্স হয় ১৬ই তারিখে, পঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি মিঞা ইফতিকার উদ্দিনের নেতৃত্বে কনফারেন্স শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, রাধাকৃষ্ণণ, অধ্যাপক কোশাম্বি, অধ্যাপক কে, টি, শাহ, অধ্যাপক ধ্যানচাঁদ প্রভৃতির বাণী পাঠ করা হয়। সম্মেলনের সাফল্য হয়েছিল আশাতিরিক্ত; সোভিয়েটকে উদ্দেশ্য করে

যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা ছাড়া আর একটি প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এ প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য সাহায্যে চেয়ে যায় ষ্টাফোর্ড ক্রীপস (তখন মস্কোয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত) এবং হাউস অব লর্ডস্ ও কমন্সের কয়েকজন প্রগতিবাদী সভ্যের কাছে তার পাঠান হয়। ঐ তারগুলির মাশুল যথারীতি দেওয়া হলেও যথাস্থানে পৌঁছেছিল কিনা জানা নেই। অন্ততঃ কারুর কাছেই কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।

কনফারেন্সে সারা দেশে সমিতির কাজ চালানোর জন্য একটি কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল। কয়েকটি প্রদেশে এবং সিংহলেও সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এখনও সব প্রদেশে সমিতি গড়ে ওঠেনি বলে প্রধান কাজ প্রাদেশিক ভিত্তিতেই হচ্ছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই অল্ ইণ্ডিয়া কমিটির কাজও আশানুরূপ চল্‌বে।

বাঙলাদেশে সমিতির সম্পাদক হন্ জ্যোতি বসু। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। ২৪-পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, খুলনা, নোয়াখালি—এই কটা জেলার সঙ্গে প্রাদেশিক সমিতির নিয়মিত যোগ আছে। যশোর, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও নদীয়াতেও জেলা সমিতি গঠিত হয়েছে। কলকাতা শহরে আবার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব্ব এলাকায় কাজের সুবিধার জন্য আলাদা কমিটি আছে।

সোভিয়েট সম্বন্ধে প্রচার ছাড়া গত ছ'মাস ধরে বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এই সম্পর্কে হুগলী, খুলনা ও অন্যান্য জেলায় আমাদের কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। সরকারী দমননীতির ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা ঘটেছিল যে ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করার কোন সংস্থাই ছিল না—সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি ছাড়া আর সমিতি সরকারের বিরাগভাজন হয়েই চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে সমিতির পক্ষে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন করা যদি কারও কাছে অযৌক্তিক লাগে তো স্মরণ করতে হয় যে এখন পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যাতে ফ্যাসিস্টদের বিষদাঁত ভাঙতে পারলেই সোভিয়েটকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করা যায়।

সকলকে সমিতির মধ্যে আনো

সমিতির কাজ আর বিস্তার তাই আজ সুদূরবিস্তারী হয়ে পড়েছে। খানিকটা এর ফলেই দেখা গেছে যে যাঁদের রাজনৈতিক চেতনা খুবই জাগ্রত, তাঁরাই কেবল সমিতির কাজে লেগে আছেন—অনেকে শুধু নামে কমিটিতে আছেন, কাজে তাঁদের বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই সোভিয়েট সুহৃদ সমিতিকে খুব ব্যাপক করে গড়া হয়েছে—যাঁরা সাধারণতঃ রাজনীতির ধার ধারেন না, কিন্তু সোভিয়েটের সাফল্য সম্বন্ধে জোর গলায় বাহবা দিতে সঙ্কোচ করেন না তাঁদেরই তাই আজ এগিয়ে আসতে হবে। যারা ট্রেড্ ইউনিয়ন বা কৃষক সমিতি বা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হন্ তো একেবারেই যথেষ্ঠ নয়। সকলেই অবশ্য কর্মী নন্। সভাসমিতি অনেকের ধাতে সয় না, বিপ্লবী আওয়াজ তোলা অনেকের স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁরা অনেকেই সমিতিতে যোগ দিয়েছেন,. তারা অনেকেই আজ ফ্যাসিজমের ছোবল থেকে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টায় সাধ্যানুযায়ী লাগতে চাইছেন। আমাদের সমিতি যেন তাদের অবহেলা করে শুধু পাকা সাম্যবাদী কর্মীদের উপর নির্ভর না করে। যে ব্যাপক সমর্থন সমিতি প্রথম থেকে পেয়েছে, তাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই আজ প্রধান কর্ত্তব্য।

[জনযুদ্ধ। ১৭।৬।'৪২]

॥ গ ॥ Soviet Achievements

Indian Intellectual's Manifesto

The following manifesto, signed by a large number of intellectuals of Bengal, was issued soon after Hitler attacked the U. S. S. R.

"The Nazi attack on the Soviet Union has opened a new and momentous phase in world history. The use of machines and of men rages to-day on a Colossal front and on a scale unheard-of before.

"At this hour of trial we feel it is urgent that attention is drawn to the massive moral and material achievement which the Soviets have to their credit. Some of us have been critical of aspects of the Soviet regime ; some, again do not support the theory of Marxism which the Soviets have attempted to put in to practice. But when one remembers the dark legacy of czarist misrule, which was followed for years by a disastrous civil war and the intervention against the infant Soviets by nearly all the powers on earth, the Soviet achievement can only be described as magnificent.

"Rabindranath Tagore has testified to it in glowing terms, and since the two leading sociological investigators

in the world to-day—Sidney and Beatrice webb-brought out their book on Soviet communism—A New civilisation, information in regard to the U. S. S. R. has been both reliable and abundant.

Complete Equality

"In the Soviet Union, all factories, mines, railways and shipping, land and trading organisation are the property of the people as a whole. The economic and the social life of the country is planned for the welfare of all and not for the profit of the few. The drama of Soviet planning cannot fail to grip even those wno do not hold with Socialist hypotheses. Complete equality of all citizens, irrespective of race or sex or nationality, enables them to praticipate in the business of the community.

"Equal opportunity for education is provided universally, the school-leaving age is raised to seventeen, and payment is made to students at universities. Work is for all, unemployment does not exist ; economic crises, recurrent everywhere else' have ceased. The maximum working day is 8 hours, the average less than 7. Free medical attention is provided for all ; workers receive wages while sick, as though they are at work, and are besides entitled to paid holidays every year. No where in the world, as impartial observers testify, are women and children so well cared for as in the Soviet Union.

"Majestic in conception, practial in detail, scientific in from, the Soviet plans essay tasks never yet attempted by any State, ancient or modern.

Scientific spirit

"There is no country, we imagine, in which so large and so varied an amount of scientific research is being carried on at the public expense, alike in the realms of abstract theory and in that of technology. There is certainly none in which there is so little chance of that frustration of science by the profit-making instinct of which the British and American scientists are now complaining." (Soviet communism.)

"We in India can not forget how in one grand gestute ......the Revolution the Soviets renounced all 'priorities and 'Capitulatious' and 'Concessions' and 'privileges' which the czarist Government had enjoyed in Asiatic countries along with the other Great powers.

"Scores of races and millions of people were condemed by the czars to 'planned backwardness', while the Soviet freedom for national and linguistic minorities has produced a high flower of culture, and a new intellectual life is astir on sites where superstition and dark ecclesiastical reaction once reigned supreme. For in the U. S. S. R., with its 185 peoples and 142 languages, there is no imposed privilege for a race or for a language.

Emancipation of women

"The first Mohammedan State to adopt legislation for women's emancipation was not Kamal's Turkey, but Soviet Azerbaijan. How different is Soviet Uzbekistan from the Bukhara Chanate, where there were 8,000 witch-doctors and just one doctor for the Emir, his harem and his court !

"As the webbs point out." The Soviet union has set itself, diligently, not merely to treat the 'lesser breeds without the law' with equality, but recognising that their backwardness was due to centuries of poverty, repression and enslavement, has made it a leading feature

of its policy to spend out of common funds considerably move per head on its backward races than on the superior ones, in education and social improvements, in industrial investments and agricultural reforms.'

Love of knowledge

"The figures for book.production in the U. S. S. R. are astronomical. At the end of the first five year plan Soviet book-production was greater than that of England, Germany and Japan taken together.

"Einstein, banished by the Nazis, sells more perhaps in the U. S. S. R., than anywhere else ; between 1927 and 1936, 55,000 copies of his work were sold in the Union.

"In the land of his birth the 375th anniversary of Shakespeare's birth passed unnoticed, while the event was celebrated by workers and peasants everywhere in the U. S. S. R. some 200,000 people saw in Moscow the performance of 'king Lear' in the spring of 1939. In the small republic of Armenia, 32,000 copies of Shakespeare sold in last five years.

"The Soviet people have no 'cultured classes' in over sense of the term and want none. They seek a wholly cultured people and try to offer leisure, security and opportunity to all.

New civilisation

"In a little over twenty years and in face of the most stupendous odds, the common people of the Soviet Union have created what we believe is a new civilisation. And even we in India, borne down by generations of inanity and degradition, cannot remain undisturbed when that civilisation is in peril. Helpless and unfree, we can at least send our good wishes to the Soviets and wait anxiously for the day when they will come out victorious over the forces arrayed against them."

The signatories of the appeal are :—

P. C. Roy
Satyendra Nath Majumdar (Editor, 'Arani')
Rabindranarayan Ghosh (Principal, Ripon College)
Hem Chandra Nag (Editor, Hindusthan standard)
Mrinal Kanti Ghósh (Amrit Bazar Patrika)
Vivekananda Mukherjee (Editor, Yugantar)
Bankim Chandra Sen (Editor 'Desh')
Jatish Chandra Bhowmick (Editor, 'Forward')
A. R. Malihabadi (Editor, 'Rozana Hind')
Amal Home (Editor, Calcutta Municipal Gazettee)
P. K. Bose (Principal, Bangabasi College)
Bhupendra Nath Datta

Calcutta University

Biresh Chandra Guha (Ghosh Professor of Applied Chemistry), Kalidas Nag, Amiya Kumar Sen, Narayan Chandra Banerjee, Jitendra Nath Banerjee, Tripurari Chakraborti, N. K. Sinha, Humayun Kabir, Niharranjan Ray, Batakrishna Ghosh, Surendranath Goswami, R. P. Das Gupta, L. P. Sukul, A. B. M. Habibullah, P. C. Gupta, Haricharan Ghosh, Renu Roy, Nikhil Chakraborti, Sarasi Kumar Saraswati.

Bar Library, High Court

Arun Sen, Abany C. Banerjee, Sukumar Mitra, Hirendranath Mukherjee, S. K. Acharyya, Jyoti Basu.

Artists and Writers

Pramatha Chaudhuri, Naresh Chandra Sen Gupta, Jamini Roy, Atul Chandra Gupta, Manik Banerjee, Tarasankar Banerjee, Amiya Chakraborti, Premendra Mitra, Buddhadev Bose, Sajani Kanta Das, Bishnu Dey, Hiran Kumar Sanyal, Niren Roy, Gopal Halder, Abdul Kadir, S. Upadhyay, Samar

Sen, Abu Saiyid Ayyub, Benoy Ghosh, Subhas Mukherjee, Ajit Chakraborti, Bimala Prasad Mukherjee, Chanchal Chatterjee, Jyotirindra Maitra, Kamakshi Chatterjee.

Bangabasi College

N. N. Sen Gupta, Karunamoy Mukherjee, Provash Chandra Ghosh (Vidyasagar College), Amarendra Prasad Mitra (Victoria Institution)

Scottish Church College

N. C. Bhattacharyya, Sushil C. Dutta.

Ripon College

Ananda Krishna Sinha, Bejoy Kumar Roy, Satish Chandra Sengupta, Bhabatosh Datta, Nandalal Ghosh.

[Taken from the book 'The land of the Soviets' edited by H. Mukherjee and S. K. Acharyya, published on behalf of 'Friends of the Soviet Union', Calcutta, in Sept. 1941]

পরিশিষ্ট—৫

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ : কিছু তথ্য ও আলোচনা

॥ ক ॥ প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ

পরিচয় সম্পাদক ফরমায়েস্ করেছেন যে, 'প্রগতি লেখক সংঘ' যখন প্রথম এদেশে স্থাপিত হয়েছিল, তখনকার কিছু খবর তার পাঠকদের জন্য দরকার। ইতিহাসে আমাদের আগ্রহ কম বলে বড় সহজেই আমরা সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যন্ত ভুলে যাই, আর তাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হয় না। পনর ষোল বছর আগে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনার মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার কথা স্মরণ করলে আমরা উপকৃত হব সন্দেহ নেই।

আমাদের একজন খ্যাতনামা লেখক একবার বলেছিলেন যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমরা প্রায় ইয়োরোপেরই অন্তর্ভুক্ত একটা প্রদেশে বাস করি। কথাটায় অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তাকে একেবারে অসার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ইংরেজি ভাষা মারফত ইয়োরোপের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলা রচনা ও রসবোধকে বড় কম প্রভাবিত করেনি— তার ফল সু কিংবা কু, যাই হোক না কেন। প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে; লণ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে-আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয়, তারা সবাই যে লেখক তা নয়; আজও প্রগতি লেখক আন্দোলনে লেখক আর পাঠকের প্রায় সমান স্থান রয়েছে বললে হয়ত একেবারে ভুল হবে না। মুল্‌ক্ রাজ আনন্দ,—সাজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইক্‌বাল সিং,

রাজা রাও, মুহম্মদ আশ্‌রফ্‌ এবং আরও ক'জন মিলে যে আলোচনা চলে তারই জের এদেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ইষ্টারের ছুটিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় মুন্সী প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।

১৯৩০-৩২ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর দিয়ে বিপুল অর্থনৈতিক সংকটের ঝড় বয়ে যায়। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনও ব্যাপক হয়ে ওঠে। সংকটকে প্রশমিত করবার বহুবিধ চেষ্টা অবশ্য হয়। কিন্তু সমাধানের কোন হদিস্‌ মেলে না। পুঁজি-বাদীরা সন্ধান পায় শুধু একটি মাত্র রাস্তার, আর তা হল ফ্যাশিজম্‌; যে রাস্তায় চলতে হলে জনসাধারণকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করা আর জাতি-বৈরীর বিষে বিকৃত করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফ্যাশিজমের নগ্ন কদর্য মূর্তি দেখে দেশের দরদী মানুষ শিউরে উঠল। যাদেরই হৃদয় আছে, মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে চেতনা আছে, তারাই ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কর্তব্য তা অনুভব করল। আমাদের দেশে সভ্যতার—এই সংকট সময়ে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন দৃপ্ত তেজে ফ্যাশিজমকে ধিক্কৃত করলেন; ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ' তিনি দেখে এসেছিলেন, তাঁর কবিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল ফ্যাশিজমের যে অপার কলঙ্ক মানুষের চিন্তা ও কর্মকে কলুষিত করছিল তার বিরুদ্ধে। মার্জিত রুচি নিয়ে বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান করতে গিয়ে তখন সদ্য প্রচারিত 'পরিচয়' পত্রিকা সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য-সম্পর্ক অসংকোচে স্বীকার করে বাঙালী সাহিত্যিককে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নতুন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করল। প্রগতি লেখক আন্দোলনের বনিয়াদ এদেশের বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করেছিল।

১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্ব ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। তখন যে ইশ্‌তেহার প্রচার করা হয় তাতে বলা হয়েছিল: "সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ

করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গি অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মনন ধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের কর্তব্য।......

"......আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

"ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি করি। আমাদের দেশে নানা মূর্তিতে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না।......যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতি-নীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

বাংলাদেশে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ১৯৪৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর অকালমৃত্যু ঘটে; আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি; তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসামান্য জ্ঞান, অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, মার্কস্‌বাদকে ভারতীয় গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিপুল আগ্রহ, পরম সাহিত্যানুরাগ এবং বক্তৃতা ও রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের কথা যদি আমরা কখনও ভুলি তো তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। প্রগতি লেখক আন্দোলনের এই অজাতশত্রু পথিকৃতের অবদান যেন আমরা বার বার স্মরণ করি।

লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৩৬ সালের ইস্টারের ছুটিতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা ছিল নানা কারণে স্মরণীয়। সভাপতির মঞ্চ থেকে জওহরলাল নেহেরু যে ভাষণ দেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। বিভিন্ন বামপন্থী ধারাকে একত্র করে বিদেশে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশে ফ্যাশিজ্‌মেরই সগোত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান তখন এসেছিল; কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নেহেরু সে-আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এমন ভাষায়

যা সহজে ভুলবার নয়। লক্ষ্ণৌয়ে নেহেরুর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে এখনও অনেকে তাই দেখান যে তাঁর তখনকার কথা আর আজকের কাজের মধ্যে বিকট অসঙ্গতি রয়েছে। লক্ষ্ণৌ-ফৈজপুর-হরিপুরা-ত্রিপুরী কংগ্রেসের বিবরণ বেশ স্পষ্টভাবে এদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রগতিবাদী ধারার উত্থান পতন এবং আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের পরিচয় দেয়। যাই হোক লক্ষ্ণৌয়ে যখন কংগ্রেস বসেছিল, তখন সেখানকার এক হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি ছিলেন উর্দু এবং হিন্দী লেখকদের শিরোমণি প্রেমচন্দ্র; যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মওলানা হস্‌রৎ মোহানী (জাতীয় আন্দোলনের এই প্রবীণ নেতা উর্দু ভাষার একজন বিখ্যাত কবি)। উত্তর ভারতের লেখকদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন:—যশ্‌পাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রশীদা জহাঁ, ফয়েজ আহ্‌মদ্ ফয়েজ (আজ যিনি পাকিস্তানে বিপ্লবী চক্রান্তে জড়িত বলে আটক রয়েছেন), সাজ্জাদ জহীর (বর্তমানে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী), প্রভৃতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে প্রসিদ্ধ তেলুগু কবি আব্বুরি রামকৃষ্ণরাও যোগ দেন। বাংলা থেকে চারজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিজে যেতে পারেন নি; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক ধারা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। যখন প্রবন্ধটি সম্মেলনে পড়া হয় তখন চারিদিকে প্রকৃতই 'ধন্য ধন্য' রব ওঠে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমন সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শন আর কোন প্রদেশ থেকে আসেনি। পরে "টুয়াডস্ প্রগেসিভ ক্রিটিসিজম" নামে এক গ্রন্থে অপর কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে এই রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল; এখন তা দুর্লভ, হয়ত একেবারেই অপ্রাপ্য।

লক্ষ্ণৌয়ে সম্মেলন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও স্মরণ আছে। দলবেঁধে সাহিত্য করা সম্ভব কিনা এই নিয়ে সুরসিক আলোচনা তিনি করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত যখন আমরা সবাই রাজী হলাম যে দল বেঁধে সাহিত্যে সৃষ্টি করা যাক বা না যাক, লেখক আর পাঠক মিলে (সুতরাং কিছুটা 'দল বেঁধে') আলোচনা ইত্যাদি করলে সাহিত্য সৃষ্টিতে

নিশ্চয়ই সাহায্য ঘটে, তখন শরৎচন্দ্র সানন্দে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের জন্য তাঁর বাণী আমাদের হাতে দিলেন।

১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিশ্ববরেণ্য ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু হয়। প্রগতি লেখক সংঘের বিভিন্ন শাখা 'গর্কি দিবস' পালনের উদ্যোগ করে। সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর এ বিষয়ে বিবৃতি দেন। এই সময় কলকাতার 'স্টেট্স্ম্যান' কাগজে সংঘের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার আরম্ভ হয়। 'কমিউনিস্ট পার্টি', তখন বে-আইনী; 'স্টেট্স্ম্যানের' প্রতিপাদ্য বিষয় হয় এই যে প্রগতি লেখক সংঘ কমিউনিস্ট পার্টিরই এক ছদ্মবেশী রূপ! রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ্র যে-সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাকে এই ভাবে বর্ণনা করতে 'স্টেট্স্ম্যান' এবং তার বন্ধুদের সংকোচ হয় নি।

আমাদের দেশে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ছিল 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফরদি ডিফেন্স অব পীস' এর সঙ্গে; রমাঁ্যা রলাঁ প্রভৃতি মনীষী ফ্যাশিজম্ যে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছিল তার বিরুদ্ধে প্রধানত লেখক শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের আহ্বান দেওয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস, ব্রাসল্স্, মাদ্রিদে এর অধিবেশন হয়েছিল—মুল্‌করাজ আনন্দ ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, তারিখে ব্রাসেল্সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয় সেখানে প্রধানত বাঙ্গালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি ইশ্‌তেহার ভারতবর্ষের পক্ষে পাঠানো হয়। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,—বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমচন্দ, জওহরলাল নেহরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু প্রভৃতি। বিবৃতিতে বলা হয়: "......উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ও জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে আর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছে। এ বিষয়ে আমাদের নীরব থাকা হবে অপরাধ। সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তার ঘোর ব্যত্যয় করা হবে।" ভারতবর্ষের জনসাধারণকে শুধু যে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাই নয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তাদের নেই এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি 'সী কাস্টম্স্' আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিরও ইংরেজী অনুবাদ নিষিদ্ধ, সিডনী ও বীট্রিস ওয়েবের "সোভিয়েট কমিউনিজম" গ্রন্থের আমদানি বন্ধ, সেন্সর-নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতা শুধু

হাস্যকর নয়, দেশের পক্ষে দারুণ অমঙ্গলেরই সূচনা তাতে দেখা যায়—এই ধরণের অনেক কথা এই বিবৃতিতে ছিল। আর বলা হয়েছিল—"যুদ্ধকে আমরা ঘৃণা করি, যুদ্ধকে আমরা পরিহার করতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। যুদ্ধ মারফত কদর্য ফ্যাশিজম কায়েম হতে চায়।" ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিবৃতির মূল্য অপরিসীম। প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে যে এর প্রকাশ ঘটে তা গর্ব করার বস্তু।

১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে বহু স্থানে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। একে বাংলা, তায় লেখকদের ব্যাপার, সুতরাং সাংগঠনিক দিক থেকে আন্দোলনে অবশ্য অনেক গলদ থেকে যায়, তবুও কাজ যা হয়েছিল তা একেবারে তুচ্ছ নয়। ঐ বৎসর আবার রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে সংঘের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রগতি' নামে এক সংকলন সম্পাদনা করেন; এর ভূমিকা লিখেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; আর যাঁদের রচনায় সংকলন সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সমর সেন। কাল মার্কস, আঁদ্রে জিদ, ই, এম, ফর্স্টার, টি, এস, এলিয়ট, সোভিয়েট কবি আলেকজান্দার ব্লক, গোলাম গফুর ও কারাবিয়েভের লেখার অনুবাদ সংকলনে থাকে; অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুর, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল কাদির, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা যথাসময়ে না পাওয়ার জন্য ছাপানো যায়নি। ভূমিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, "মানবের মানবতাকে আশংকিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বমানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্ধর্ষ ধ্বংস প্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টা আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।" আজও নরেশবাবুর সে দিনকার কথার পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে। কিন্তু তার অবতারণা করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে। তবে ১৯৩৮ সালের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তার উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। সাহিত্য বিষয়ে বাংলাই যে প্রাগ্রসর, এ-বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের লেখকদের মনে কোন প্রশ্ন নেই। তাই কলকাতায় সম্মেলন সবাই চেয়েছিলেন এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মুলকরাজ আনন্দ বলেন, যে নানা দেশে সাহিত্যিকদের সভায় তিনি যোগ দিয়েছেন কিন্তু কোথাও কলকাতার মত এত বেশী লোকের সাহিত্য সম্বন্ধে এত বেশী আগ্রহ লক্ষ্য করেন নি। আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ছ'দিন ধরে সম্মেলন চলছিল; সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন পাঁচজন—মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন (যতদূর মনে পড়ে, গুজরাতী লেখক উমাশংকর যোশী উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর জায়গায় বুদ্ধদেব বসুকে সম্মেলন নির্বাচিত করে)। রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করেন সেটি পাঠ করে সভার কাজ আরম্ভ হয়; প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণ-কুমার সান্যাল, আহ্‌মদ আলী, বালরাজ সাহনী, আব্দুল আলীম প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন; অধ্যাপক শাহেদ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও অধ্যাপক নির্মল-কুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু দেশ বিখ্যাত কোবিদ্ উপস্থিত থেকে আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সৌহার্দ্য প্রকাশ করেন। উর্দু কবির মধ্যে দু'জন যে এসে বাংলা দেশে লেখকদের চিত্ত জয় করেছিলেন—তাঁদের নাম হল মজাজ্ ও আলি সর্দার জাফ্‌রি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রগতি লেখক আন্দোলনে এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের অকৃপণ সাহায্য আমরা পরম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আজও যখন দেখি যে চিন্তার প্রখরতায় ও অনুভূতির ঔদার্যে সমাজ-বিষয়ে তাঁর প্রতিটি সাম্প্রতিক রচনা ক্ষুদ্র হলেও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে, তখন আশা হয় যে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেখে তিনি তাঁর পূর্বাভ্যস্ত কর্ম ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে দূরে থাকতে পারবেন না।

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আর যিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকটি উদ্যোগে একান্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা, সেই সাংবাদিক শিরোমণি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তখন তিনি

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক; তাঁর অফিস ছিল যেন প্রগতি আন্দোলনেরও কার্যালয়। প্রধানত তাঁর এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় তদানীন্তন সাংবাদিক মহল থেকে প্রগতি লেখক আন্দোলন প্রচুর সমর্থন পেয়েছিল।

কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘের নিখিলভারত সম্মেলনের সময় দেখা যায় যে প্রকৃত অনুরাগ নিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই সহায়তা পেতে দেরী হয় না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাজশেখর বসুর মত বহু মানভাজন সাহিত্যিক সাগ্রহে সম্মেলনকে স্বাগত জানান। মনে আছে আলোচনার সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থিত থেকে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা তখনই বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি। শৈলজানন্দ বললেন, আমার অভিভাষণ হবে রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" আবৃত্তি—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগ তখন ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ; বাংলায় তখন পরিচয়ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপাত্র। সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর সভ্যরূপে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা প্রকাশ হয়েছিল আন্দোলনের ইংরেজী মুখপাত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' ত্রৈমাসিকে; আব্দুল হালিমের সম্পাদনায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের লেখকদের সহায়তায় এই পত্রিকা কিছুকাল চলেছিল, কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয়। এর পরে 'ফাইল' হয়তো পাওয়া এখন শক্ত, কিন্তু জোগাড় করে রাখা আমাদের দরকার।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হল; ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অতর্কিত সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জনতার সংগ্রাম চলছিল। প্রগতি লেখক আন্দোলন সংগঠন হিসাবে শক্তিশালী হয়ে তখন ছিল না। কিন্তু তার প্রভাব যে সুদূর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের স্বপক্ষে জনতার পার্শ্বে স্থান নিয়ে দাঁড়াতে আমাদের লেখক শিল্পীরা ইতস্ততঃ করেননি; তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল লেখনী, কিন্তু ব্যবহার-পদ্ধতি ভিন্ন হলেও জনতার হাতিয়ারের যে লক্ষ্য তা ছিল মূলতঃ লেখনীরও লক্ষ্য। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভাষায় বলতে গেলে, "সমিতির

সাম্যেও ঐক্যে, জনতার মুখরিত সখ্যে' যোগদিতে আমাদের লেখকরা কখনও সংকোচ করতে পারেন না।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিজ্‌মের কবল থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখকেরা। আজ সেদিনকার নৃশংস ফ্যাশিজ্‌ম অপসৃত হলেও নবকলেবরে তার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে যুদ্ধের নৃশংস তাণ্ডবে দুনিয়াকে জোরকরে টেনে নামাবার প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন আবার কেন আমরা পূর্বের মতই তুচ্ছ ভেদাভেদের কথা বড় করে না দেখে হৃদয়বান ও সমাজসচেতন সকল সাহিত্যিককেই অকপট ঐক্যের জোরে সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেবো না?

[হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চক্ষুষা কাণঃ' নামক গ্রন্থ হতে]

॥ খ ॥ প্রগতি লেখক আন্দোলনের চার বৎসর (১৯৪৩-৪৭)

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে প্রগতি লেখক সংঘের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত নয়। সে ক্ষমতা লেখকের অর্জিত হয়নি এখনো। এ প্রবন্ধে থাকবে শুধু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা ঘটনার বিবরণ। তাও আবার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ব্যাপার। যেহেতু, ১৯৪৭ সালে পি ডব্লু এ অর্থাৎ সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘ পুস্তিকার আকারে যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন, প্রবন্ধটির সমূহ তথ্য সেই পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত; বরং বলা ভালো যে প্রবন্ধটি সেই রিপোর্টেরই ভাবানুবাদ। রিপোর্টে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রগতি লেখক সংঘের কার্যাবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের প্রগতি আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছেন সম্পাদক সাজ্জাদ জাহির।

১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাইতে সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের পরবর্তী ৪ বৎসরে সাংগঠনিকভাবে প্রগতি লেখক সংঘ আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলা দেশ সহ অন্ধ্র,

কেরল, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে পি. ডব্লু. এ'র প্রায় ৫০টি শাখা স্থাপিত হয়েছে। এবং তার মোট সদস্য সংখ্যা হল ৩০০০ হাজার। বলা বাহুল্য, পরিমাণগত এবং গুণগত—কোন দিক থেকেই ভারতবর্ষের অন্য কোনো লেখক সংঘ এই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। শিল্প সাহিত্যের সংগে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনে, সংস্কৃতির জগতে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে দীরপদে কিন্তু দৃঢ়ভাবে পি ডব্লু. এ অগ্রসর হয়েছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে গৃহীত ইশ্‌তেহারে লিপিবদ্ধ মূল নীতিগুলিকে সামনে রেখেই পি. ডব্লু. এ তার কর্মধারা পরিচালনা করেছে। কেন্দ্রীয় সম্মেলন ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির পটভূমিকায় সেই সেই প্রদেশের লেখকদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাও মাঝে মাঝে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করে আলোচনা করা হয়েছে। এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। পি. ডব্লু. এ'র প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাখাগুলিও গুরুত্বের সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছে। এইসব শাখাগুলিকর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বরচিত সাহিত্যপাঠ ছাড়াও সাহিত্যে আঙ্গিক ও বিষয়ের সমস্যা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন প্রগতি লেখকের যথাযোগ্য ভূমিকা-পালনের সমস্যা, শিল্পে অবক্ষয় ও প্রগতির সমস্যা, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে লেখকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক মত বিনিময়ের এরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুকরণের ফলে সঠিক সমাধানের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রগতি লেখকদের ঐক্যও আরো দৃঢ় হয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘ রবীন্দ্রনাথ-প্রেমনাথ-ইকবাল-গোর্কি প্রমুখ ঐতিহ্যবান সাংস্কৃতিক উত্তরসূরীদের শ্রদ্ধা ও স্মরণানমিত্ত যেমন 'দিবস' পালন করেছে তেমনি সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা—যেমন, বাংলার দুর্ভিক্ষ, হিন্দু মুসলমান দাংগা, নাগরিক স্বাধীনতা, প্রগতি লেখকদের উপর নির্যাতন প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছে এবং নির্যাতিত মানুষের স্বপক্ষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে।

এই ৪ বৎসরের সময়সীমার মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই লোকসংগীত-সহ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার বিকাশ ও পুষ্টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

ঘটনা। প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম শাখা আর. পি. টি. এ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে অন্ধ্র (Burrakatha), মহারাষ্ট্র (Pawada), বাংলাদেশ (Kavigan), উত্তরপ্রদেশ (Alha) প্রভৃতির লোক-গাথা ও সংগীত যেমন সংগৃহীত হয়েছে তেমনি পুরনো আংগিকে নূতন বিষয় পরিবেশনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে। পি. ডব্লু. এ'র শাখাগুলি পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষার 'পরিচয়', হিন্দী ভাষার 'নয়া সাহিত্য', উর্দু ভাষার 'নয়া আদাব', গুজরাতী ভাষার 'সংস্কার' ও তেলুগুভাষার 'অভ্যুদয়' প্রভৃতি পত্রিকার রচনাগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রগতি লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী।

অবশ্য আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংগঠন ও কার্যকরী সমিতির সাংগঠনিক দুর্বলতগুলি সমালোচিত হয়েছে এবং সেগুলিকে কাটিযে ওঠার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

এই হচ্ছে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনের সাধারণ পটভূমি। এই পটভূমির ভিত্তিতেই আমরা বাংলাদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ যে প্রগতি লেখক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সে কথা কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যেও স্বীকৃত হয়েছে। সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মোট ৩ হাজার সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশের সদস্য সংখ্যা ১ হাজার। মোট শাখা ১৪টি। শুধু কলকাতাতেই ৫০০ শত সদস্য। হাওড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের শাখাগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ব্যতিরেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও হীরেন মুখার্জী, কলকাতা শাখার নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ ধীরেন সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও বিমল ঘোষের মতো লেখক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকেরা।

সপ্তাহে একবার 'আমাদের লেখা শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন বাংলা শাখা। উক্ত অনুষ্ঠানে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখক ছাড়াও বহু তরুণ লেখক তাঁদের সাম্প্রতিক রচনা পাঠ করতেন। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগে যোগ-সূত্র রক্ষা করার জন্য মাসে একবার 'পুরানো লেখা'র অনুষ্ঠান হতো। সেখানে

দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনা পাঠ করা হতো এবং অধ্যাপক নীরেন রায়, গোপাল হালদার কিংবা সুকুমার সেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। প্রগতি লেখক সংঘের বাংলা শাখা উনিশ শতকের নবজাগরণের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনাও শুরু করেন। কোনো কোনো সদস্য বংকিম বা দীনবন্ধুর মতো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করতেন, কেউ আবার 'তত্ত্ববোধিনী সভা,' 'হিন্দুমেলা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতেন, কেউ 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন,' 'নীল বিদ্রোহ,' প্রভৃতি আন্দোলন নিয়ে পর্যালোচনা করতেন এবং অন্য কেউ কেউ কোন বিশেষ প্রশ্ন, যেমন—'স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকা' প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করতেন। 'আমাদের লেখা' ও 'পুরনো লেখা' ছাড়াও অন্যান্য আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো, যেমন 'কবিতার ধর্ম' বা 'আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা' প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। আবার কখনো যামিনী রায়, অধ্যাপক নীড্‌হাম, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ই. এম, ফর্ষ্টার প্রভৃতি গুণীজনকে আমন্ত্রণ জানানো হতো তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রের অনুভব ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য।

ঢাকার প্রগতিশীল লেখক, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের হাতে অকালে নিহত শহীদ সোমেন চন্দ স্মরণে এফ, এস, ইউর সঙ্গে যৌথভাবে বাংলার প্রগতিশীল লেখক সংঘ একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। গ্রন্থাগারে প্রগতিশীল গ্রন্থ ও পত্রিকা সংরক্ষিত হতো। গ্রন্থাগার সংলগ্ন দেওয়াল পত্রিকায় গ্রন্থাগারের নূতন গ্রন্থগুলির তালিকা উল্লিখিত হতো।

আগামী প্রাদেশিক সম্মেলনের কাজকে বাংলার প্রগতি লেখক সংঘ দুভাগে ভাগ করে নিয়ে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথম ভাগ, প্রতিনিধি সম্মেলন; এতে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি ও কার্যকরী সমিতির সদস্যরা তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন এবং সেই ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কর্মসূচী গৃহীত হবে। দ্বিতীয় ভাগ, বিশেষ অধিবেশন, যেমন 'কবিতা অধিবেশন,' 'প্রবন্ধ অধিবেশন' প্রভৃতি। এই সব বিশেষ অধিবেশনে সারা বৎসরের সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখার সমীক্ষা করা হবে এবং পরে সেগুলি 'বাংলা কবিতা, ১৯৪৬', 'বাংলা নাটক, ১৯৪৬' প্রভৃতি শিরোনামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হবে এবং তারপর পুস্তিকাগুলিকে একত্রিত করে 'বাংলা সাহিত্য, ১৯৪৬' নামে প্রকাশ করা হবে। শুধু তাই নয়, বাংলা প্রগতি লেখক সংঘের নেতারা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এই পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে যদি

এই ধরণের সমীক্ষা প্রকাশ করা হয় এবং সেগুলিকে একত্রিত করে 'ভারতীয় সাহিত্য ১৯৪৬' নামে প্রকাশ করা হলে সংগঠনের অনেক উপকার হবে; কারণ, এই সব সমীক্ষার ভিত্তিতে পি, ডব্লু, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে প্রত্যেক প্রদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝে কর্মপন্থা ঠিক করা সহজ হবে।

এবার অন্যান্য প্রদেশের প্রগতি লেখক সংঘের কার্যকলাপ ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

অন্ধ্র প্রগতি লেখক সংঘ॥ ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্ধ্র প্রগতি লেখক সংঘের ৩য় বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক অন্ধ্র কবিদিগের অগ্রদূত দেবলুপল্লী কৃষ্ণশাস্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, সম্মেলন উদ্বোধন করেন অন্ধ্রের বিপ্লবী কবি শ্রীরঙ্গন শ্রীনিবাসরাও। সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল চিত্র প্রদর্শনী। অন্ধ্রের তরুণ শিল্পীদের আঁকা ৫০টি চিত্র সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়। চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক দামেরলা ভেঙ্কটরাও।

লেখক সংঘের সম্মেলন চলেছিল তিন দিন ধরে, ৮০ জন লেখক এতে যোগ দিয়েছিলেন।

'সাহিত্য—কেন এবং কার জন্য' এই বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়; অংশগ্রহণ করেন প্রকাশক এম. বিশ্বেশ্বর রাও, গল্প উপন্যাস ও প্যারোডি রচয়িতা রুক্মিনীনাথ শাস্ত্রী, কবি বাল গঙ্গাধর তিলক, 'শিল্পী'র সম্পাদক গণপতি শাস্ত্রী, এম. আর. কলেজের অধ্যাপক এ. এস. এন. শর্মা প্রভৃতি। একটি 'কবি সম্মেলন'ও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এতে ছোটগল্প ও নাটকের উপর বিশেষ প্রবন্ধ পঠিত হয়।

তেলুগু দৈনিক 'অন্ধ্রপ্রভা'র সম্পাদক এবং প্রখ্যাত একাংক নাটক রচয়িতা এন ভেঙ্কটেশ্বর রাও'র 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক একাংক নাটকটি সম্মেলনে মঞ্চস্থ করা হয়। আধুনিক অন্ধ্রের জনকরূপে খ্যাত ভেরসিলিনগমের জীবন নিয়ে রচিত 'বুররা কথা' নামক সংগীতালেখ্যটি গীত হয়। লোককবি শংকর সত্যনারায়ণ এটি রচনা করেন।

১৬টি শাখা সহ অন্ধ্র পি. ডব্লু এ'র সদস্য সংখ্যা ৯ শতাধিক ; হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ (নিজামের তেলেঙ্গানা এলাকা) মাদ্রাজ সহ সমুহ বড় শহরেই এই শাখা ও সদস্যসংখ্যা বিস্তৃত।

ভিজিয়ানাগ্রাম, গণ্টুর, বেজওয়াদা, মাদ্রাজ ও মুসলিপত্তনের শাখাগুলি সুসংগঠিত। প্রায় সমস্ত শাখাই হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে। ভেরসিলিনগম পান্তুলু, গিদুগু রামমূর্তি, গুরাযাদা আপ্পারাও, ধরমবরপু কৃষ্ণমাচারুলু, কে লক্ষণ রাও, দেশোদ্ধারকা কালীনাধুনি নাগেশ্বর রাও পান্তুলু, এবং দামেরলা রাম রাও প্রভৃতি অন্ধ্র নবজাগরণের পথিকৃতদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সকল শাখাই সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পি. ডব্লু. এ ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যিক সংঘ এই সকল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল কবি ডি, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, ছোট-গল্প রচয়িতা কে কুটুম্ব রাও, জে, রুক্মিনীনাথ শাস্ত্রী (যুগ্ম সম্পাদক), নাট্যকার মধু কৃষ্ণ, গণ্টুর এ. সি. কলেজের প্রাচ্যভাষার প্রধান এবং প্রতিভার সম্পাদক টি, ভেঙ্কটরত্নম, শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও প্রভৃতি এবং তাঁদের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সি, পিটচ্ছায়াকে নিয়ে।

বেজওয়াদায় অন্ধ্র পি, ডব্লু এ-র প্রধান কর্মস্থলে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছিল। পাঠাগারে ইংরেজী ও তেলুগুর ধ্রুপদী সাহিত্যের চমৎকার সংগ্রহ ছিল। ইংরেজী ও তেলুগু ভাষার মাসিক পত্রিকাও নিয়মিত সংগৃহীত হত। পাঠাগারের জন্য মাসিক গড়ে ১২৫ টাকার ব্যয়ভার মূলতঃ জনসাধারণের চাঁদা থেকেই বহন করা হত। প্রধান কর্মস্থলে সাধারণ সম্পাদক ও পি, কোদণ্ডরাম শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই সমস্ত কাজ পরিচালনা হত। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি দু'বার বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

অন্ধ্র পি, ডব্লু এ র কার্যক্রমে ক্রমশ অন্ধ্রের বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকতর অংশ আকৃষ্ট হতে লাগলেন, অন্ধ্রের প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতি সম্পর্কে তরুণ লেখক ও শিল্পীদের ওয়াকিবহাল করার জন্য একটি 'পাঠশালা' প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই 'অন্ধ্র সাহিত্য পাঠশালা' গড়ে ওঠে এবং একমাস কাল (১৯৪৬ সালের ১১ই মে থেকে ১০ই জুন) চালু থাকে। নবনির্মিত শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের নিষ্ঠাবান গবেষক এম, সোমশেখর শর্মা, মোট ৫৭ জন লেখক, শিল্পী ও ছাত্র এখান

থেকে পাঠ নিয়েছিলেন। মাদ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিল্পী ডি, পি, রায়চৌধুরী এটি উদ্বোধন করেন এবং ভাষণ দেন।

শিক্ষায়তনে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তৃতা করা হয়, বক্তার নামসহ সেগুলি নিম্নে উল্লিখিত হল।

১। অন্ধ্রের ইতিহাস। অধ্যক্ষ॥ ২। অন্ধ্র সাহিত্যের ইতিহাস। পি. অধিনারায়ণ শাস্ত্রী॥ ৩। অন্ধ্রের প্রাচীন কাব্যের ইতিহাস। এন, ভেঙ্কট রাও॥ ৪। ক) অন্ধ্রের প্রাচীন বৈয়াকরণদের দৃষ্টিভঙ্গী। খ) আধুনিক অন্ধ্র সাহিত্যের ইতিহাস। গ) তেলুগু বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ—ডঃ সি, নারায়ণ রাও॥ ৫। নূতন প্রবণতা ও আধুনিক অন্ধ্র কাব্য। ডি, কৃষ্ণ শাস্ত্রী॥ ৬। ক) তেলুগু ভাষায় একাংকিকা। খ) নাটকের কলাকৌশল ও মঞ্চস্থ করার সমস্যা—এস, গোপালকৃষ্ণ মূর্তি॥ ৭। ক) রাস। খ) রূপক। গ) প্রাচীন ছন্দ—এ, নরসিংহ শর্মা॥ ৮। ছোটগল্প ও নাটক। কে, কটুম্ব রাও॥ ৯। ক) কাব্যের সমালোচনা। খ) আধুনিক কবিতায় প্রগতিশীল প্রবণতা—শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও॥ ১০। চিত্রকলা। এস, গোপালকৃষ্ণ গোখলে॥ ১১। নাটক। কে, গোপাল শর্মা॥ ১২। প্রাচীন সাহিত্য ও ছন্দ। জে, মাধবরায় শর্মা॥ ১৩। অন্ধ্র সাহিত্যে নূতন প্রবণতা। এম, চন্দ্রশেখর রাও॥

অন্ধ্র পি, ডব্লু, এ বিভিন্ন কাজে মোট ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় করেছে, এর মধ্যে ছাত্ররা চাঁদা হিসেবে ৭৫০ টাকা তুলে দিয়েছেন, বাকী টাকা জনসাধারণ দিয়েছেন। 'সাহিত্য পাঠশালা'র বক্তৃতাগুলি খুবই শিক্ষণীয় হয়েছিল এবং এটিকে বাৎসরিক কর্মধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এম, সোমশেখর শর্মা, ডঃ নারায়ণ রাও, ডি, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, কে, রামকৃষ্ণানায়, এম, চন্দ্রশেখর রাও ও সম্পাদক হিসেবে সি, পিতচ্ছায়াকে নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পি, ডব্লু-এর তত্ত্বাবধানে এবং জনৈক ব্যক্তির পরিচালনায় 'তেলুগু তল্লী', নামক একটি পত্রিকা হায়দ্রাবাদ থেকে এতাৎকাল প্রকাশ করা হত; এখন অন্ধ্র পি, ডব্লু-এর একটি নিজস্ব মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়স্তরের বুদ্ধিজীবীদের তন্নিষ্ঠ প্রচার ও অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সহায়তার ফলে 'অভ্যুদয়' নামক একটি মাসিক পত্রিকার সরকারী ঘোষণাপত্র মাত্র এক মাসের মধ্যেই পাওয়া গেল। অন্ধ্র পি, ডব্লু-এর সাধারণ সম্পাদকই হলেন পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বর প্রকাশিত

হয় পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, নাম দেওয়া হয় 'বিশেষ সাহিত্য পাঠশালা সংখ্যা,' সঙ্গে সঙ্গে গচ্ছিত টাকাসহ প্রায় ৩৫টি বিক্রেতা সংস্থা পত্রিকার এজেন্সী দেবার আবেদন জানায় এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই ২৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হয়। 'অভ্যুদয়ে'র স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি ৩৫০০ টাকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

পি, ডব্লু-এ'র পক্ষ হতে ২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: প্রথম গ্রন্থ হল অন্ধ্র সাহিত্য পাঠশালার ছাত্র এন চিরঞ্জীবি প্রণীত 'তেলুগু পোলু' বা একটি শতক কাব্য, অন্যটি হল মাদ্রাজ হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও বিচারক পি, ভি, রাজামান্নার কর্তৃক সংকলিত ৭টি একাংকিকা। রাজামান্নার নিজেও ছিলেন প্রগতিশীল একাংক রচয়িতা, আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন গতি ও প্রবণতার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

স্থির করা হয় যে, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজে অন্ধ্র পি, ডব্লু, এর ৪র্থ বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতিত্ব করবেন খ্যাতনামা বিচারক পি, ভি, রাজামান্নার। সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য কে, এ, আব্বাসকে এবং প্রধান বক্তা হিসেবে 'হংস' সম্পাদক অমৃত রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

·প্রগতি লেখক সংঘ: বোম্বাই॥ বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘের ২টি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আমাদের নজরে আসে। প্রথমতঃ এই সংঘে বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের সহাবস্থান—যেমন, মারাঠী ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার মামা ওয়ারেকর এবং সর্বহারার কবি আন্না শাঠে, গুজারাতী ভাষার বকুলেল, স্বপ্নাথ ও ভোগীলাল গান্ধী, হিন্দী ভাষার নরেন্দ্র শর্মা—উপেন্দ্রনাথ আলাক—অমৃতলাল নাগর—ডঃ এস, সি, জৈন—ডঃ যোশী—বাহাদুর সিং—রাজীব সাক্সেনা—নিমাইচাঁদ জৈন—বলরাজ সাহানী—প্রেম ধাওয়ান, উর্দু ভাষার মালিহাবাদী, সাঘর নিজামী—কৃষণ চন্দর—কে, এইচ, আব্বাস—সাজ্জাদ জাহীর—শাহীর—আলী সর্দার জাফ্রী—কাইফি—আদিল—কুদ্দুস প্রমুখ, ইংরেজী ভাষার ডঃ মুলক রাজ আনন্দ—অনিল ডি সিলভা প্রভৃতি। বিভিন্ন ভাষাভাষীর এই সকল লেখকগণ সভা ও অনুষ্ঠানে একত্র মিলিত হয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয়

বৈশিষ্ট্য হল: বোম্বাইতে প্রায়শই বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী, প্রভৃতি দর্শকদের আগমন ঘটে থাকে। পি, ডব্লু, এ তার সুযোগ গ্রহণ করে, এই সব বিশিষ্ট অতিথিদের আমন্ত্রণ জানায় সভায় সমাবেশে এবং এঁদের চিন্তারাজীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘের কর্মধারাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নিয়মিত অনুষ্ঠান—এখানে সদস্যগণ কর্তৃক লিখিত গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাসের অংশ, সমালোচনা নিয়মিত পাঠ করা হয় ও আলোচিত হয়। ভাষার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইংরেজী কিংবা হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রতিটি রচনার সারমর্ম বলে দেওয়া হয়; এর ফলে মূলের আস্বাদ না পেলেও প্রতিটি সদস্য প্রত্যেকের রচনার মূল সুর ও নির্যাসটুকুর সঙ্গে পরিচিত থাকেন।

২। বিশেষ অনুষ্ঠান—শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কিংবা ঐতিহাসিক দিবসগুলি স্মরণ করার জন্য এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ এইভাবে প্রেমচাঁদ দিবস, রবীন্দ্র দিবস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিবস, গোর্কি দিবস, রুশীয় বিপ্লব দিবস প্রভৃতি এককভাবে এবং ইকবাল-গালীব দিবস প্রভৃতি অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্তভাবে পালন করেছিলেন। একদিন রোমাঁ রোলাঁ সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়েছিল এবং কবি নজরুল গুজরাটে যাবার পথে নজরুল দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই সব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাভাষী বক্তা বক্তৃতা দেন, বক্তৃতাগুলি পি, ডব্লু, এ'র কর্মী ও সদস্যদের মনে গঠনমূলক চিন্তার প্রেরণা যোগায়।

৩। দর্শকদের স্বাগতানুষ্ঠান: আগেই বলা হয়েছে যে, বোম্বাইতে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ভ্রমণে বা অন্য কার্য্যোপলক্ষে প্রায়শই এসে থাকেন। যেমন বিগত দুই বৎসরের মধ্যে মহাকবি ভাল্লাথোল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মৌলবী আবদুল হগ, উদয়শংকর এবং সম্প্রদায়, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, সুমিত্রানন্দন পাট, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, সুভদ্রাকুমারী চৌহান, শিবমঙ্গল সিংহ, ডঃ রামবিলাস শর্মা, মিঃ আনসারী, রাশফল, মিঃ এপিস্টীন, মিঃ ই, এম, ফর্স্টার, মিঃ আউও হায়মান, মাখদুম মহীউদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিগণকে বোম্বাই প্রগতিলেখক সংঘ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র ও কাথিয়াওয়াড়ের লোককবিদের সংবর্ধনা জানাবার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

৪। এসব ছাড়া সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কেও বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ তার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দুর্ভিক্ষত্রাণ কার্য: বিগত বৎসরে বোম্বাইএর কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশেরই মর্মন্তুদ ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—এই সময় বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সংগ্রামে জনগণকে সচেতন করতে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের মানুষের জন্য অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এই প্রতিষ্ঠান সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে সাহায্য করার জন্য শতাধিক বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন প্রচার করা হয় এবং বেশ কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়।

দাঙ্গা প্রতিরোধে: বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হল তখন বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সংঘের সদস্যদের এই প্রতিক্রিয়াশীল, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল, প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে। প্রগতি সংঘের তরফ থেকে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছিল। বেতার থেকে বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানান এবং এই উদ্দেশ্যে গল্প, কবিতা পাঠ হয়। নাটক অভিনয় করার জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়, কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। এই সময় প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য কর্তৃক যে সব দাঙ্গা-বিরোধী রচনা রচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কাইফি আজমীর কবিতা, আশাকের নাটক, আব্বাসের গল্প, সজ্জাদ জাহীরের রিপোর্টাজ, কিষাণ চন্দর-এর উপন্যাস।

দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে: শাসকশ্রেণী কর্তৃক গণতান্ত্রিক অধিকারহরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘ সোচ্চার হয়েছে। সরকারের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলে যখন ১৯৪৩ সালের পর থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকাগুলি বন্ধ হবার উপক্রম হল, তখন তার বিরুদ্ধে পি, ডব্লু, এ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য

টি. গদীবালাকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। লেখকদের উপর ত্রিবাঙ্কুর সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। হায়দ্রাবাদের নেতা ও প্রখ্যাত উর্দু কবি মখদুমকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মখদুম দিবস পালন করা হয়েছে।

গুজরাট প্রগতি লেখক সংঘ: ১। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এ প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনের পর গুজরাট শাখার জন্ম। বোকুলেল ও ভোগীলাল গান্ধীকে সম্পাদক করে ৯ জন লেখকের একটি কমিটি তৈরী করা হয়। কমিটি কর্মধারা পরিচালনার জন্য সভা সমাবেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছে। ২৫ জন লেখকের সহযোগিতায় প্রকাশ করেছে 'সাহিত্য ও প্রগতি' নামে প্রগতিশীল রচনার একটি সংকলন। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে এই নামের আর একটি সংকলন গুজরাট প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে নর্মদ শতবর্ষ উপলক্ষে বক্তৃতার আয়োজন করা হয় এবং নর্মদের জীবন নিয়ে সি. মেহেতার লেখা একটি নাটকও মঞ্চস্থ করা হয় গুজরাট গণনাট্য সংঘের সহযোগিতায়।

২। ১৯৪৪ সালে স্বপ্নাস্থা ও ভোগীলাল গান্ধীর সম্পাদনায় 'সাহিত্য ও সংস্কার' নামে প্রগতিশীল গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নাটকের একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি গুজরাটী ভাষার 'মাইলস্টোন' হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

৩। 'লেখক মিলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, গুজরাট-ভাষার তরুণ লেখকেরা সমবেত হয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে।

৪। স্বপ্নাস্থা রচিত ও প্রকাশিত 'ধরতিনী' নামে ১১০ লাইনের একটি সুদীর্ঘ কবিতা সমসাময়িককালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ফসল। ব্যক্তির জীবন ও সমাজ কী ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা-ই হল কবিতাটির বিষয়বস্তু।

৫। এই সময় ভোগীলাল গান্ধীর আর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। প্রেমিকের জগতের এক অপূর্ব রূপরেখা এঁকেছিলেন ভোগীলাল। প্রেম ও বিবাহিত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা, নরনারীর যৌন সম্পর্ক প্রভৃতির নিপুণ বিশ্লেষণ আছে রচনাটিতে। গ্রন্থটির রচনাশৈলীও উল্লেখযোগ্য।

৫। কিষাণ কবি চণ্ডালিকার ২ খানি পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকা দুটিতে আছে শ্রমিক ও কৃষকদের দৈনন্দিন সংগ্রামের বর্ণবস্তু চিত্র, ফলতঃ সাধারণ মানুষের নিকট তা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

৭। সমসাময়িককালে গুণবন্তরাই আচার্যের লেখা নূতন ঢঙের নাটকও প্রকাশিত হয়েছিল (আলা-বি-লি), ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পট-ভূমিকায় সাধারণ মানুষের জীবন ও রাজনৈতিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল নাটকটিতে। বোম্বাই ও গুজরাটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

৮। বোকুলেশ, জয়ন্ত ক্ষেত্রী, স্বপ্নাস্থা'র প্রগতিশীল গল্প সংকলনও এই সময় প্রকাশিত হয়।

প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য নন, অথচ প্রগতিমনা, এমন কিছু লেখকেরও উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ সমসাময়িককালে প্রকাশিত হয়। যেমন, জয়মল ও নিরঞ্জনের যৌথভাবে লেখা 'অনাঘত ধারা' ও 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। ১৯৪২ সালের সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী গ্রন্থদুটিতে চিত্রিত। করলনদাস মানেকের নামে একটি ব্যঙ্গগীতিও প্রকাশিত হয়েছিল। রূপকের অন্তরালে কবি মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই আক্রমণ করেছিলেন।

বোম্বাইতে আর, আই, এনের বিদ্রোহকে অবলম্বন করে তরুণ সাংবাদিক মহেন্দ্র মেঘানির আর একটি গ্রন্থও সমসাময়িককালে প্রকাশিত হয়; রচনার মধ্যে রোমান্টিক সুর থাকলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে এটি তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য।

৯। 'সংস্কার' নামে মাসিকপত্রের প্রকাশ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বপ্নাস্থা পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এই পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, নাটক, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, সামাজিক এবং নারীসমাজের সমস্যা, বিজ্ঞান, বিপ্লবের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি তাবৎ বিষয় সম্পর্কে রচনা থাকত। গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন অন্যান্য ভাষায় প্রগতিশীল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করানো হত, তেমনি গুজরাটী ভাষার সাম্প্রতিক রচনার সমালোচনাও থাকত।

১০। দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখকরা একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন। এতে গুণবন্ত রাই আচার্য, বোকুলেল, প্রহ্লাদ পারেখ, ভোগীলাল গান্ধী প্রমুখের স্বাক্ষর ছিল।

বোম্বাই প্রগতি লেখক সংঘের উর্দু বিভাগ :

১। ১৯৪৫ সালে হায়দ্রাবাদে সারা ভারত প্রগতিশীল উর্দু লেখক সম্মেলনের পর উর্দু লেখকেরা নূতন উদ্দীপনা লাভ করেন। ঐ সম্মেলনের

একটি উল্লেখযোগ্য রিপোর্টাজ লিখেছিলেন কিষাণ চন্দর, যাতে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি চিত্রিত হয়েছিল।

২। সাজ্জাদ জাহীর উর্দু, হিন্দি ও হিন্দুস্থানী ভাষার সমস্যা সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন, হায়দ্রাবাদ সম্মেলনে সেটি পঠিত হয় এবং পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়।

৩। শিবতে হাসান 'উর্দু সাংবাদিকতা'র উপর আর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, এটি উর্দু সাংবাদিকতার ১৫০ বৎসরের ইতিহাসের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।

৪। আলী সর্দার জাফ্রী 'ইকবালের কবিতার সামাজিক পটভূমি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

৫। 'মাসনবী' নামক উর্দু কবিতায় পুরাতন পরিত্যক্ত রীতি পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্ণনামূলক এই কবিতাগুলি আখ্যানকেন্দ্রিক। পার্শিয়ার বিখ্যাত জাতীয় কবি ফিরদৌসী এই রীতিকে অবলম্বন করেই 'শাহনানা' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণতঃ রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রেমোপাখ্যান লিখতে গিয়ে ভারতের উর্দু কবিরা এই রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানকালে কবি ইকবাল তাঁর দর্শন প্রচারের জন্য এই কাব্য-রীতি অবলম্বন করে মাসনবী রীতিতে কাব্য রচনা করে নূতনত্বের সূচনা করেন। পুরাতন ও নূতন মাসনবীর মূল পার্থক্য হল, শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যে রাজকুমার নয়, নায়ক হল সাধারণ মানুষ।

দুটি প্রখ্যাত রাজনৈতিক মাসনবীর কথা এবার আমরা উল্লেখ করব। একটি হল 'জামহুর' (বা জনগণ), এটি সর্দার জাফ্রীর রচনা। ভারতের সম্পদ ও সৌন্দর্য এবং জনগণের অমরত্ব-ই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। কাইফি আজমীর লেখা দ্বিতীয় মাসনবীর নাম 'ইলেকশন নামা' (বা নির্বাচনী ইশ্‌তেহার); এতে কবি কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'খানা জাঙ্গী' নামে দাঙ্গার উপর কাইফি আর একটি ৪০০ লাইনে সম্পূর্ণ মাসনবী রচনা করেছেন।

শুধু বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বা বিবর্ধন নয়, কাব্য রীতিও এই ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সর্দার জাফ্রীর সুদীর্ঘ নাট্যকাব্য 'নই দুন্‌য়া কো সালাম'। পুরাতন মাসনবী রীতিতেও জাফ্রী নাট্যগুণ

সঞ্চারিত করে নূতনত্ব সৃষ্টি করলেন। তিনি গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গীতধারা সৃষ্টির জন্য মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। দু' হাজার লাইনের এই কাব্যে কবি ৬টি ছন্দের ব্যবহার করেন। বিষয়বস্তুও অভিনব : একটি সন্তানের জন্মের মধ্যে একটি নূতন পৃথিবীর জন্মের আভাস দেওয়া হচ্ছে, শিশুকে প্রতিপালন করার জন্য পিতামাতার যে সংগ্রাম তাকে দেখানো হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপক হিসেবে, প্রসব বেদনা ও মাতৃত্বের কষ্ট ও গৌরব আসলে নূতন যুগের বেদনা ও গৌরবের রূপক। 'সময়, এবং ইতিহাস'কেও রূপকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এইভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণগুলি—রোমের দাস-বিদ্রোহ, মধ্যযুগের কৃষক বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ, তার নৌবিদ্রোহ, কৃষক ও শ্রমিকদের সংগ্রাম, কাশ্মীর-ত্রিবাংকুর ও হায়দ্রাবাদের বিদ্রোহ।

৬। নূতন যুগ : উর্দু প্রগতিশীল লেখকরা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের রচনায় সেই সকল বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন,—

(ক) ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আর. আই, এনের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কিষাণ চন্দর 'তিন গুণ্ডে' নামে একটি শক্তিশালী গল্প লেখেন। এতে তিনি সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, জাতীয় নেতৃত্বের নীতি এবং জনগণের বীরত্ব কাহিনী তুলে ধরেছেন। এই গল্প ইংরেজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

(খ) কাশ্মীরের কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে কে, এইচ, আব্বাস 'জাফ্রান কী ফুল' নামে একটি চমৎকার গল্প লেখেন। কল্পনার সাথে ঘটনার জাল বুনে আব্বাস একটি নূতন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে।

(গ) দাঙ্গার বিরুদ্ধে কৃষাণ চন্দর 'বন্দর' নামে একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন, 'নয়া আদাব' পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু গল্প নাটিকা লেখা হয়েছে। রাজীয়া জাহীর লিখেছেন একটি গল্প, সুলতানা বেগম লিখেছেন নাটিকা এবং মেহদি লিখেছেন একটি চমৎকার রিপোর্টাজ। উপেন্দ্রনাথ আশকের নাটিকা 'তুফান সে ফেলে' ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক বোম্বাইতে মঞ্চস্থ হয়।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচিত হয়। যেমন সাজ্জাদ জাহীরের 'বিশুদ্ধ কবিতা,' ও সর্দার জাফ্রীর 'মখদুম—তাঁর কবিতা ও ব্যক্তিত্ব'।

(৯) 'নিজাম উইকলি' নামে একটি মূলতঃ চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্রিকা এখন সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গত সাড়ে তিন মাসে নিয়মিত সভা হয়েছে গড়ে ২৫ জন লেখকের উপস্থিতিতে, এবং সভায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সদস্যদের রচনা পাঠ ও আলোচনা হয়েছে। নিজাম পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে এই সব রিপোর্ট প্রকাশিত হত। সম্পাদক হামীদ আখতার এই পরিকল্পনা করেন। সভায় উপস্থিত থাকতেন যোশ, সাগর, সাহীর, কাইফি, জাফ্রী, আদিল, সফদর প্রভৃতি লেখকগণ। অন্য ভাষাভাষী লেখকদেরও মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানানো হত, যেমন আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ও মুলকরাজ আনন্দ।

উত্তর প্রদেশ প্রগতি লেখক সংঘের হিন্দী শাখা : উত্তর প্রদেশের আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, কানপুর লক্ষ্ণৌতে প্রগতিলেখক সংঘের ৫ টি শাখা ছিল, আলীগড়ে অবার নূতন একটি শাখা গড়ে তোলা হয়। নূতন শাখাটির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, এ শাখাতে সমবেত হয়েছেন আলীগড়ের লোক-কবিরা (ক্ষেম সিং নাগর, কিষণলাল ভরদ্বাজ, মুরহজি, সাহেব সিং মেহেরা প্রমুখ), এঁরা শুধু কবি নন, জনপ্রিয় কৃষক নেতাও। কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনীই এঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু। ইতিমধ্যে 'লাল তীর', 'লাল তরঙ্গ' প্রভৃতি তাঁদের কয়েকখানি কাব্যসংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল।

নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কানপুর শাখাকে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এখানে কিছু পুরাতন লেখক, প্রতিষ্ঠার পর থেকে পি. ডব্লু. এ'র বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেলজী, কৃষ্ণকুমার ত্রিবেদী, ললিতমোহন আওয়াস্তি প্রভৃতি সংগঠকগণ শক্তহাতে হাল ধরেছিলেন, তরুণ লেখকদের সঙ্গেও এঁদের সংযোগ ছিল নিবিড়, স্থানীয় প্রগতিকর্মীদেরও সাহায্য এঁরা পেয়েছিলেন, ফলতঃ মুষ্টিমেয় বিরুদ্ধবাদীকে পর্যুদস্ত করা গিয়েছিল সহজেই। নিয়মিত সভা ছাড়াও এই শাখা এক বিরাট কবি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল যাতে ১৫—২০ হাজার শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য এই শাখা অর্থসংগ্রহ করেছিল এবং 'সৎকুণ্ডী যজ্ঞে'র নামে শান্তির জন্য মহাসভা-পন্থীদের বিপুল খাদ্যদ্রব্য ও অন্য দ্রব্যাদি পোড়ানোর বিরুদ্ধে সার্থক প্রচার

চালিয়েছিল। মৈথিলী শরণ গুপ্ত, মহাদেবী ভার্মা প্রভৃতি লেখকদের দ্বারা দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্যকার সংসদ'-এর জন্ত বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত আনন্দ কৌশল্যায়নের সভাপতিত্বে এক সর্ব ভারতীয় কবি-সম্মেলনের মাধ্যমে এই শাখা ১০০০ টাকা তুলেছিল।

এলাহাবাদ শাখার অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, পাহাড়ীজী, গঙ্গা-প্রসাদ পাণ্ডা এবং কৃষ্ণদাস প্রভৃতির মতো তরুণ হিন্দীভাষী লেখকরা সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁরা দেশের প্রত্যেকটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন। পাক্ষিক সভায় এঁরা গল্প, কবিতা নাটক, প্রবন্ধ পাঠ করতেন, এ ছাড়া গণ-তান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন ও প্রচারেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে বিখ্যাত হিন্দী কবি নিরালার সভাপতিত্বে এঁরা একটি কবি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। চীন দিবস, প্রেমচাঁদ দিবস ও স্বাধীনতা দিবসও এঁরা উদ্‌যাপন করেন।

লক্ষ্ণৌ শাখার নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী য়াশফল (হিন্দী ভাষার শ্রেষ্ঠ জীবিত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার)। প্রখ্যাত সমালোচক ও 'হংস'-এর প্রাক্তন সম্পাদক (সারা ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক) এস, এস, চৌহান এবং অধ্যাপক ই, হাসিনের সহযোগিতায় নিয়মিত শাখা-সভায় বিবিধ সাহিত্যিক সমস্যা আলোচিত হত। বৈজ্ঞানিক বিষয়েও প্রবন্ধ পাঠ করা হত। বাহিরের কিছু কিছু লেখক, যেমন মিস পণ্ডিত এবং মিসেস বক্সীকেও আমন্ত্রণ জানানো হত।

আগ্রা শাখার নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত হিন্দী লেখক ও সমালোচক ডঃ রামবিলাস শর্মা, তরুণ লেখক আর, রাঘব এবং কবি কমলেশজী। এ শাখাও বাংলার দুর্ভিক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেছে, ফ্যাসীবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করেছে। আর. রাঘব বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলও পরিদর্শন করেছেন।

পি. ডব্লু. এ'র বেনারস শাখা একটি বৃহৎ জেলা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, সেখানে সম্পূর্ণানন্দ, পরর্দাকরজী, অধ্যাপক কেশবপ্রসাদ মিশ্র, এন. ডি. বাজপায়ী প্রভৃতি লেখকগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁরা গণনাট্যের একটি শাখাও গড়ে তুলেছিলেন এবং রবীন্দ্র দিবস, প্রেমচাঁদ দিবস প্রভৃতি দিবস উদ্‌যাপন করেছিলেন। বেনারস শাখার অন্যতম সংগঠক ছিলেন মুন্সী প্রেমচাঁদের পুত্র অমৃত রাই।

প্রগতি লেখক সংঘের হিন্দী শাখা সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। একটি হল প্রেমচাঁদ প্রতিষ্ঠিত এবং বেনারস থেকে প্রকাশিত 'হংস' এবং দ্বিতীয়টি হল অমৃতলাল নাগর, নরেন্দ্র শর্মা, রমেশ সিং, শামসের বাহাদুর সিং, রাজীব সাক্সেনা সম্পাদিত এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'নয়া সাহিত্য' পত্রিকা।

হিন্দী ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকরা ধীরে ধীরে প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে এসেছেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁদের কিছু উল্লেখযোগ্য রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, য়াশফল রচিত দেশদ্রোহী, দিব্য, পার্টি কমরেড প্রভৃতি উপন্যাস; অভিশপ্ত—এর মত ছোট গল্প; শেখর নামক উপন্যাস, নটরাজন-প্রসাদ নাগর রচিত দিন কে তারে উপন্যাস; শিব মঙ্গল সিং সুমন রচিত প্রলয় সৃজম ও যুগ কা মোল নামক কাব্য; শিবদন সিং চৌহান রচিত প্রগতিবাদ নামক সমালোচনাগ্রন্থ; নরেন্দ্র শর্মা রচিত লাল নিশান, মিট্টি আউর ফুল নামক কাব্য; আলাকের উপন্যাস গিরতী দিওয়ারেন; আর. রাঘব রচিত অজেয় কান্দাহার নামক কাব্য ও বাংলার রেখাচিত্র; পাহাড়ী রচিত উপন্যাস নয়া রাস্তা; প্রকাশচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনা গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যের নূতন ব্যাখ্যা, রামবিলাস শর্মার প্রবন্ধগ্রন্থ ভর্তেণ্ডু যুগ—প্রেমচাঁদ ও নিরালা, অমৃতলাল নাগরের বাংলা দুর্ভিক্ষকে অবলম্বন করে লেখা উপন্যাস মসন কে ফুল, ধরতী কে গীত নামক লোকগীতি; মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যা-য়ণের গল্প, নাটক ও উপন্যাস এবং এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ দাস, গঙ্গাপ্রসাদ মিশ্র, রামকৃষ্ণ প্রভাকর, ত্রিভুবন বিনোদ, সর্বদানন্দ ভার্মা, ভারতভূষণ আগরওয়াল, গিরজাকুমার মল্লিক, চন্দ্রভূষণ ত্রিবেদী প্রভৃতির রচনা। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিন্দী ভাষার অন্যতম শক্তিশালী লেখক নিরানজীর বেলা, নয়ে পত্তে প্রভৃতি কাব্য, চোটী কি পুকুর, বিল্লেস্বুর বাকরিহা প্রভৃতি উপন্যাস এই সময় প্রকাশিত হয়।

বিহার প্রগতি লেখক সংঘ : ১৯৪২ সালে প্রগতি লেখক সংঘের বিহার শাখা স্বীকৃতি লাভ করে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে প্রগতি লেখক আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বিহারে; গয়া, ভাগলপুর, পাটনা, মজফঃরপুর, দারভাঙ্গা, ছাপরা, রাঁচি প্রভৃতি শহরে গড়ে ওঠে প্রগতি লেখক সংঘের স্থানীয় শাখা সমূহ। এই সংগঠনে আন্দোলন পরিচালনা করতেন অধ্যাপক রঞ্জন হালদার, ব্রিজনন্দন আজাদ, রাধা কৃষ্ণ, এম সি সমাদ্দার, মহম্মদ

ইয়াইয়া নাকভী, আয়লীপ্রসাদ সিংহ, রামধারী সিংহ দিনকর, জগন্নাথপ্রসাদ মিশ্র প্রমুখ বাংলা-হিন্দি ও উর্দু ভাষার তরুণ লেখকবৃন্দ।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে প্রগতি লেখক সংঘের বিহার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পাটনা শহরে দুটি বড় বড় সম্মেলন হয়। সাংগঠনিক সংহতি ও উন্নতির জন্ম আহুত এই সম্মেলন সাফল্য বহন করে এনেছিল। বিভিন্ন জেলাশহরের শাখাগুলিকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা জেলায় জেলায় ঘুরেছিলেন। কনভেনশন দুটিতে বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। সংঘের প্রায় ২৫০ জন সদস্য হন। হিন্দি, উর্দু ও বাংলা—এই তিনটি ভাষার পৃথক তিনটি বিভাগ করা হয়েছিল সম্মেলনে, প্রত্যেক ভাষার জন্ম পৃথক অধিবেশনে সেই ভাষার-সাহিত্য সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার আলোচনা হয়েছিল। এই রকম একটা বিভাগের অধিবেশনে উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা ছিল ৪ সহস্রাধিক।

বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৪ সালে উত্তর বিহারের দুর্ভিক্ষের জন্ম প্রগতি লেখক সংঘ সাহায্য তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, ১৯৪২ সালের সংগ্রামে অন্তরীণাবদ্ধ লেখক ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। পল্লীর লোক-কবিদেরও প্রগতি লেখক সংঘ সংগঠিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুঙ্গেরের শ্রীনন্দন, প্রকাশ আনন্দপুরী, প্রেমদাস, ধনঞ্জয় ঝা, ওম প্রকাশ; ভাগলপুরের অধিকলাল, বিষ্ণুদেওকুমার এবং নাট্যকার জগদেও গুপ্ত, রাহুল বাবু প্রমুখ। উত্তর বিহারের মহামারীর পটভূমিকায় লেখা জগদেও গুপ্তের 'কুইনিন কি টিকিয়া' এবং প্রতিরক্ষা-মজুত-কালোবাজারী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত ধনঞ্জয় ঝা'র 'বিজয় যাত্রা', 'কিষাণ কর্তব্য,' 'মহাপাপ', 'লাল বুলবুল' প্রভৃতি নাটক পল্লী অঞ্চলে অভিনীত হয় এবং কৃষক জনগণের চেতনা সঞ্চারের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ভোজপুরী ভাষায় লেখা রাহুলজীর ৮টি নাটকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যসম্মত কীর্তন-মার্শিয়া-বির্হা-কবীর-জগন্নাথিয়া-জোগীরা-ব্রহ্মশা-কাজলী-লোরী-সোহর-কুনয়র-বিজয়মল এবং সাধনা ঢঙে সঙ্গীত রচিত হয়, ঝুমুর ও নতুব ঢঙে নৃত্য সংগঠিত হয়। উপরে যে সকল নাটকের কথা বলা হয়েছে সেগুলি বিহার কৃষককুলের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে সহায়ক হয়েছিল। এক একটি সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ সহস্রাধিক কৃষক উপস্থিত থাকতেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং প্রগতি লেখক সংঘের এই

যৌথ সাংস্কৃতিক অভিযান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো যে শত্রুরা একে বলত 'শর্মাজীর ট্যাঙ্ক' (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কে, শর্মা ছিলেন বিহারের প্রখ্যাত কৃষক নেতা)।

সেই সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘ বিহারের জেলায় জেলায় গড়ে তুলেছিল গ্রন্থাগার আন্দোলন। ছাত্র, স্কুলশিক্ষক, পল্লীর বয়স্ক ব্যক্তি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘের স্থানীয় শাখাগুলিতে সদস্যদের রচনা পঠিত হত; রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, তুলসী, ভর্তেণ্ড প্রভৃতি মণীষীর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি 'প্রগতিশীল রচনা' নামক ৩২ পাতার একটি চমৎকার রিপোর্টাজে বিহার প্রগতি লেখক সংঘের কার্যবিবরণী ও কৃতিত্বের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন।

কর্ণাটকের প্রগতি লেখক আন্দোলন: বিগত সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনের পর কর্ণাটকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পানুরাগীর উদ্যোগে যে প্রগতি লেখক আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো ২।৩ বৎসরের মধ্যেই তা ক্রমশ জনপ্রিয়, ব্যাপক ও প্রসারিত হল। উদ্যোগীরা প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিলেন—পুরাতনপন্থী লেখকদের নিরন্তর আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে। দ্বিতীয় স্তরে নতুন ভাবধারার সংহতি সাধন হল এবং তৃতীয় স্তরে গড়ে উঠল প্রগতিপন্থী লেখকদের সংঘ। বলা বাহুল্য আর ভি যোগীরদর, ভি কে গোকক প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে নতুন ভাবধারার প্রসার সম্ভব হয়েছিল। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এ এন কৃষ্ণ রাও সম্পাদিত ৪০০ পাতার গোর্কী ও তাঁর রচনাবলী এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাচক্রও একাজে বিশেষ সহায়তা করেছিল। প্রগতি লেখক আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে এক বিতর্ক চলেছিল ১ বৎসরের অধিককাল; বিতর্কে কানাড়ার সমূহ সাহিত্যপত্রিকাই অংশগ্রহণ করেছিল। সাহিত্যের শুচিবায়ু রক্ষার প্রহরী ও বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রবক্তরা প্রগতি লেখকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সমূহ প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ভেঙে প্রগতি কর্মীরা, কিছু উত্তেজনাও কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। বিশেষতঃ ব্যাঙ্গালোরের ২টি দল এ বিষয়ে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই বেশী কৃতকার্য হয়েছিল। এই আক্রমণ, উস্কানি ও প্রতিরোধের পর্ব অতিক্রম করার পর সত্যকার সৃজন-

শীলতার পর্ব শুরু হল। কর্ণাটকের তরুণতম লেখকদের উপর প্রগতি আন্দোলনের প্রভাব পড়ল, কারণ এই সময়কাল থেকে দেখা যেতে লাগল যে প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য হোন আর নাই হোন প্রত্যেক তরুণ লেখকের রচনাতেই প্রগতিবাদী চিন্তা ও চেতনার স্বাক্ষর বর্তমান।

১৯৪৬ সালের ২টি বিখ্যাত প্রগতিশীল উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। একটি হল মির্জি আন্না রাও এর লেখা 'নিসর্গ'—যাতে বেলগাঁ জেলার সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে, অন্যটি ওয়েলিংডন কলেজের অধ্যাপক এইচ বি কুলকার্ণির লেখা 'ভগ্ন মন্দির'। সমসাময়িককালে প্রকাশিত অধ্যাপক ভি কে গোলকের লেখা ৩ ঘণ্টার নাটক 'যুগান্তরে' নবযুগের ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। গোপালকৃষ্ণ আ'দিগা, ভি জি ভাট, এইচ ভি নাগরাজ রাও প্রমুখ তরুণ কবিরাও কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈষম্যের ও নিপীড়নের ছবি।

কর্ণাটকে বর্তমানে প্রগতি লেখক সংঘের ৩টি শাখা গড়ে উঠেছে—যথাক্রমে হুবলী, ব্যাঙ্গালোর ও ম্যাঙ্গালোর শাখা। কোন কেন্দ্রীয় কমিটি এখনো গঠিত হয় নি। উক্ত ৩টি শাখা কর্মবিভাগের নীতিতে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোর শাখা ব্যস্ত রয়েছে গ্রন্থ প্রকাশে, ম্যাঙ্গালোর শাখা আলোচনাচক্র এবং বিভিন্ন মণীষীর স্মরণ দিবস সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছে আর হুবলী শাখা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এইভাবে এই সংগঠন জনচেতনা বৃদ্ধির কাজেও সহায়ক হয়ে উঠেছে, কবি গল্পলেখক উপন্যাসিকদের অন্তরীণাবদ্ধ করার জন্য ত্রিবাঙ্কুর সরকারের ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রগতি লেখক আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল মাসিক 'জনতা' এবং সাপ্তাহিক 'দেশবন্ধু' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলি।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রখ্যাত কানাড়া নাট্যকার টি পি কৈলাসমের মৃত্যুতে সাধারণভাবে কানাড়া সাহিত্য এবং বিশেষভাবে কর্ণাটকের প্রগতি লেখক আন্দোলনের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। সাহিত্যিক উন্নাসিকতা ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা। জনগণকে বৈপ্লবিক চেতনা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন তিনি। ৬১ বৎসরের বৃদ্ধ অথচ মনের দিক থেকে এই তরুণটি প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকদের নিকট ছিলেন ভীতিস্বরূপ, অন্যদিকে প্রগতিপন্থী লেখকদের নিকট ছিলেন দুর্জয় প্রেরণার উৎস।

পাঞ্জাব প্রগতি লেখক সংঘ : ১৯৩৬ সাল থেকেই পাঞ্জাবের লাহোর এবং অমৃতসরে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়, কিন্তু কিছুকাল কাজ করার পরে বারে বারে শাখাগুলি অবলুপ্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি অবার ঐ ২টি শাখাকে উজ্জীবিত করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস থেকে এতাবৎ লাহোর শাখা ৭টি সভা করেছে, এবং এই সকল সভায় প্রখ্যাত উর্দু, পাঞ্জাবী এবং হিন্দি লেখকদের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়েছে। অমৃতসর শাখা প্রগতি লেখদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, এতে সমগ্র পাঞ্জাবের বহু লেখক উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কিষাণ সম্মেলনে প্রগতি লেখকরা একযোগে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় সুপরিচিত উর্দু গল্পলেখক ড. আশ্রফ এবং রাজেন্দ্র সিং বেদী বক্তৃতা দেন। সাম্প্রতিককালের সভাগুলিতে কাশ্মীর ও অন্যান্য রাজ্যের জনগণের সংগ্রামের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব. রেল, ডাক ও তার কর্মীদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

হায়দ্রাবাদের প্রগতি লেখক সংঘ: প্রগতি লেখক সংঘের হায়দ্রাবাদ শাখা খুব সক্রিয়। বিগত বৎসর এই শাখা সারা ভারত উর্দু লেখক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। অধ্যাপক রঘুবীর সহাই ফিরুক, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ, অধ্যাপক ই হাসীন, এবং আকবর এওয়ক্কনিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল সভাপতিমণ্ডলী। হায়দ্রাবাদ শাখা 'হালি দিবস'ও উদযাপন করেছিল। আলতাফ হাসিন হাসিন হালি ছিলেন আধুনিক উর্দু কবিতার জনক। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন উর্দু ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক মৌলবী আব্দুল হক।

প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার

[১৯৩৮ সালে ২৪শে ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতায় সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ২য় সম্মেলনের মঞ্চে এই ইশ্‌তেহারটি গৃহীত হয়]

ভারতীয় সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষীণশক্তি ও দুর্বল হলেও প্রতিক্রিয়ার শক্তি এখনো ক্রিয়াশীল এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ

প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছে। চিরায়ত সাহিত্যধারার অবলুপ্তির পর থেকে ভারতীয় সাহিত্যে বাস্তব-জীবনবিমুখতার মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাস্তব জীবন থেকে পলাতক হয়ে সাহিত্যিকরা ভিত্তিহীন আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছেন। তারই ফলস্বরূপ সাহিত্য আজ দেহে ও মনে রক্তাল্পতায় ভুগছে এবং গ্রহণ করেছে এক গতানুগতিক পথরেখা ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি।

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে প্রকাশ করা এবং সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশে সাহায্য করার দায়িত্ব আজ ভারতীয় লেখকদের উপর পড়েছে। তাঁদের এমন এক সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টি গ্রহণ করা উচিত যা পরিবার, ধর্ম, যৌন সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সমাজ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল প্রবণতাগুলিকে আঘাত করবে। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবৈরী এবং শোষণের সপক্ষে যে প্রবণতা আছে তার বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করবেন।

সাহিত্যের মান যাদের হাতে অবনমিত হচ্ছিল, সেই রক্ষণশীল শ্রেণীর হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করা এবং জনগণের জীবনের সাথে তাকে সংযুক্ত করে, বাস্তব জীবন চিত্রণের উপযোগী ও ভবিষ্যতের কাণ্ডারী করাই এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে গর্ব করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আমরা সমালোচনা করব এবং সৃজনশীল ও পারস্পরিক কাজের মধ্য দিয়ে আমরা জাতির নবজীবনসঞ্চারের প্রচেষ্টা করব। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের নূতন সাহিত্য আমাদের জীবনের মৌলিক সমস্যা—বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাদপদতা ও রাজনৈতিক অধীনতার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। যা আমাদের নিরুদ্যম, নিক্রিয় ও যুক্তিহীন করার চেষ্টা করবে তাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করে দেব। যা আমাদের মনে সমালোচনার মনোভাব জাগ্রত করে তুলবে, সক্রিয় করবে সংগঠিত করবে এবং সচেতন করে তুলবে, আমরা তাকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।

প্রগতি লেখক সংঘের সংবিধান

১। **নাম :** এই সংঘের নাম হবে 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে—

(ক) প্রগতিধর্মী সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ করা,

(খ) সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং এইভাবে সামাজিক পুনর্জীবন ও ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা,

(গ) জনগণের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা,

(ঘ) প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করতে পারবে এবং প্রগতির শক্তিকে স্বাগত জানাবে—এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত ও বর্ধিত করা,

(ঙ) বাক্ স্বাধীনতার অধিকারী এবং প্রগতিশীল লেখকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করা।

৩। **সদস্যপদ :** যিনি সংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐক্যমত পোষণ করবেন এবং সংঘকে বাৎসরিক ১ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হবেন, এরূপ যে কোন ব্যক্তিই সংঘের সদস্যপদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে সদস্য হতে পারেন।

৪। **সংঘের আকৃতি :**

ভারতের প্রধান ভাষাগুলির সংগে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সংঘের ভাষাভিত্তিক শাখা গঠিত হবে এবং সেই শাখার অনুমোদনক্রমে স্থানীয় শাখাগুলি গঠিত হবে। হিন্দুস্থানী শাখা শুধু নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি সহ ৪টি বিভাগে বিভক্ত থাকবে :

(ক) পাঞ্জাব, এন. ডব্লু. এফ. পি. এবং কাশ্মীর……………………………লাহোর

(খ) বিহার……………………………পাটনা

(গ) যুক্তপ্রদেশ……………………………লক্ষ্ণৌ

(ঘ) দিল্লী, সি. পি, সি. আই রাজপুতনা……………………………দিল্লী

৫। সারা ভারত বা কেন্দ্রীয় কমিটি ঃ

(ক) সংঘের কাজ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ভাষাভিত্তিক শাখার ৫ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে সারাভারত বা কেন্দ্রীয় কমিটি।

(খ) যদি সামগ্রিক সদস্যসংখ্যা ১০০'র কম থাকে তবে সারাভারত বা কেন্দ্রীয় কমিটি সেই স্থানে নূতন সদস্য গ্রহণ করতে পারবেন (Co-opt)!

(গ) সারা ভারত বা কেন্দ্রীয় কমিটি সংঘের নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবেন এবং ভাষাভিত্তিক ও বিভাগীয় শাখার কার্যাবলী তদারক করবেন।

(ঘ) বৎসরে অন্তত একবার সারাভারত বা কেন্দ্রীয় কমিটি সভায় মিলিত হবেন। অবশ্য মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগ যদি লিখিতভাবে আবেদন করেন তাহলেও সভা আহুত হবে।

(ঙ) মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগের উপস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হতে পারবে এবং সভার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় কমিটি ১ জন সাধারণ সম্পাদক ও অনধিক ১৫ জন সদস্যের একটি কার্যকরী সমিতি নিযুক্ত করবেন।

৬। কার্যকরী সমিতি ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত নীতিকে সংঘ কর্তৃক কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটি দায়ী থাকবেন।

(গ) প্রতি তিন মাস অন্তর কার্যকরী সমিতি একবার করে সভায় মিলিত হবেন। অবশ্য মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগ যদি লিখিত আবেদন করেন তাহলেও সভা আহুত হবে।

(গ) মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগের উপস্থিতিতেই কার্যকরী সমিতির সভা হতে পারবে এবং সভার অন্ততঃ ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। অবশ্য জরুরী সভাগুলি আরো স্বল্প দিনের নোটিশেই আহুত হতে পারবে।

৭। সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী সমিতির কার্যাবলীর জন্য দায়ী হবেন এবং সংঘের দৈনন্দিন কর্মধারা পরিচালনা করবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় ও কার্যকরী সমিতির আহ্বায়ক হবেন সাধারণ সম্পাদক।

(গ) সাধারণ সম্পাদক সংঘের যাবতীয় দলিল ও অর্থের অধিকর্তা হবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বাৎসরিক সভায় তহবিলের হিসাব ও রিপোর্ট পেশ করবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কমিটি বা কার্যকরী সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত সকল সাব-কমিটির-ই এক্স-অফিসও সদস্য থাকবেন সাধারণ সম্পাদক।

৮। শাখাসমূহ ঃ

(ক) ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক শাখাগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে সংঘের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পেশ করবার জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দাখিল করবেন ; এবং সংঘের বাৎসরিক রিপোর্টে অঙ্গীভূত করার জন্য একটি বাৎসরিক রিপোর্টও পাঠাবেন।

(খ) নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্থানীয় বা জেলাগত শাখা প্রতিষ্ঠার অধিকার ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক শাখাগুলির থাকবে, এবং সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সকল শাখাগুলির নিয়মনীতিও তাঁরা নির্ধারণ করে দেবেন।

(গ) প্রতিটি ভাষাভিত্তিক অথবা আঞ্চলিক শাখা তাঁর মোট আয়ের এক চতুর্থাংশ কেন্দ্রীয় অফিসে জমা দেবেন।

(ঘ) ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক শাখাগুলি স্থানীয় বা জেলাগত আয়ের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করবেন।

৯। নির্বাচন ঃ

কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, প্রাদেশিক কমিটি এবং শাখাগুলিতে বাৎসরিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০। সংবিধানের পরিবর্তন ঃ

সংবিধান সংশোধনের অধিকার থাকবে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রগতি লেখক সংঘের একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি :

আমাদের সম্মুখে এক দারুণ বিপর্যয় এসে হাজির হয়েছে; দেশের প্রধান প্রধান শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রবল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আবর্তে এক জঙ্গলের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় নবজাগরণের গৌরবময় শহর এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের গৌরবময় শহর কলকাতাতেই কিন্তু প্রথম এই দাঙ্গা শুরু হয়েছে। আগস্ট মাসের ৩য় সপ্তাহে কলকাতায় এক গৃহযুদ্ধ শুরু হল যা ভারতের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করল, ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুঠ হতে লাগল, ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের উপর ক্ষিপ্ত জনতা চালাতে লাগল অমানুষিক বর্বরতা। এমন কি স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধরাও রেহাই পেল না। সভ্যতার সমস্ত গরিমা, মানবতার সমস্ত মহিমা অবলুপ্ত হল, পারস্পরিক সদিচ্ছা ও হৃদয়ের কোমলতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক প্রবল উন্মত্ততা।

কলকাতায় যা ঘটেছে তা শুধু সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই দুর্বল ও পথভ্রষ্ট করেনি, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরেও প্রবল আঘাত হেনেছে। আমাদের দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত যুগ যুগ ধরে অর্জিত শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধগুলিও আক্রান্ত হয়েছে। নিদারুণ বিড়ম্বনার বিষয় এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির পিতৃপুরুষ এবং আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠতম মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পবিত্র জন্মস্থানেই এই ঘটনা ঘটেছে।

কলকাতা ও অন্যান্য শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল কারণগুলি কি? কলকাতায় দেখা গেল আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের দূষিত, পূতিগন্ধময় ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ—ধর্মের নামে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টির আহ্বান, সংগ্রামী সাধারণ মানুষের মধ্যে অনৈক্যের আহ্বান, একের উপর অন্যজনের প্রভুত্ব ও সংঘর্ষ বাধানোর জন্য জাতিবৈরী সৃষ্টির আহ্বান, পরিত্যক্ত জাতি ও ধর্মীয় পার্থক্য সৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িকতার আহবান প্রভৃতি শোষকশ্রেণী যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে সাধারণ মানুষের উপর দাসত্ব ও আধিপত্য সৃষ্টি করে সেই গুলির ব্যবহার। গত ২০০ বৎসর ধরে আমাদের প্রধান শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে সুচতুরভাবে এ সকল

অস্ত্র প্রয়োগ করে চলেছে। একদিকে মানুষের যুক্তিবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশকে সে রুদ্ধ করেছে এবং অন্যদিকে সামন্তবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দিয়ে, লালন করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সুষ্ঠু বিকাশ ও সংহতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে কাজে লাগিয়েছে সামন্তবাদ ও প্রতিক্রিয়ার দর্শনকে। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই ভারতীয় আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট বিরাট এক চালেঞ্জ হাজির করেছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠতম লেখক, কবি, নাট্যকার, শিল্পী—সকলেই ভারতীয় স্বাধীনতা-সংহতি ও গণতন্ত্রের তন্নিষ্ঠ উদগাতা হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে যা কিছু মহত্তম সৃষ্টি এই সময় হয়েছে সেগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতীয় তাঁবেদার বাহিনী লালিত প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের সঙ্গে সংগ্রামেরই ফসল।

সেজন্য কলকাতার দাঙ্গা হল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিগত ২০০ বৎসর ধরে অনুসৃত ও লালিত জাতীয়তা-বিরোধী, বিভেদকারী প্রতিক্রিয়াশীল নীতি 'divide and rule'-এরই ফল।

তাই আমরা কলকাতার ভয়াবহ ঘটনার জন্য দায়ী চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রপরায়ণ এবং চরম অপরাধী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই অভিযুক্ত করছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতায় সুদীর্ঘ অতীতের সময়গুলিতে আমাদের মাতৃভূমি বার বার আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনকার এই ক্ষত সম্ভবত সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সর্বাপেক্ষা গভীর।

ভারতীয়েরা ভারতীয়দের হত্যা করছে, হিন্দু ও মুসলিমরা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এই সকল ঘৃণ্য ঘটনার নায়ক ছাড়া আর কি শোভা পায়? তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশজোড়া এক বৈপ্লবিক তরঙ্গে ভীত হয়ে, সমগ্র এশিয়া জুড়ে গণ-অভ্যুত্থানে ভীত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া হয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধের শেষ অস্ত্রটি তুলে নিয়েছে হাতে।

আমাদের দৃষ্টিতে যা আরো ভয়ানক জিনিস তা হল আমাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দাঙ্গার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক না হয়ে বরং এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষকে পরোক্ষে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করছেন। আরো অসম্মানের বিষয় এই যে, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ কখনো যৌথভাবে কখনো এককভাবে বৃটিশ ভাইসরয় ও বৃটিশ সরকারের নিকট শান্তি

স্থাপনের জন্য বৃটিশ মিলিটারী পাঠানোর প্রার্থনা জানিয়েছেন। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই কি পরিণতি?

আমরা, ভারতীয় প্রগতি লেখকরা এ কথা বিশ্বাস করি না যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধই সেই অবশ্যম্ভাবী পথ নয় যা আমাদের জনগণের গ্রহণ করা উচিত। আমাদের যে সকল নেতৃবৃন্দ আজ জনগণকে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতে উত্তেজিত করছেন, এবং এ কাজে যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য গ্রহণ করছেন—আমরা তাঁদের জাতীয়তাবিরোধী শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ বলে চিহ্নিত করছি, আমরা মনে করি তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন এবং এইভাবে আমাদের দাসত্বের সীমাকে বিলম্বিত করছেন।

আমরা মনে করি যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম, ভারতীয়দের পারস্পরিক তিক্ততা, অসদিচ্ছা ও শত্রুতা বন্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর আজ কর্তব্য। শুধু মানবতার নিকট আবেদন এবং জনগণের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে, সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চেতন-অচেতন এজেন্টদের স্বরূপ উন্মোচন করেই এ কাজ করা যাবে না, জনগণের প্রাত্যহিক জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গৌরবময় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আমরা জানি যে কলকাতার এই নারকীয় পরিবেশের মধ্যেও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হত্যা, লুঠ ও অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত আছে তাই নয়, হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতার হলাহলে উন্মত্ত হয়ে স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতার ন্যূনতম বোধও হারিয়ে ফেলেছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এ কথা আমরা জানি যে বহু হিন্দু ও মুসলিম তাদের বিপরীত সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘের বাংলা শাখারও কিছু বিশিষ্ট সদস্য আছেন এ কথা অবগত হয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল মানুষ আপন আপন হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র চেতনা সঞ্জীবিত রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস আমাদের অবিচলিত, এবং তাঁদের ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা জানি যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার সমূহ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র এবং নিপীড়ন সত্ত্বেও ঐক্যের শক্তি বিভেদকে পরাজিত করবে, দাসত্বকে পর্যুদস্ত করবে, স্বাধীনতা এবং মৃত্যুর উপর ঘোষিত হবে জীবনের জয়গান।

আমরা, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার তরঙ্গকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের সংগ্রামে পরিবর্তিত করার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন:—বাংলা দেশের মানিক ব্যানার্জী, শৈলজানন্দ মুখার্জী, বিষ্ণু দে, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী; উর্দু ভাষার যোশ মালিহাবাদী, কিষাণ চন্দর, কে. এম. আব্বাস, ইসমত ছগ্‌তই, উপেন্দ্রনাথ আশাক, সাহীদ লুধিয়ানভী, ইব্রাহীম জালীল, ইস্রাহুলহক মাজাজ, রাজেন্দ্র সিং বেদী, আলী সর্দার জাফরী, কাইফী আজমী, হাজরা মাশরুর, সাজ্জাদ জাহীর; হিন্দি ভাষার অধ্যাপক পি. সি. গুপ্ত, ডঃ রামবিলাস শর্মা, অমৃতলাল নাগর, 'হংসে'র সম্পাদক অমৃতরাই, অধ্যাপক শিবমঙ্গল সিংহ, নরোত্তম নাগর, পাহাড়ী, যশমল, রমেশ সিংহ, রাজীব সাক্সেনা, নিমাই চাঁদ; মারাঠি ভাষার মামা ওয়াড়েকর, এন. কালে; গুজরাটী ভাষার গুণবন্ত রাই আচার্য, বকুলেশ, প্রহ্লাদ পারেখ, ভোগীলাল গান্ধী, ইংরেজী ভাষার মুলকরাজ আনন্দ।

[দিলীপ মজুমদার লিখিত এবং 'সাহিত্য চিন্তা', 'অভিনয়' ও 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত]

॥ গ ॥ জনযুদ্ধের রিপোর্ট

লেখক ও শিল্পীদের প্রতি আবেদন:

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে বিপন্ন স্বদেশের রক্ষাকার্যে যে সকল বাঙালী লেখক ও শিল্পী তাঁহাদের সৃজনীশক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আমরা তাঁহাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেছি। তাঁহারা যেন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গল্প, কবিতা, গান, নাটিকা, প্রবন্ধ, ছবি, কার্টুন প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া সংগঠনগত আভ্যন্তরীন যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকা, সাহিত্যসংঘ প্রভৃতিকেও আমরা সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাইতেছি। প্রেরিত রচনাদি মনোনয়ন ও প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করিতেছি।

বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালীঘাট।

[জনযুদ্ধ। ৫। ৮। '৪২]

ফ্যাসিজমকে রুখিতে

হাতুড়ী, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে তুলি লেখনীর স্থান—ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের দাবি।

"ভারতের জনসাধারণ তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, সাহিত্যিক, তার মনীষীবর্গ কেহই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মান, জাপান অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা, বৃটিশ আমলাতন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কুটনীতি, ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।........

ভারতের জনসাধারণ একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না, এবং চাইবে না।............

একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে: আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব, হয় এর নয় ওর, তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব-জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক।

ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম।........."

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতির অভিভাষণের এই কথা কয়টির দিয়াই নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে। গত ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও বিপুল জনসমাবেশের মাঝে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার, মিঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই

পাঁচজনকে লইয়া সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীহিরণকুমার সান্যাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, শিল্পী শ্রীযামিনী রায়, কমরেড সাজ্জাদ জাহীর, বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গারট্রুড এমারসন্ সেন, খ্যাতনামা তেলুগু কবি ও নাট্যকার অধ্যাপক শ্রীআবুরি রামাকৃষ্ণ রাও, যুক্তপ্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ও বেনারসের 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনন্দলাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। ঢাকা, নদীয়া, ময়মনসিংহ, বহরমপুর, বাঁকুড়া, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে এমন কি বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতেও প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ ও অন্যান্য লেখক শিল্পী সংঘ, কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের তরফ হইতে সম্মেলনে অভিনন্দন জানান হয়। এই উপলক্ষে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পঞ্চাশজন কবির কবিতা লইয়া 'একসূত্রে' নামক একটি সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্যাসিজমকে রুখিবার সঙ্কল্পই এই কবিতা সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সুর।

প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম ও জঘন্যরূপ—ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান করিয়া সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি রচিত হয়। ইহা ছাড়া 'হংস' পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত চৌহানের গ্রেপ্তার, সংঘের অন্যতম বিশিষ্ঠ সভ্য শ্রীবিনয় ঘোষের উপর চট্টগ্রাম প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা, 'যুগান্তর', 'স্টার অফ ইনডিয়া,' 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার মুদ্রণের স্থগিতের আদেশ ও সরকারী ব্যবহারে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলনের মূল সুরটি সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় পরিস্ফুট। ফ্যাসিজমের শত্রুতা যে কয়েকটি উর্বর মস্তিষ্কের খেয়ালমাত্র নয়—সত্যকার দেশপ্রেমের সহিত যে ইহার নাড়ীর যোগ আছে তারাশঙ্করবাবু ব্যক্তিগত জীবনের পৃষ্টপটে তাহা প্রমাণ করেন। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় স্বাধিকার রক্ষার জন্যই ফ্যাসিস্ট নাগপাশের বিরুদ্ধে লেখকমাত্রেরই বিদ্বেষ ঘোষণা করেন। মিঃ হবিবুল্লাহ বাহার "চট্টগ্রাম ও আসামে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও আটলান্টিক মহাসাগরে যে সব বাঙালী ফ্যাসিবাদের হাত

হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে গিয়া বুকের রক্ত ঢালিতেছে তাহাদের দুঃখবেদনা, হাসিকান্না, আমাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং আশা করেন যে, "নূতন করিয়া বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে।" যুগান্তর সম্পাদক ও কবি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে জিজ্ঞাসা করেন, "রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্গত এই মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং পদদলিত হয় তখন মনুষ্যত্বের উত্তরসাধক যারা, সেই শিল্পী ও সাহিত্য সেবকগণ কোন্ যুক্তিতে আপন আপন গৃহকক্ষে উদাসীন জড়ত্বের মধ্যে দিন যাপন করিবেন?"

[জনযুদ্ধ।২৩।১২। '৪২]

॥ ঘ ॥ সংগ্রাম ও শিল্পী ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল।]

…তারপর অকস্মাৎ ইয়োরোপে ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মানুষের জীবনে বর্বরতার আর মনুষ্যত্বের এক টাগ অব ওয়ার আরম্ভ হয়ে গেল এই বিংশ শতাব্দীতে। মানুষ যখন সর্ব বর্বরতাকে সমাহিত করে বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চলেছে ঠিক সেই সময়েই মানুষের আত্মস্বার্থপন্থী পদ্ধতি সকল মুখোশ খুলে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে। জার্মানিতে ইহুদী নির্যাতন দেখে শিউরে উঠলাম। ফ্রয়েড, আইনস্টাইনের দুর্দশা ও অপমান, মেয়েদের অধিকার লোপ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযান দেখলাম। মনে মনে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম—মানুষ কি এই সহ্য করবে, এক-এক সময় প্রত্যাশা করতাম—ওই ওই দেশের মানুষই এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মনুষ্যত্বের এই চরম অপমানের অবসান করবে। তারপর আরম্ভ হল পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির অভিযান। তখন সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল জার্মানির জনসাধারণের জন্যে। তাদের আজ সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে বিনা

যুদ্ধে, মাদকতায় মাতাল করে তাদের সব অপহরণ করেছে একদল স্বার্থান্ধ লোক। তারপরই লাগল ইংরেজের এবং ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানির। বিস্মিত হই নি। ধীরে ধীরে যুদ্ধ প্রসারিত হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী হয়ে। ফ্যাসিবাদীরা আক্রমণ করলে তাদের প্রাচীনতম শত্রু রাশিয়াকে। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেও সে নিরাপদ নয়। কারণ, মানব-কল্যাণের সর্বোত্তম ধর্ম এক বিরাট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে। সেই তার সবচেয়ে বড় ভয়। অন্ধকার যে ভয় করে আলোকে, পাপ যে ঘৃণা করে পুণ্যকে—সেই ভয় সেই ঘৃণা তার রাশিয়ার ধর্মকে। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান পড়ল ঝাঁপ দিয়ে। সে আজ ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত।

ভারতবর্ষের জনশক্তি, তার নেতৃবৃন্দ, তার বুদ্ধিজীবীগণ, তার সংবাদপত্র কোনোদিনই তার সত্য কর্তব্য করতে বিস্মৃত হয় নি। তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিবাদের উদ্ভবকাল থেকেই ওই আদর্শকে হীন বলে ঘোষণা করে এসেছে। ভারতের জাতীয় সংবাদপত্র ফ্যাসিবিরোধী নীতি এবং আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করে এসেছেন। ভারতের জনসাধারণ, তার শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার সংবাদপত্র, তার সাহিত্যিক, তার মনীষীবর্গ কেউই চায় না ফ্যাসিবাদী জার্মানীকে, জাপানকে অথবা ইটালিকে। কিন্তু তবু আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত সমস্যা। ব্রিটিশ আমলা-তন্ত্রের দমননীতি, ভেদনীতি, কূটনীতি ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত জনশক্তির উদ্যত হাত পঙ্গু করে দিয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ বিপর্যস্ত, নেতারা বন্দী। উন্মত্ত জনসাধারণ সমগ্র দেশে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে—তার ফলে জনশক্তির ব্যর্থ অপচয় হয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

আজ সেই একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে বাঙলার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের প্রতি প্রদেশেই সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতমণ্ডলী যে সংঘবদ্ধ হয়ে শুভ এবং নির্ভীক সত্যবাদী উচ্চারণে উদ্যত হয়েছেন, এতে যাঁরা সুখী আমি তাদেরই একজন।

প্রবাদ শুনে আসছি, পলাশির যুদ্ধের পূর্বে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাঁতে রানী ভবানী বলেছিলেন—রাঘব বোয়াল বিনাশের জন্য খাল কেটে কুমির এনে ঢুকিয়ো না। প্রবাদটা ঐতিহাসিক প্রমাণে সত্য হোক আর নাই হোক, কথা হিসাবে এত বড় সত্য আর নাই। সে দুর্মতি যদি কারও থাকে, তার সে মতির ধ্বংসই কামনা করি। তবে এটা ঠিক কথা, ভারতের জনসাধারণ

একটা শিকল খসাবার জন্য আর একটা শিকল পরতে চায় না এবং চাইবে না। ভারতের ইতিহাসে এই ভুলের বহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সে-ভুলের মাশুল দিতে দিতে আবার সেই ভুল আমরা করব না। একদল লোক মুষ্টিমেয় হলেও আছে, যারা বলে—আমরা তো গোলামী করতে আছিই, গোলামী আমরা করব। হয় এর নয় ওর। তাদের আমি বলি ক্লীব। এই ক্লীব জাতির মধ্য হতে বিলুপ্ত হোক। এদেরই সমগোত্রীয় একদল সুবিধান্বেষী কৌশল-তান্ত্রিক আছে, তারা বলে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে। প্রদীপের নিচেই অন্ধকারের মতো এই অতি বুদ্ধিমানদের বিষয়বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড বোকামির ফাঁক রয়েছে, সেটা তারা বুঝতেই পারে না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে যদি মেরেই ফেলে তবে ষাঁড় নাচে কি আশ্বস্ত হয় কোন্ আনন্দে কোন্ আশ্বাসে? কারণ বাঘের চেয়ে বড় শত্রু ষাঁড়ের আর কে আছে? এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তারা বোধ করি কল্পনা করতে পারে না। নির্মম ক্রূর স্বার্থান্ধ এক যূথবদ্ধ মানব-সম্প্রদায়। দৈহিক এবং সর্বপ্রকার আসুরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক বিশেষ জাতি। অন্তরলোকে উগ্র স্বার্থবুদ্ধির হিংস্র ক্ষুধা। আসুরিক শক্তিতে হিংস্র ক্ষুধায় তারা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে পদানত করবে; তারা হবে প্রভু, কর্তা; দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা; আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের গোলামী করবে; যে ধারায় তারা চিন্তা করতে বলবে সেই ধারায় মানুষকে চিন্তা করতে হবে—যে-রীতি যে-নীতি তারা প্রবর্তন করবে সেই রীতি-নীতি অনুযায়ী সমাজকে চলতে হবে, সামরিক নিষ্ঠুর হিংস্র বিধিবিধানে তার ক্ষীণতম প্রতিবাদের দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময় সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, এক কথায় সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সাধনার পথ রুদ্ধ হবে। এই ফ্যাসিবাদের অধীনে যে সাহিত্য যে শিল্প রচিত হবে তার কথা চিন্তা করতে গেলে আমার মনে পড়ে জেলখানার সতরঞ্চির কথা, ছোবড়া-পাকানো দড়ির কথা; যার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাকে পাকে নির্যাতিত মানবাত্মার অভিশাপ। এমন কূট কৌশলে রচিত ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপর এদের নববিধান রচিত হবে যে, এক পুরুষ কি দু-পুরুষ পরে মানুষ আর কল্পনাই করতে পারবে না যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় তাদের অধিকার আছে। উন্নততর জীবন, বৃহত্তর কল্যাণ, মহত্তর কল্পনা, সুন্দরতর সম্ভাবনার ও সাধনার কথা মনে করতে তারা শিউরে উঠবে। এক কথায় মানুষের জীবনের সুদীর্ঘ গৌরবময় ঊর্ধ্বমুখী প্রেরণা এবং আত্মদানের

যন্ত্রের বিরুদ্ধে এতবড় আসুরিক অভ্যুত্থান আর পৃথিবীর ইতিহাসে হয় নি। পঙ্গপাল আসে, একটা ঋতুর ফসল একদিনে ধ্বংস করে দিয়ে চলে যায়; বুনো কুকুরের দল তাদের পথে চলে, চলার পথের অধিবাসীদের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে রক্ত মাংসে উদরপূর্তি করে চলে যায়, তারা থাকে না। নব-ঋতুতে আবার ক্ষেত্র শস্য-সমৃদ্ধ হয়। কুকুরের দল চলে গেলে, যারা থাকে তারা আবার সংহত হয়, শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদ যদি জয়ী হয়, তবে সে হবে পৃথিবীর মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে পঙ্গপালের স্থায়ী স্থিতি। ফ্যাসিবাদের জীবননৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ বহু পণ্ডিতজনে করেছেন, করবেন। তাছাড়া মুষ্টিমেয় ক্লীব এবং সুবিধাবাদীদের যুক্তির প্রতিবাদে অধিক কথা বলার কোনো প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে যে-বিক্ষোভ উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের ভ্রান্ত দম্ভভরা শাসন-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় সেই বিক্ষোভই একমাত্র অন্তরায় হয়ে উঠেছে জন-শক্তির সংহতি গঠন এবং প্রেরণা উদ্বোধনের পথে। কেমন করে উন্মত্ত জন-শক্তিকে তাণ্ডব থেকে সংহত করে আজ এই বিশ্বমানবের এবং মানবতার বিরুদ্ধবাদী ধ্বংসকামী আসুরিক শক্তির বিপক্ষে উদ্যত করা যায় সেই হয়েছে সবাপেক্ষা বড় সমস্যার বিষয়।

এ বিষয়ে আমি এই সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি-সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য বাংলার মহাকবি যে-বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তা আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত রয়েছে—তারই প্রতিধ্বনি আমাদের তুলতে হবে :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

['অভিবাদন'। পৌষ-মাঘ, ১৩৪৯]

॥ ৬ ॥ সংস্কৃতি আন্দোলনের নূতন ধারা

চিন্মোহন সেহানবীশ

২০-এ জুন ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষী এক বিবৃতিতে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইঙ্গিত সোভিয়েতভূমির পরে বর্বর নাৎসি-বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সদ্যোজাত সোভিয়েত-সুহৃদ-আন্দোলন বহু বুদ্ধিজীবীকে আকর্ষণ করল। গান, প্রাচীর-পত্র ও পুস্তিকার মধ্য দিয়ে এই নূতন সংস্কৃতির সঙ্গে সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘ জনসাধারণের পরিচয় ঘটাতে লাগল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় এই সময়ে তাঁর অধুনা-বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'অরণি' প্রকাশ আরম্ভ করলেন। তাঁর চারদিকে এসে জুটলেন জনকয়েক তরুণ ও শক্তিশালী মার্কসবাদী লেখক, যাঁরা এতদিন বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে কোনোগতিকে প্রগতি আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। কমরেড বিনয় ঘোষের সাহিত্য-সমালোচনা ও সোভিয়েত সভ্যতা সম্পর্কে লেখা বইগুলি ইতোমধ্যেই পাঠকসমাজে চাঞ্চল্য এনেছিল। তিনি ও আরও অনেকে 'অরণি'র মধ্য দিয়ে বেশ একটা বলিষ্ঠ ভাবধারা প্রবাহিত করতে লাগলেন। ১৯৪২ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্বপ্রান্তে জাপানের তড়িৎ আক্রমণে ফ্যাসিস্ট বিপদের আসন্নতা বুদ্ধিজীবীকে আরও সজাগ করে তুলল। ছাত্রেরা একটি 'সংস্কৃতি বাহিনী'র সাহায্যে নাটক, গান ও প্রাচীর-পত্রের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের জিলাগুলিতে জাপবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে লাগল। তরুণ কবি সুভাষ মুখার্জির "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ" গানটি এই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই সময়ে একটি ঘটনা বাঙলাদেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল। ১৯৪২-এর ৮ মার্চ তারিখে কমরেড সোমেন চন্দ পঞ্চম বাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারান। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। বোঝা গেল বিশ্বব্যাপী জনমুক্তির যুদ্ধে মজুর ও চাষীর পাশে সাহিত্যিকদেরও ডাক পড়েছে তাঁদের সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রাণপাতের। বাঙলাদেশের ছোটবড় সমস্ত লেখক এক জ্বলন্ত বিবৃতিতে এই বর্বর হত্যার প্রতিবাদ জানালেন। ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচীর' নামক তাদের কবিতা সংকলন উৎসর্গ করা হল সোমেনের স্মৃতির প্রতি। সোমোনের মৃত্যুর অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল হল ২৮-এ মার্চ তারিখে কলকাতার ফ্যাসিস্ট-

বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন। এরই থেকে জন্ম হল 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র। তার সভাপতি হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

প্রথম থেকেই সংঘ বাঙলাদেশের বহু খ্যাতনামা কবি, নাট্যকার, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অভিনেতার সহযোগিতা পেয়ে আসছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিরণকুমার সান্যাল, হবিবুল্লা বাহার, আবু সৈয়দ আয়ুব, যামিনী রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই নানাভাবে এ সংঘের কাজে সাহায্য করেছিলেন। পুস্তিকা প্রকাশ, আলোচনা সভা, সাহিত্যিক মজলিস, গণসঙ্গীতের আসর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এদের কাজ এগিয়ে চলেছে। বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, বিজন রায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন (মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ), বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ প্রভৃতির লেখা পুস্তিকা সংঘের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছে তাদের 'জনযুদ্ধের গান'। এর দ্বিতীয় সংস্করণও (২০০০ কপি) সম্প্রতি নিঃশেষ হয়েছে।

১৯৪২ সালের ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর তারিখে সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), হবিবুল্লা বাহার, আবু সৈয়দ আয়ুব, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। বাঁকুড়া, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন। তা ছাড়া বাঙলার বাইরে থেকেও প্রতিনিধি বা অভিনন্দনলিপি মারফত সাড়া পাওয়া যায়। এই সম্মেলনের খবর দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বেশ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এখন পর্যন্ত সংগঠনের দিক থেকে দুবল। শিল্পীদের কাছে এখনও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায় নি। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মীর অভাব যথেষ্টই রয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি শহরের বুদ্ধিজীবী আবহাওয়া ও স্বতঃস্ফূর্তি থেকে সংঘের আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেবার আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে। মফস্বল থেকেও বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নৈহাটি, দিনাজপুর, রংপুর, হাওড়া ও গাইবাঁধা থেকে

ডাক এসেছে সংঘের কাছে এবং শীঘ্রই ঐখানে শাখা খোলবার চেষ্টা চলেছে। গান ও অভিনয়ের দুটি স্থায়ী দল দ্রুত গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে আগামী প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রায় পনরো জন প্রতিনিধি যাবেন। ঐ সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর জন্য সংঘ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম মনোনীত হয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের ২য় দিবসে সংঘের ধর্মতলা স্ট্রীটের কার্য্যালয়ে মফঃস্বল ও কলিকাতার প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠকে উৎসুক হয়ে বসে আছি। বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মৌখিক রিপোর্ট একের পর এক শুনছি আর ভাবছি আমাদের এই দুই বৎসরের এক-টানা প্রয়াসের ফলকে এতদিন যতটা কম মনে করে এসেছিলাম তা তো নয়। আমাদের শতেক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের আদর্শ বাস্তবে দানা বেঁধেছে। আজ বহু ক্ষেত্রেই আমাদের অজান্তেই বাঙলার বিভিন্ন স্থানে এক নতুনতর শিল্প-সংস্কৃতির নবাঙ্কুর দেখা দিয়েছে। কলমের ভরসা আজ আর স্বপ্ন নয়। এবারের সম্মেলন তারই প্রভাত-প্রারম্ভ।

*　　　*　　　*

ক্ষোভের কথাটা আগেই সেরে নিই। সম্মেলনের মূল অধিবেশন (দুদিনই) আমাদের নিরাশ করেছে। মফঃস্বলের প্রখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের এই বার্ষিক সম্মেলনে হাজির হতে না পারার নানা অনিবার্য কারণ হয়ত তো আছে। কিন্তু কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পী ও লেখক সমাজের অধিকাংশই ঐ সময় কলিকাতায় থেকেও এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শনি ও রবিবারের অপরাহ্ণে হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তাঁদের অনেকেই আমন্ত্রিত ও যথারীতি অনুরুদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত এলেন না এখনও তা ভাল করে বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁরা কি দু'দিনের একটা দিনেও একটুখানি সময় করে সম্মেলনে দর্শন দিতে পারেননি, বা পেরেও তো করেন নি? বলা বাহুল্য তাঁরা কেউ ফ্যাসিস্ট-বিরোধীতায় বিরোধী নন। তবে এই দুদিনে—সব চেয়ে বেশী যখন

সচেতন হওয়া প্রয়োজন সেই সময়—কালি ও কলমের এমন নীরব ঔদাসীন্যের অর্থ কি ?

যাক্, সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক উৎসব—অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল সেই দিকের সাফল্য আমাদের মূল অধিবেশনের দিকের আশাভঙ্গ অনেক পরিমাণে ঢেকে দিতে পেরেছে। খুশি হয়েছি বললে কম বলা হয়। সত্যি আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। বিভিন্ন জেলা থেকে নাচ-গান-অভিনয়ের যে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন তাঁরা স্ব স্ব জেলার শিল্পকলার বৈশিষ্ট ও মাধুর্য্যের।

এইখানে বাঙলাদেশে গানের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর সূত্রপাত ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের আমল থেকে। সে আন্দোলন ছিল একান্তভাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ—মজুর, কিষাণের সংগ্রামের সঙ্গে সে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই সময়কার কিছু গান নিয়ে কমরেড বিনয় রায় শুরু করেন তাঁর আন্দোলন। গোড়া থেকে তাঁর লক্ষ্য ছিল কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করা। বিটা কিষাণ সম্মেলন থেকে তিনি কিছু গান আনেন। ভারতভূষণ অগ্রবালের 'বড় চলো' গানও এই সময় পাওয়া গেল। এরই সাহায্যে 'সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধারম্ভের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি মাতিয়ে তুললেন সমস্ত জনসভাকে। এরপরে ডোমার কিষাণ সম্মেলনে তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষায় লেখা গেরিলা গান "হই হই হই" চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। মফস্বল থেকেও গান আসতে লাগল কিছু কিছু। বোম্বাই থেকে শেখা ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি হিন্দী গানও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানের আন্দোলন যে মধ্যবিত্তের আওতা থেকে ক্রমেই জনসাধারণের দিকে এগোচ্ছে তার আর-এক প্রমাণ বিভিন্ন জেলার চলিত ভাষার গান রচনা। মৈমনসিংহ-এর হাজং নামক আদিম জাতির মধ্যে জনযুদ্ধের গান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু একযোগে এই গান গায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাচে। মিশনারী প্রভাবধীন গারোদের মধ্যেও এই সুরের ছোঁয়াচ লাগছে। **সম্প্রতি কমরেড বিনয় রায় উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের ১০টি জেলায় ঘুরে ১৩টি কেন্দ্রে ৯০ জনকে গান শিখিয়েছেন, স্থানে স্থানে গানের কেন্দ্র স্থাপন করে এসেছেন।**

গোড়ার থেকেই এসব গান ছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী, কিন্তু প্রথম প্রথম মনে হত এর সঙ্গে বুঝি দেশের মাটির যোগ নেই। বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদই যে আজ ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ নিতে বাধ্য এ সত্য তখনও কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে, কি গানে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু পরে জনযুদ্ধের গানের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতের গোড়ার দিককার ব্যবধান ঘুচে গেল। জনযুদ্ধের গানই এ যুগের জাতীয় সঙ্গীতের রূপ নিল। "শোন মজুর কিষাণ দল" কিংবা কমরেড হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "ও তোর সোনার ধানে বর্গী নামে" যে কোনো জাতীয় সঙ্গীতের মতোই মর্মস্পর্শী। কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' যুগের অন্ধ পুনরাবৃত্তি নয়। ফ্যাসিস্টবিরোধিতা, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ও চাষীমজুরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এ গান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ভাষায় এল স্বচ্ছতা—বুদ্ধিজীবী প্যাঁচানো কথার জায়গায় এল সহজ ও মর্মস্পর্শী কথা। বর্তমানে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এই গানের আন্দোলনকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করছে।

কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দেখা যেতে লাগল, যদিও সত্যকার সৃষ্টির দিক থেকে বড় কিছু এখনও দেখা দেয় নি। বুদ্ধিজীবীসুলভ ঘোলাটে ভাবের কোয়াশাও সম্পূর্ণ কাটে নি। তবে জনযুদ্ধের তাণ্ডব জনসাধারণের মধ্যে যে আলোড়ন এনেছে তার মুখে এ সমস্ত বাধা তৃণের মতো ভেসে যাবে। মুষ্টিমেয়ের বিলাসের সামগ্রী থেকে সংস্কৃতি আজ গণআন্দোলনের মূর্ত প্রকাশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারদিকের সব লক্ষণ দেখে মনে হয় বাঙলা সংস্কৃতির ধারা আজ একটা বাঁকের মুখে।

[জনযুদ্ধ। ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৩]

॥ চ ॥ ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন (১৯৪৪) : রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, ভাষণ ও প্রস্তাব

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

গত ২ বছরের কাজের মধ্যে দিয়া ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে দেশের জনগণের যোগ আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই পথে বহু বাধা আসিয়াছে, সংকীর্ণ দলাদলি ও বিরুদ্ধতায় সঙ্ঘের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু তবুও এই সংঘ সমস্ত প্রতিকূলতা ভাঙ্গিয়া দিন দিন শক্তি লাভ করিতেছে। একদিকে দেশের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ও প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পীর দল সঙ্ঘের মধ্যে আসিতেছেন, অন্যদিকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এই সঙ্ঘের যোগ ক্রমেই নিবিড়তর হইতেছে।

এ বছর আমরা সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্য প্রতিভাকে পাইয়াছি। মঞ্চাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুরশিল্পী শচীনদেব বর্ম্মন, শিল্পী অতুল বসু এবং সুসাহিত্যিক গোপাল হালদার ও আবুল মনসুর আহম্মদ সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন।

বাংলার গণশিল্পীদের সমাবেশ

সম্মেলন উপলক্ষে এবার রংপুর, জলপাইগুড়ি, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, ২৪-পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় ১শত প্রতিনিধি অসিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন জেলায় লেখক, সুগায়ক ও বিশিষ্ট শিল্পীদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে কবি নিবারণ পণ্ডিত, শ্রীহট্ট হইতে গতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ও গায়ক নির্ম্মল চৌধুরী, রংপুর হইতে নৃত্যশিল্পী পান্থ ও কীর্ত্তনীয়া নগেন সা, মালদহ হইতে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে

গম্ভীরা দল, খুলনা হইতে সুগায়ক হিমাংশু চক্রবর্তী, যশোহর হইতে কবি গায়ক নেপাল সরকার, হুগলী হইতে কবি দয়াল কুমার প্রভৃতি আরও অনেকে প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেন। ২৪ পরগণা হইতে বাংলার বিখ্যাত লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শিল্পী হাসিরাশি দেবী এই সম্মেলনে জেলার প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছিলেন।

১৫ই জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্মেলন আরম্ভ হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বলিলেন, আমরা মানব জাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তারই বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে —দেশের এই সংকটেও বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম ট্যাক্স নিয়াছে। এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক কর্ত্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশকর্ম্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।

যুক্তপ্রদেশ প্রগতি লেখক সংঘের শিবদাশ সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যুক্ত সম্পাদক বিষ্ণু দে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আবদুল্লাহ রসুল সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। ইহার পর সংঘের বিদায়ী সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ গত বছরের কাজের বিবরণী পাঠ করেন। অবন্তী সান্ন্যাল ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

মূল সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অভিভাষণে বলেন, অন্য সাহিত্য সভাগুলি হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিতিকেরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন, তাহাদের কি কর্ত্তব্য আছে, কি তাহারা দিতে পারে তাহাই জানিয়া যান। এই জন্যই তিনি এই সভায় আসিয়াছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহা বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নতুন নাম

নিয়াছে তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নতুন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে। ফ্যাসিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে। ইহা স্মরণ করিয়াই এই সংঘবদ্ধতা। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম। সাহিত্যিককে আজ সজাগ হইতে হইবে—বেশী কথা বলিতে পারি বলিয়াই মানুষের সহজ সত্য ও শুভচিন্তাকে আমরা যেন বিভ্রান্ত না করি।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি উৎসব

১৬ই জানুয়ারী। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৬ হাজার লোকের সম্মুখে জনগণের সংস্কৃতি উৎসব।

কলিকাতায় এমন উৎসব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট শিল্পীর দল আসিয়াছেন। তাঁরা কেহই সৌখীন গায়ক ও শিল্পী নন। শিল্প পদ্ধতি তাঁহাদের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে ইহাদের যোগ প্রত্যক্ষ। তাই ইঁহাদের শিল্পকৌশল ব্যর্থ হয় নাই। বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দর্শকদের কাছে ইঁহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন, এঁরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই ইহাদের শিল্প প্রকাশ এত সার্থক। দেশের সংস্কৃতি আজ ইহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে।

কলিকাতার হরিপদ কুশারীর মর্ম্মস্পর্শী গানে উৎসব আরম্ভ হইল। ইহার পর শুরু হইল বিভিন্ন জেলায় গায়ক দলের গান। শ্রীহট্টের নির্মল চৌধুরী সদলবলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কয়েকখানি গান করিলেন। প্রতেকটি গানে দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলার লোকশিল্পী যে খনির মত সমৃদ্ধ—ইহার মধ্য দিয়াই যে জনগণের মধ্যে নূতন সাড়া জাগানো যায়, আমরা তার পরিচয় পাইলাম। শ্রীহট্টের চা বাগানের কর্মী সুধাংশু ঘোষের লেখা চা-কুলির গানের সঙ্গে কলিকাতার অন্নদাসগুপ্ত চা কুলির নাচ দেখাইলেন। ইহার পর মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও চব্বিশপরগণার প্রতিনিধিদল গান করিলেন। খুলনার হিমাংশু চক্রবর্তীর গানে সকলেই মুগ্ধ হন। সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করিল রংপুর দলের গান ও নাচ। পানু পাল ও রেবা রায়ের 'মহাবুভুক্ষা নৃত্য' সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। কলিকাতার দল পোর্ট মজুর রাজকুমার সিংহের লেখা একটি গান করেন। পাঞ্জাব প্রত্যাগত প্রচারক দল বিনয় রায়ের নেতৃত্বে 'ম্যায় ভূখা হুঁ' নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। ইহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লেখক ও শিল্পী সংঘের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাইলেন। দু'পয়সা, এক পয়সা এমনকি আধলাও পর্যন্ত সাহায্য আসিল। মোট ৬৬৭৯১৬॥ পয়সা তহবিলে উঠিল।

রবিবার বিকেলে আবার সাধারণ অধিবেশন। শিল্পী অতুল বসু বলিলেন প্রচলিত পথে চলার সুবিধা আর নূতন কিছু করার মোহ—এই দুইই ক্ষতিকর। শিল্পরূপে আজ দেশের কথা বলিতে হইবে ; দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াই শিল্প সৃষ্টি করিতে হইবে। লেখক এ শিল্পী যে জনগণের জীবনের মূল সমস্যাগুলি বাদ দিয়া চলিতে পারে না এবং তার জন্যই যে তাদের সামাজিক চেতনা দরকার শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের অভিভাষণে সেই দাবিই ধ্বনিত হয়।

আবুল মনসুর আহম্মদ বলেন লেখক ও শিল্পী আকাশচারী হইতে পারে না। দেশবাসীর চিন্তা ও কল্যাণবোধই শিল্পীর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসিজমের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।

সভায় শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সোভিয়েট চীন ও অপরাপর ফ্যাসিস্ট পদানত দেশগুলির নির্য্যাতিত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব আনেন। অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় ও চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ বসু এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। অপর একটি প্রস্তাবে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রচারের দাবি জানাইয়া অধ্যাপক নীহার সরকার একটি প্রস্তাব আনেন, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সোমবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। আগের দিন টিকিট নিঃশেষ হইয়াছে। দলে দলে লোক টিকিটের অভাবে ফিরিয়া গেল। মিনার্ভার কর্মচারীরা বলিতেছিল, থিয়েটারে এমন ভীড় ও দর্শকদের এত

উৎসাহ আগে কখনও দেখি নাই। বিখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন জেলা হইতে গান ও নাচ দেখানো হইল। মালদহের প্রতিনিধিরা গম্ভীরা গান করিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক প্রত্যেককে মুগ্ধ করিল। পাঞ্জাবের এক দর্জিবউ বাংলার সাহায্যে বাংলার প্রচারকদলকে তার শেষ সম্বল এয়োতির চিহ্ন একজোড়া চুড়ি দান করে। সেই চুড়ি ঐ দিন দিন নিলামে ডাকা হয়। জনৈক ছাত্র ১১০০ টাকা দিয়া উহা ডাকিয়া নেন।

[জনযুদ্ধ। ২৬।১। '৪৪]

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের ২য় দিবসে সঙ্ঘের ধর্মতলা স্ট্রীটের কার্যালয়ে মফঃস্বল ও কলিকাতার প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠকে উৎসুক হয়ে বসে আছি। বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মৌখিক রিপোর্ট একের পর এক শুনছি আর ভাবছি আমাদের এই দুই বৎসরের একটানা প্রয়াসের ফলকে এতদিন যতটা কম মনে করে এসেছিলাম তা তো নয়। আমাদের শতেক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের আদর্শ বাস্তবে দানা বেঁধেছে। আজ বহু ক্ষেত্রেই আমাদের অজ্ঞাতেই বাঙলার বিভিন্ন স্থানে এক নতুনতর শিল্প-সংস্কৃতির নবাঙ্কুর দেখা দিয়েছে। কলমের ভরসা আজ আর স্বপ্ন নয়। এবারের সম্মেলন তারই প্রভাত-প্রারম্ভ।

* * *

ক্ষোভের কথাটা আগেই সেরে নিই। সম্মেলনের মূল অধিবেশন (দুদিনই) আমাদের নিরাশ করেছে। মফঃস্বলের প্রখ্যাত লেখক ও শিল্পীদের এই বার্ষিক সম্মেলনে হাজির হতে না পারায় নানা অনিবার্য কারণ হয়ত তো আছে। কিন্তু কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পী ও লেখক সমাজের অধিকাংশই ঐ সময় কলিকাতায় থেকেও এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শনি ও রবিবারের অপরাহ্ণে হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তাঁদের অনেকেই আমন্ত্রিত ও যথারীতি অনুরুদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত এলেন না এখনও তা ভাল করে বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁরা কি দু'দিনের একটা দিনেও একটুখানি সময় করে সম্মেলনে দর্শন দিতে পারেন নি, বা পেরেও তা করেন নি? বলা বাহুল্য তাঁরা কেউ ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার বিরোধী নন। তবে এই দুর্দিনে—সবচেয়ে বেশী যখন সচেতন হওয়া প্রয়োজন সেই সময়—কালি ও কলমের এমন নীরব ঔদাসীন্যের অর্থ কি?

* * *

যাক্ সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল সেই দিকের সাফল্য আমাদের মূল অধিবেশনের দিকের আশা ভঙ্গ অনেক পরিমাণে ঢেকে দিতে পেরেছে। খুশি হয়েছি বললে কম বলা হয়। সত্যি আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। বিভিন্ন জেলা থেকে নাচ-গান-অভিনয়ের যে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন তাঁরা স্ব স্ব জেলায় লোক-কলার বৈশিষ্ট ও মাধুর্যের পরিচয় দিয়ে শহরের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মনোরঞ্জন করে নতুন পথের নির্দেশ রেখে গেছেন। আবার শহরের শিল্পীদের সঙ্গীত ও অভিনয়নৈপুণ্য দেখেশুনে তাঁরা বেশ কিছুটা নতুন পাথেয় নিয়ে গেলেন। উভয়পক্ষের দান প্রতিদানে এমনি করে গড়ে উঠবে নতুন শিল্প-সংস্কৃতির ইমারত।

*   *

প্রারম্ভের প্রয়াসে অল্পবিস্তর গলদ রয়েছে এখনো, অনভ্যস্ত পথে নতুন অভ্যাসের পদক্ষেপ হয়ত কোথাও বড় রকমের ছন্দ-পতনও ঘটেছে। সে কথা আলাদা। সে কথাটা বড়ও নয়। আসল কথা বর্তমান বাঙলা সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক একঘেঁয়েমির অবাধ অসহ্য রাজত্ব চলছে, সেই সমুচ্চ সৃষ্টি-চাতুর্য্যের পাশাপাশি, বা বলতে পারি তার পায়ের তলা দিয়ে, আজ নবযুগের সৃজনীশক্তির যে ক্ষীণ স্রোত দেখা যাচ্ছে তা বৃহত্তর ভবিষ্যতের মহত্তর ভরসায় ভরা। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের অনুষ্ঠানে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন না আমাদের উচ্ছ্বসিত উক্তি তাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হবে হয়তো। পরদিন মিনার্ভা থিয়েটারে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা বোধহয় বুঝতেই চাইবেন না যে, মরা গাঙে সত্যি এবার বান ডাকার ভরসা পৌছে গেছে। দেশের অজ্ঞতা-নিমগ্ন জনগণের সুখ-দুঃখের জগতের সঙ্গে দেশের সমাজ সচেতন মনন-রাজ্যের বহুকাল বিচ্ছিন্ন ও বহুদিন প্রত্যাশিত আদান-প্রদানের পালা শুরু হয়েছে। দিন আগত ঐ।

*   *

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হাজার সাতেক লোকের সামনে শুরু হল গণ-সংস্কৃতির উৎসব।

উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইলেন যিনি সেই হরিপদ কুশরী কে? চমৎকার তাঁর কণ্ঠস্বর। গাইলেনও চমৎকার। তাঁকে জনসভায় জনসঙ্গীত গাইবার কাজে আরও বেশী করে আসতে হবে। ভালো করে গাইতে না জানলে

ভালো গানও জনমনে সাড়া তোলে না একথা তাঁর ও আমাদের মনে রাখতে হবে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের অনুষ্ঠান মাত করে রেখেছিল বিশেষ করে শ্রীহট্টের ও রংপুরের দল, আর সর্বশেষ হিন্দী নৃত্যনাট্য "ম্যায় ভূখা হুঁ"। গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "লাঙ্গল চালাই, আমরা কোদাল চালাই" ও তাঁরই দলের নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় গীত চা-কুলির গান ও "চাঙ্গোয়ায় বঁধুয়ারে"—এই তিনখানি গান এত ভাল গাওয়া হয়েছিল এবং সকলেরই এত ভাল লেগেছিল যে আজ কলিকাতার বহু ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় ঐ তিনটি গানের বিচ্ছিন্ন কথা ও সুর বহু কণ্ঠে স্বচ্ছন্দে খেলছে।

* *

খুলনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণার দলও তাঁদের গান শোনালেন। রংপুর দলের পান্থু পাল ও রেবা রায়ের "মহাবুভুক্ষা নৃত্য" সহস্র করতালির মধ্যে শেষ হল। শ্রীহট্ট দলের গানের সঙ্গে চা-বাগানের কুলি রমণীর নৃত্যে কলকাতার অনু দাশগুপ্তা চমৎকার নেচেছিলেন। এই নাচের সঙ্গে গান গেয়ে আর নেচে পটভূমির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সাধনা বসু, তৃপ্তি ভাদুড়ী, ভূপতি নন্দী, সাধনা গুহ, সুরপতি নন্দী ও নির্মল চৌধুরী। সুরে নাচে কথায় মিলে সব নিয়ে সে এক উপভোগ্য দৃশ্য! আরো অনেকের গানের ও অভিনয়ের কৃতিত্বের কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু স্থানাভাব। রিপোর্ট এরই মধ্যে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এখনো প্রধান দুটো সাফল্যের কথা বাকী আছে—বিজন ভট্টাচার্যের "জবানবন্দী" নাটিকা ও বিনয় রায়ের "ম্যায় ভূখা হুঁ" নৃত্যনাট্যের অভিনয়।

* *

"ম্যায় ভুখা হুঁ" দু'দিন অভিনীত হয়েছিল।—একবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উন্মুক্ত আসরে আর একবার আলোকোজ্জ্বল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। দু'জায়গাতেই দর্শকদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া পড়ে গিয়েছিল। স্বয়ং বিনয় রায়, ভূপতি নন্দী, নরেন ভট্টাচার্য, ধীরেন গুপ্ত, রঞ্জিত বসু, হিমাংশু চক্রবর্তী—সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। এই নৃত্যনাট্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বুভুক্ষু কিষাণীর ভূমিকায় তৃপ্তি ভাদুড়ীর অভিনয়। এই বিয়োগান্ত চরিত্রটিতে আগাগোড়া অতি-অভিনয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তৃপ্তি ভাদুড়ী তাঁর সুন্দর ও সংযত অভিনয়ের গুণে দু'দিনই সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। সর্বশেষে

স্বেচ্ছাসেবিকার বেশে সাধনা গুহের মধুর কণ্ঠের উদ্দীপনাময় "শুনো শুনো হিন্দ্‌কে রহনেওয়ালো" গানখানি উৎকর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অদ্ভুত স্পন্দন জাগিয়েছিল।

* *

মিনার্ভার পাদপ্রদীপের সামনে পূর্বদিনের শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দু'একটা নাচ-গান বাদে আর সবই আবার নতুন করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মালদহের গম্ভীরা গান দিয়ে উদ্বোধন হয়।

এ দিনের সর্বাধিক আকর্ষণের বস্তু "জবানবন্দী"। অভিনয়ের কথা বলবার আগে নাটকটির সম্পর্কে দু'চার কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিচারে এই নাটিকার একাধিক গলদ হয়ত বার হবে। জবানবন্দীর বিশেষত্ব আঙ্গিকের নৈপুণ্যেও নয়, অভিনব বিষয়বস্তুর নির্বাচনেও নয়। "জবানবন্দী" আমাদের অনেকের বহুদিনের বিচার বিতর্কের একটা সুন্দর জোরালো জবাব। কোন সাময়িক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাকে উপজীব্য করে কোন উদ্দেশ্য বা মতবাদ প্রকাশের বাহন হোতে গেলে সেই সাহিত্যসৃষ্টি খাঁটি রস-সৃষ্টি হয় কিনা এই নিয়ে সাহিত্য সমালোচক মহলে সংশয়ের অন্ত নেই। বিজন ভট্টাচার্যের দুঃসাহস বা সৎসাহস রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। হতে পেরেছে এই জন্য যে, তিনি তালমাত্র বজায় রেখে সমস্যাকে নিছক প্রোপাগাণ্ডা করে তোলেন নি —কোথাও এতটুকু বক্তৃতার বা স্পষ্টপ্রিয়তার আশ্রয় না নিয়ে ঘটনার সুকৌশল সমাবেশে ও সরস সংলাপের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত যা শোনাতে বোঝাতে চেয়েছেন তার আবেদন এত সহজ ও অপ্রতিরোধ্য হতে পেরেছে শিল্পধর্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই। এক কথায় 'জবানবন্দী' tendentious সাহিত্যের কোঠায় পড়েও জাত খোয়ায় নি। আমাদের সাহিত্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল।

* *

এবার অভিনয়ের কথায় আসা যাক। প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রে নেমে-ছিলেন গঙ্গাপদ বসু ও বিজন ভট্টাচার্য। দু'জনের নিখুঁত অভিনয় শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ভূমিকায় নেমেও সুধী প্রধান চমৎকার অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'পদা' আর 'বোন্দা' এই দু'জনে যেন 'এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।' ছোট-

খাট পাটগুলোও বেশ উতরে গেছে। এদের মধ্যে রবি মজুমদারের 'ভদ্দর-নোক' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়ে চরিত্রের মধ্যে তৃপ্তি ভাদুড়ী ও অন্থু দাসগুপ্তা—বোন্দার বৌ ও বোন্দার মা—দু'জনেই যেন পাল্লা দিয়ে অতিসুন্দর অভিনয় করেছেন। সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সাত বছরের মেয়ে মণিকা ভট্টাচার্য্য। বোন্দার অস্থিসার পুত্রের ভূমিকায় মরণের মুখে ঐটুকু মেয়ে সহস্রাধিক দর্শকের সামনে অনায়াসে কি দুর্দান্ত অভিনয় করল!

*　　　　　　　　*

সংস্কৃতি উৎসবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে ময়মনসিংহের পল্লী কবি নিবারণ পণ্ডিতের ছড়া-গান ও যশোহরের কবি-গায়ক নেপাল সরকারের তরজার কথা বাদ পড়লে মস্ত ত্রুটি থেকে যাবে। অবশ্য ডেলিগেটরা ছাড়া বাইরের আর কেউ ঐ ছড়া ও তরজার আস্বাদ পান নি।

আসছে বারের সম্মেলন নিশ্চয় আরো ভালো হবে। আরো ভালো গায়ক ও আরো ভালো নাচ-গান-ছড়া-তরজা-যাত্রা-নাটিকা নিয়ে বাঙলার বিভিন্ন জেলা আরো বেশী দলে ভারি হয়ে রাজধানীর নিখিল বঙ্গ সম্মেলনে আবার আসবে। ইতিমধ্যে এখন থেকেই বেশ একটু গর্ব্ব নিয়ে বলতে পারি, এঁরা সকল দল মিলে এবার যা দেখালেন ও শোনালেন কলকাতার কোন পেশাদার বা এ্যামেচার পার্টির অনুষ্ঠানে তা কোনদিন কেউ আশা করতেই পারেন না। কারণ স্পষ্ট। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণ থেকে দু'টো কথা তুলে দিয়ে এবার রিপোর্ট শেষ করি: "এঁরা একটা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলেই এঁদের শিল্প-প্রকাশ এত সার্থক আর সুন্দর হতে পেরেছে। দেশের সংস্কৃতি আজ এঁদের আন্দোলনে নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে।"

—অনামী। [অরণি। ৪।২। '৪৪]

॥ শিল্পী ও সাহিত্যিকের দায়িত্ব ॥

[নিখিলবঙ্গ দ্বিতীয় বার্ষিক ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে আবুল মনসুর আহ্‌মদের পঠিত অভিভাষণ]

বন্ধুগণ,

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের এই সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর তরফ থেকে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করতে গিয়ে সবার আগে আমার মনে যে কথাটা জাগছে, তা শুরুতেই খোলাখুলিভাবে না বলে পারছি না। সে কথাটা হচ্ছে এই যে, আমরা কি বাঙলার জনসাধারণের সমবেত মনের প্রতিনিধিত্ব করছি? আমাদের পিতৃভূমির বাসিন্দাদের সকলের না হোক অধিকাংশের, প্রকাশিত না হোক প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারাই কি আমাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে! না, আমরা কোন বহিঃশক্তির প্রচার-বন্যায় ভেসে চলেছি? আমরা কি কারো ধার করা কথা আবৃত্তি করতে গিয়ে নিজের দেশবাসীর আশা-আকাংখাকে পদদলিত করছি? তাদের চিন্তাধারা ও কল্যাণ-বোধকে উপেক্ষা করেছি?

এ কথা উঠছে এই জন্য যে, লেখক ও শিল্পী আকাশচারী হতে পারে না। দেশবাসীর মনটাই রূপায়িত হয়ে উঠবে লেখকের কলমে ও শিল্পীর তুলিতে। আমাদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতায় আমরা যদি দেশবাসীর চিন্তাধারা ও কল্যাণ-বোধকেই রূপায়িত করে না থাকি তবে আমার মতে আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা ব্যর্থ।

ভারতের, বিশেষকরে বাঙলার, সাহিত্যসেবী ও শিল্প-সাধক হিসাবে ভারত ও বাঙলার মনীষা ও মানসকে রূপায়িত করাই আমাদের দায়িত্ব। ভারতের মানস ও ফ্যাসিজ্‌মের মধ্যে বিরোধ আছে কি মিল আছে, তা বুঝতে হলে এ-দুটো সম্বন্ধেই ধারণা থাকা দরকার।

প্রথমতঃ দেখা যাক ফ্যাসিজ্‌মটা কি? মুসোলিনীর আত্মজীবনী, হিটলারের 'মাইন কাম্প' ও রোজেনবার্গের 'মাইথাস' থেকেই ফ্যাসিজ্‌ম বুঝতে হবে। 'মাইন কাম্প' ও 'মাইথাস'-কে আধুনিক জার্মান জাতির যথাক্রমে বাইবেল ও 'মথির-লেখা সুসমাচার' বলা যেতে পারে। ফ্যাসিজ্‌ম শুধু আধুনিক ইতালীয় ও জার্মান জাতির জীবন-দর্শন নয়, এটাকে তারা

তাদের বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে পরিণত করবার সংকল্প করেছে। কোন দেশের জনসাধারণকে যে-কোন শিক্ষা দেবার অধিকার সে জাতির জাতীয় নেতাদের রয়েছে। সাহিত্যসেবী ও শিল্পীদের তাতে আপত্তি থাকতে পারেনা। কারণ সাহিত্যসেবী ও শিল্পীর জীবনাদর্শই হচ্ছে সকল জাতিকে তার কৃষ্টি ও সভ্যতা অনুসারে জীবন বিকাশের স্বাধীনতা দেওয়া। সে হিসাবে জার্মানী ও ইতালীর জাতীয় নেতারা ঐ দুই দেশের জনসাধারণের স্বার্থ ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে তাদেরকে যে-কোন পথে পরিচালিত করবেন, তাতে বাংলা ও ভারতের সাহিত্যিকদের কি আপত্তির কারণ থাকতে পারে! কিন্তু ফ্যাসিজ্‌ম শুধু ভৌগোলিক চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ একটা জাতীয় জীবন-দর্শন নয়। এটার জন্ম হয়েছে মার্ক্সীয় সাম্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা হন্তা হিসাবে। সাম্যবাদ একটা বিশ্ব-রাজনীতি। তার শত্রু ফ্যাসিজ্‌মকেও এই বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতি হিসাবেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। মুসোলিনীর ফ্যাসিজ্‌ম তাই হিটলারের নেতৃত্বে বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতি হিসাবে সাম্যবাদের স্থান দখল করার প্রয়াস পাচ্ছে। সাম্যবাদ রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে পরিণত করতে চায়। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রহীন পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে সাম্যবাদীরা প্রকৃত গণতন্ত্র বলে স্বীকার করে না, এটাকে তারা ধনতান্ত্রিক ধাপ্পাবাজী বলে থাকে। সাম্যবাদীদের প্রায়-সাফল্যে যখন ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট বিক্ষোভ ও সুদৃঢ় মতবাদ গড়ে উঠেছে, তখনই ইউরোপে ফ্যাসিজ্‌মের জন্ম। ফ্যাসিস্টরাও কঠোর ভাষায় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে গাল দিতে শুরু করে। সুতরাং এইখানে সাম্যবাদী ও ফ্যাসিস্টদের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। এতেই ইউরোপের জনসাধারণ বিশেষতঃ ইতালী ও জার্মানীর জনসাধারণ সাময়িকভাবে প্রতারিত হয়। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯১৯ সালের দ্বৈতশাসন ও ১৯৩৫ সালের তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের নিন্দায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও বিলাতের রক্ষণশীল দল উভয়েই একমত। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য শুধু যে এক নয় সে নয়, বরঞ্চ বিপরীত। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এর নিন্দা করেছেন ওর বদলে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করতে; আর রক্ষণশীল দল ওর নিন্দা করেছে ও সব ফিরিয়ে নিয়ে লাটশাসনের পুনঃপ্রবর্তন করতে। ঠিক সেইরূপ সাম্যবাদী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের নিন্দে করেছে ওর বদলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে। আর ফ্যাসিস্টরা ওর নিন্দে করেছে

ওর বদলে নিরঙ্কুশ শ্রেণী শাসনের পুনঃপ্রবর্তন করতে। এটা কি বিদঘুটে আকারে ফ্যাসিজ্‌মে রূপায়িত হতে যাচ্ছে, তা দেখা যাবে 'মাইনকাম্প' ও 'মাইথাস' পড়লে। এতে ফ্যাসিজ্‌মের আদর্শ ও কর্মপন্থা হিসাবে এই কয়টিকে মূলনীতি ধরা হয়েছে :

ক) রক্ত-কৌলিন্য। জার্মানজাতিই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। পৃথিবী শাসন করবার অধিকার তাঁদের একলার।

খ) গণতন্ত্র একটা আস্ত পাগলামী, কারণ দশটা আহাম্মক মিলে একটা বুদ্ধিমান হয় না। জার্মান জাতির সকলেই যে গণতান্ত্রিকভাবে সমানাধিকার পাবে তা নয়। শাসন ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকেরই থাকতে পারে। তাদেরই নাগরিক বলে গন্য করা হবে; তারাই রাজ্য শাসন করবে, আর সকলে 'হুকুমবরদারী' করবে মাত্র।

গ) জনসাধারণ নির্বোধ মেষের পাল মাত্র। তাদের হাতে শাসন ক্ষমতার ভোটাধিকার না দিয়ে তাদের শ্রমের কাজে খাটানোই উচিত। পশু খাটিয়ে সভ্যতার যতটা লাভ হচ্ছে মানুষ খাটিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হবে। কাজেই জার্মানজাতির বুদ্ধিমান নেতারা বিশ্বের সকল মানুষকে খাটালেই বিশ্ব-সভ্যতার অধিকতর কল্যাণ হবে।

ঘ) জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা জার্মান জাতিরই দান। এর উন্নতি বিধানও এক জার্মান জাতিই করতে পারে। কাজেই অপর সকল জাতির স্বাধীন চিন্তাকে এবং জাতি হিসাবে অপর সকল জাতিকে নির্মূল করলে বিশ্বে সুন্দর সভ্যতা গড়ে উঠবে।

ঙ) এ সব কাজ করতে গেলে বিশ্বের সকল জাতির রাষ্ট্র-ক্ষমতা লোপ করে জার্মান জাতির রাষ্ট্রপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ কাজে যতটা প্রয়োজন বলপ্রয়োগ করতে হবে।

উপরে ফ্যাসিজ্‌মের যে কূটনীতি বর্ণনা করা গেল, তার সবটাই 'মাইন-কাম্প' ও 'মাইথাস' এর বাক্য-উদ্ধৃতি, একটাও অতিরঞ্জিত বা অভিভাষণ নয়। এখন আপনারা বিচার করুন, ফ্যাসিজ্‌ম শুধু ভারতীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই আদর্শ বিরোধী, না ভারতীয় জনসাধারণেরও শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরোধী। ভারতের জনসাধারণ প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু জীবনাদর্শের সঙ্গে ফ্যাসিজ্‌মের বিরোধ আছে কিনা, থাকলে তা কোথায়, তার আলোচনা সভাপতিমণ্ডলীর

হিন্দুভ্রাতার যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চয় করবেন। আমি ভারতীয় মুসলমানদের জীবনাদর্শ থেকেই ফ্যাসিজ্‌মের বিচার করবো। হিন্দু জীবনাদর্শ ও ফ্যাসিজ্‌ম সম্পর্কে আমি শুধু দুইটি কথা নিবেদন করে রাখবো।

প্রথমতঃ হিটলার আর্য্য-কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে ফ্যাসিজ্‌মের জীবনদর্শন খাড়া করেছেন বলে অনেক হিন্দু ভ্রাতার এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'আর্য্য' জাতির মানে হিটলারের কাছে যে শুধুই জার্মান জাতি একথা 'মাইনকাম্প' ও 'মাইথাসে' পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে এশিয়াবাসীকে এবং বিশেষভাবে ভারতবাসীকে হিটলার কতটা ঘৃণা করেন তা 'মাইনকাম্পে' স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ হিটলারের রক্ত-কৌলীন্যের সঙ্গে হিন্দু ভাইদের বর্ণাশ্রম-ধর্মের একটা মিল রয়েছে বলেও অনেক হিন্দু ভ্রাতা প্রতারিত হতে পারেন। কিন্তু এ মিল নিতান্তই উপরের মিল—ভিতরের মিল নয়। কারণ হিন্দু বর্ণাশ্রম-ধর্ম বংশ কৌলীন্য ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে বটে, কিন্তু হিটলারের রক্ত-কৌলীন্যের সঙ্গে তার একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ব্রাহ্মণের বংশ-কৌলীন্য রাষ্ট্রক্ষমতার দ্বারা সুরক্ষিত নয়। বরঞ্চ ব্রাহ্মণকে রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার ষোল আনা দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রিয়ের হাতে। বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণের বংশ-কৌলীন্যের ভিত্তি ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব। সে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার অস্ত্র তার পৈতা, নামাবলী, কমণ্ডুল, অভিশাপ। আর ফ্যাসিজ্‌মে জার্মান শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নাৎসি দলের দান করা জার্মান-নাগরিকতা। সে শ্রেষ্ঠত্বরক্ষার অস্ত্র জার্মান এস এস দল ও গোষ্টপোর রিভলভার, জার্মান তুফান ফৌজের মেসিনগান, জার্মান মেসারস্মিটের ব্লিৎসক্রগ।

আমি এখন মুসলমানের দিক থেকে ফ্যাসিজমের বিচার করবো। প্রথমতঃ ধরুণ রক্ত কৌলীন্যের কথা, জার্মান জাতির অনাদি অনন্ত শ্রেষ্ঠত্বের কথা। এটা ইস্‌লামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। ইসলাম রক্তকৌলীন্যে বিশ্বাসী নয়। ইস্‌লামের ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফের ৪৯ সুরা ১৩ রুকুতে বলা হয়েছে: হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ (আদম) ও একটি নারী (হাওয়া) থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন পরিবার, শ্রেণী ও জাতিতে ভাগ করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পার। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের কর্তব্য ভালো করে সম্পাদন করবে, আমার কাছে

তারাই বেশী সম্মান পাবে। ঐ ৪৯ সুরার ১ রুকুতে বলা হয়েছে: দুনিয়ার যে জাতিতেই তোমরা জন্মাও না কেন, যদি ইসলামে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পার, কারণ সব মুসলমানই পরস্পরের ভাই। ৯সুরার ২২ রুকুতে ঘোষণা করা হয়েছে: খোদা-বিশ্বাসী নারী ও খোদা-বিশ্বাসী পুরুষ তারা যে দেশের বা যে জাতিরই হোক না কেন, পরস্পরের আত্মীয়। কোরআন শরীফের ঐ সব মহাবাক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত মোহম্মদ হাদিস শরীফে বলেছেন: আরব জাতিও অ- আরব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। সাদা জাতিসমুহ কালো জাতিসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কালো জাতিসমূহ ও সাদা জাতিসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আসল শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সৎকাজে। কোরআন ও হাদিস শরীফের এই যে শিক্ষা এটা মুসলমান জাতির কেতাবী মতবাদ নয়; মুসলমান তার ধর্মজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে হাতে কলমে এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে থাকে। তার মসজিদে সমাজে, সর্ব্বত্র এই মূলনীতি সে মেনে চলে থাকে।

তারপর ধরুণ জন্মগত ও বিশ্বাসগত সংস্কৃতির কথা। হিটলার 'মাইন-কাম্পের' ৪৩৩ শ্লোকে বলেছেন: জাতিত্বটা ভাষা বা ধর্মবিশ্বাসের বস্তু নয়, এটা রক্তের ব্যাপার। তোমার ভাষা ও ধর্মবিশ্বাস দিয়ে কোন মানুষকে তুমি তোমার জাতে তুলে নিতে পার না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ল্যাপল্যাণ্ডের এস্কিমোকে তুমি যতই শিক্ষা দাও না কেন সংস্কৃতির অধিকারী হতে পারে না। সংস্কৃতির অধিকারী একমাত্র আর্য্যরা।

এটা যতই অবৈজ্ঞানিক কথা হোক না কেন, সে কথা এখানে আমি বলবো না। আমি শুধু বলবো যে, একথা ইস্‌লামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইস্‌লামের শিক্ষা এই যে, যে কোন দেশের যে কোন জাতির যে কোন বর্ণের মানুষ ইস্‌লাম গ্রহণ করলেই সে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির স্রষ্টা ও অধিকারী হতে পারে। ইস্‌লামের শুরুতেই হাবসী গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে হজরত পয়গম্বর সাহেবের প্রিয়া সহচররূপে সমস্ত মুসলমানের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

এর পরে ধরা যাক মানুষ সম্পর্কে ফ্যাসিজমের ধারণা 'মাইনকাম্পে'র ৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: জনসাধারণ মস্তিষ্কবিহীন মেষপাল। ১৯৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: জনসাধারণ মূর্তিমান নিবুদ্ধিতা, তাদের কিছু বুঝবার সামর্থ্য নেই তাদের বুদ্ধি বিবেচনা নগন্য। ৩০২ শ্লোকে হিটলার বলেছেন: বাগ্মিতার জোরে এই নির্বোধ পালকে বেহেস্তকে দুজখ ও দুজখকে বেহেসত বলে

বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। জনসাধারণের বুদ্ধি বিবেচনার এইরূপ তারিফ করে হিটলার 'মাইন-কাম্পের' ৫২৪ শ্লোকে বলেছেন: "নিছক বাগ্মিতার জোরেই আমি জনসাধারণের কাছে প্রকাণ্ড মিথ্যা জায়গায় বিরাট সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।" তার মানে, প্রকৃত মিথ্যাকে বিরাট সত্য বলে চালিয়ে দিয়েছি।

হিটলার প্রচারের জোরে কতটা করেছেন, আবার জবরদস্তিতে কতটা করেছেন, সে কথা আমি আজ বলব না। আমি এখানে শুধু বলবো এই যে, ইসলামের শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক শিক্ষা এটা নয়। 'মাইন-কাম্পে' আরো বলা হয়েছে যে গণতন্ত্র চলতে পারে না এইজন্য যে একশ আহাম্মক একজন বুদ্ধিমানের সমান পারে না। কথাটা ইন্টেলেকচুয়ালী যতই সত্য হোক, এটা গণতন্ত্রের বিরোধী যুক্তি হতে পারেনা। গণতন্ত্র কখনো বলে নি যে, একশো আহাম্মকের বুদ্ধি একত্রে করলে তার যোগফল একটি বুদ্ধিমানের কাজের সমান হয়ে যায়। তবু যে এই কথাটাকেই ফ্যাসিজমের যুক্তিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে, ফ্যাসিজমের বিপদ এইখানেই। "তুমি ছোট", "তুমি কিছু বুঝো না" বলতে বলতে লোককে হিপনটাইজড্ করবার যে সনাতন ধারা রয়েছে, ফ্যাসিজ্‌ম রাজনীতিক্ষেত্রে এই প্রয়োগ করেছে। সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রতীক ইস্‌লাম এই ফ্যাসিজ্‌মকে বরদাস্ত করতে পারে না। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'মাইন-কাম্পে' বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞানের স্রষ্টা আর্য্যজাতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার একচেটিয়া অধিকারও তাদেরই। মুসলমান এটাকে সত্য বলে মানতে রাজী নয়—ইতিহাসের শিক্ষাও এটাকে সত্য বলবে না। ইউরোপকে এবং খোদ জার্মান জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রথম দীক্ষা দিয়েছে অনার্য্য আরবরা—একথা হিটলার সাহেব জার্মান কবি দার্শনিক গেটের বই পড়লেই দেখতে পেতেন। তা যে হিটলার দেখেন নি, অথবা দেখে থাকলেও যে সেটা চেপে গিয়ে একটা অবৈজ্ঞানিক অনৈতিহাসিক মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, এ থেকেই তার মতলব বোঝা যাচ্ছে; এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ফ্যাসিজ্‌ম সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্টতম ও বর্বরতম রূপ।

ফ্যাসিজমের রাষ্ট্রীয় মতবাদ, কি আধ্যাত্মিক মতবাদ কোনটাই মুসলমান বরদাস্ত করতে পারে না। ইসলাম ও ফ্যাসিজ্‌ম এক জায়গায় থাকতে পারে না। মুসলমানের ধর্মমত, তার জীবনাদর্শ, তার সমাজব্যবস্থা, তার

শাসনতন্ত্র, কোনটার সঙ্গেই ফ্যাসিজমের আপোষ হতে পারে না। এটা মরক্কোর মুসলমান সম্পর্কেও যেমন সত্য, বাঙলার মুসলমান সম্পর্কে তেমনি সত্য।

তাই মুসলিম সাহিত্যশিল্পী যারা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দিয়েছেন, তারা বাঙলার মুসলিম জনমতের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কিন্তু এই কি যথেষ্ট? রাজনৈতিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করাই কি আমাদের কাজ? সভা করে প্রস্তাব পাশ করাই কি সম্মেলনের উদ্দেশ্য? তা নয়। রাজনৈতিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করা সাহিত্যিকের কাজ নয়; আধ্যাত্মিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করাই সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাজ। অর্থাৎ সচেতন, অচেতন ও অবচেতন গণআকাঙ্ক্ষাকে সজীব ও রূপায়িত করাই সাহিত্যিক ও শিল্পীর দায়িত্ব। আমরা আমাদের মাথার মগজ ও প্রাণের দরদ দিয়ে যদি অনুভব করি যে, সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক, আমাদের দেশবাসীর সকলের না হোক অধিকাংশের চিন্তা, মানস ও জীবনাদর্শ ফ্যাসিস্ট বিরোধী, তবে তাকে সাহিত্য ও আর্টে রূপায়িত করা শুধু আমাদের অবশ্য কর্তব্য নয়, পবিত্র দায়িত্বও বটে।

এই খানিক আগে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন: তোমরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী তো বুঝলাম, কিন্তু শো-হোয়াট? বন্ধুর ইশারাটা এই যে আমরা এই নেতিমূলক পথটা কেন গ্রহণ করলাম! একটা মতবাদের বিরোধিতা করাতেই কি আমাদের আদর্শ পরিসমাপ্ত? আমাদের কি নিজস্ব পজিটিভ কোনো মতবাদ নেই? বন্ধু আমাদের উপর সুবিচার করেন নি। আমাদের ফ্যাসিস্টবিরোধিতা কেবল একটি নেগেটিভ কর্মপন্থা নয়, অবাস্তব ভাববিলাসিতাও নয়। কচুরীপানা-ধ্বংসের আন্দোলন যদি ভাববিলাসিতা না হয়, তবে আমাদের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনও শুধু নেগেটিভ নয়। এর সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের যোগ আছে এই জন্য যে শুধু জার্মানী ও ইতালীতে একদল ফ্যাসিস্ট আছে বলেই আমরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী হইনি। আমরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী এইজন্য যে, আমাদের তথাকথিত গণতন্ত্রী ক্যাম্পে, আমাদের দেশে, আমাদের ঘরের কোণে বহু শক্তিশালী ফ্যাসিস্ট এজেন্ট রয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুর ছদ্মবেশে আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টির বন্ধুর পোষাকে অনেক ফ্যাসিস্ট আমাদের গণআন্দোলনকে সাবোটাজ করবার

আয়োজন করেছে। স্বস্তিকা শুধু হিটলারের নিশান নয়, আমাদের দেশেও স্বস্তিকা-বাহকের সংখ্যা কম নয়। হিটলারই শুধু গ্রেটার রাইখের প্রচারক ন'ন; আমাদের দেশেও অখণ্ড ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের প্রচুর প্রচারক রয়েছেন। জার্মান কুল্‌টুর দিয়ে সারা ইউরোপের গলা টিপে ধরবার চেষ্টা শুধু হিটলারই করছেন না, ভারতীয় কৃষ্টির চাপরে ফেলে বহু ভাষা ও বহু কৃষ্টির চল্লিশ কোটি মানুষকে একরূপী করবার আদর্শ ভারতবর্ষেও প্রচারিত হচ্ছে সমান জোরে। হিন্দু ফ্যাসিস্টরা সারা ভারতে হিন্দি চালাবার ও মুসলিম ফ্যাসিস্টরা সারা ভারতে উর্দ্দু চালাবার চেষ্টা করছেন সমান উৎসাহে। বৃটিশ ফ্যাসিস্টরা সভ্যতা, গণতন্ত্র ও নিরাপত্তার নামে অর্দ্ধবিশ্বব্যাপী তাদের সাম্রাজ্যের অখণ্ডত্ব প্রচার করে যাচ্ছেন; তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় ফ্যাসিস্টরাও ভারতের কৃষ্টি ও ভারতের নিরাপত্তার নাম বালুচিস্তান থেকে বর্মা পর্য্যন্ত চল্লিশ কোটি মানুষের আবাসভূমির অখণ্ডত্ব ঘোষণা করেছেন।

তাই বলছিলাম, তথাকথিত গণতন্ত্রী ক্যাম্পে এবং আমাদের ঘরের কোণে, সর্বত্র প্রভাবশালী ফ্যাসিস্টরা বিশ্বের ও ভারতের গণমুক্তির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যক্ষতঃ ভারতের এবং পরোক্ষতঃ দুনিয়ার ফ্যাসি-জমের উচ্ছেদ সাধনের সহায়ক হওয়ার মহৎ আদর্শ নিয়েই বাঙ্‌লার সাহিত্য সেবী ও শিল্প-সাধকরা এই সঙ্ঘ গঠন করেছেন। কাজেই এদের কর্মপন্থা একটা নিছক নেগেটিভ কর্মপন্থা নয়।

ইন্টেলেকচুয়াল পটভূমি তৈরী হওয়ার আগে কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থ-নৈতিক বিপ্লব ঘটতে পারে না। ইন্টেলেকচুয়াল পটভূমি তৈরীর দায়িত্ব সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। সুতরাং সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। বিশেষ করে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে বর্তমান যুগ একটা সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় পদক্ষেপের উপর ভারতের আগামী এক শতাব্দীর কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করছে। সেটা হবে স্বভাবতঃ একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের জাতীয় নেতারা যাতে নির্ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, সে বিপ্লবী পদক্ষেপ করবার মত সাহস ও সুবুদ্ধি যাতে নেতাদের মধ্যে জন্মায়, তার উপযুক্ত পটভূমি তৈরীর দায়িত্ব সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। কেবল সাহিত্যিক ও শিল্পীরাই সেই বলিষ্ঠ বিপ্লবী জনমত তৈরী করতে পারেন।

ভারতবাসীর মুক্তিলাভের সমস্যা, বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই ভারতের জাতীয় মুক্তির পথ আগলে বসে আছে। এর সমাধান সাহিত্যিক ও শিল্পীকেই দিতে হবে। এতদিনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতীয় ফ্যাসিস্টদের জন্যই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সমাধানের সে-সুযোগ বৃটিশ ফ্যাসিস্টরা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। ফ্যাসিস্টবিরোধীসাহিত্যিক ও শিল্পীদের পরম পবিত্র দায়িত্ব ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণমতকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলা। বিশাল ভারতের সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্যিকদেরকেই। শুধু এখানেই সাহিত্যিকদের দায়িত্ব শেষ হবে না। তথাকথিত হিন্দুস্থান যাতে হিন্দু সামন্তরাজ্যে পরিণত না হয়, আর তথাকথিত পাকিস্থান যাতে মোল্লারাজ্যে পর্য্যবসিত না হয় এবং সমাজতন্ত্রী হিন্দুস্থান ও সমাজতন্ত্রী পাকিস্থান যাতে গণমুক্তির সমবেত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়, তার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক পটভূমিও ফ্যাসিস্ট বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই আগে থেকে তৈরী করে রাখতে হবে। রুশ গণমুক্তি-আন্দোলনে রুশীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যে ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভারতের গণমুক্তি সংগ্রামেও ভারতের সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরকে সেই ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তাই, আপনাদের ভিতর থেকে হাজার হাজার গর্কি, টুর্গেনিভ, শেকভ, ডস্টয়ভস্কি, শোলোকোভ জন্মগ্রহণ করে চল্লিশ কোটি মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে সত্যিকারের ক্ষমতা দান করুক, বাঙলার তরুণদের প্রতি সেই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি।

[অরণি। ২৮।১। '৪৪]

ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে
গৃহীত প্রস্তাবাবলী

মূলপ্রস্তাব

গত এক বছরের বিপর্যয়ে বাঙলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে গভীর দুর্ভোগ আনিয়াছে। বাঙলার ফ্যাসিস্ট বিরোধ লেখক ও শিল্পীগণ এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য হাতিয়ার তৈরীর কাজে লাগিয়াছেন এবং জনসাধারণের হাতে এখানে সেখানে কিছু হাতিয়ার তুলিয়াও দিয়াছেন। যদিও এই সম্মেলন মনে করে যে এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আবেগ আছে, তবে আরও বেশী চেতনা থাকিলে এই নিষ্ঠা ও আবেগ সার্থক হইবে। কারণ জনসাধারণের মধ্যে যে হাতাশা বার বার ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহার প্রভাব লেখক ও শিল্পীদের মনেও পড়িয়াছে, এই সম্মেলন ইহাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, কারণ সম্মেলনের অভিমত এই যে, সঙ্কটের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মপ্রতয়ের বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে মহামারী এবং মহামারীর ক্ষতের মধ্যে মন্বন্তর জন্ম নিতেছে। বিপর্যয়ের প্রধান লক্ষণগুলির কোনোটা আগের মতই উদ্ধতভাবে মাথা তুলিয়া আছে, কোনোটা সাময়িকভাবে মাথা লুকাইতেছে, কোনোটা আরও বেশী শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। ভারতের পূর্ব সীমান্তে বিশ্ব-সামাজ্যবাদের শেষ ঠিকাদার ফ্যাসিস্টরা ক্ষতবিক্ষত বাঙলার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পথ করিবার জন্য নির্বিচারে বোমা ফেলিতেছে। স্বার্থান্ধ সামাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র সামাজ্য বজায় রাখার রঙীন স্বপ্নে ঢুলিতেছে, দেশের নেতাদের কারাগারে আটক রাখিয়া অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। এই অচল অবস্থার সুযোগে মুষ্টিমেয় লোভী ব্যবসাদার দেশবাসীর মৃতদেহের উপর লাভের কড়ি জমাইতেছে, আর ইহার সুযোগে দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াপন্থিরা বিভ্রান্ত চিন্তা ও নৈরাশ্য ছড়াইয়া দেশকে গভীরতর সঙ্কটে টানিয়া নিতে চেষ্টা করিতেছে। আর এই ঘোর দুর্দিনে আজও আমাদের দেশবাসী বিভক্ত, দেশের মধ্যে বিভিন্ন

জাতি উপজাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের ভিত্তিতে এখনও বিরাট ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে দেশের আস্থাভাজন নেতৃবৃন্দের হাতে দেশকে সমগ্রভাবে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা আসে নাই। দেশবাসী জীবন ও স্বাধীনতার জন্ম যে লড়াই চালাইয়া যাইতেছে তাহা এইসব কারণে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অনেক জায়গায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে; ফলে সাধারণ মানবতাবোধও আজ আজ সঙ্কটাপন্ন। এই সম্মেলন লক্ষ্য করিয়াছে যে, দেশের জনগণের মনে যে শিল্পীরা এই নিদারুণ লড়াইয়ের মধ্যে আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহারা একে একে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে; গ্রামের গায়ক, নট, পটুয়া ও কারুশিল্পীরা হয় গৃহত্যাগী, নয় মৃত্যু পথে। অতএব বাংলা দেশের সমগ্র শিল্পী ও সাহিত্যকদের এখন সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। লেখক ও শিল্পীরা আজ সম্পূর্ণ সচেতন হউন; সমস্ত অসঙ্গতি দূর করুন, নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য গড়িয়া দেশকে নবজীবনের, মানবতার, স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথে লইয়া চলুন। লেখক ও শিল্পীদের এই প্রতিরোধ ও অগ্রগমন দেশবাসীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি হইবে; বাঙ্‌লার শিল্পধারা অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং নতুন প্রাণে ঝংকৃত হইবে; দেশবাসী নবজীবন লাভ করিবে; লেখক ও শিল্পীদের শিল্পও সার্থক হইবে।

উত্থাপক—হীরেন মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—হিরণকুমার সান্যাল।

সাংগঠনিক প্রস্তাব

আমরা মনে করি যে, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শুধু কতগুলি গুরুগম্ভীর প্রস্তাব পাশ করিলেই চলিবে না। এ গুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার জন্য চাই আমাদের সংগঠন। আজ পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, শক্তিশালী লেখক ও শিল্পীগণ উজ্জ্বল আদর্শের দৃষ্টিপ্রদীপ সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সঙ্ঘ সফলতার পথে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিভিন্ন জেলার সহিত সঙ্ঘের ভালরকম যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। ইহার মূলে আছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। সেই জন্য সঙ্ঘকে সজীব ও প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তাব করা যাইতেছে :—

১। একটি ভ্রাম্যমান 'কালচারাল স্কোয়াড' থাকিবে এবং সেই স্কোয়াড মধ্যে মধ্যে জেলাগুলিতে যাইয়া স্কোয়াডগুলিকে নির্দেশ দিবে।

২। জনসঙ্গীত এবং অন্যান্য গণসংস্কৃতিমূলক লেখাগুলিকে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। জেলা সঙ্ঘকে দুষ্প্রাপ্য বই ধার দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার গঠন করিতে হইবে। সেই পাঠাগার শাখাসমূহ হইতে উপযুক্ত জমা রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই ধার দিবে।

৪। বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীবৃন্দকে সংস্কৃতির গতি এবং ধারার সহিত ওয়াকেবহাল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও শিল্পীদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় 'কালচারাল ব্যুরো' গঠিত হইবে :—

(১) গোপাল হালদার (২) হীরেন মুখোপাধ্যায় (৩) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (৪) বিষ্ণু দে (৫) সুনীল বসু (৬) বিনয় রায় (৭) মণি রায় (৮) নীরেন রায়, (৯) চিন্মোহন সেহানবীশ (আহ্বায়ক)।

৫। বর্তমান অবস্থার সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে একটি সাময়িক পত্রিকা বা P. E. N, যেমন বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন ঐরূপ বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত প্রগতিশীল রচনার সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি অনুবাদ-বিভাগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উত্থাপক—রণেন দাশগুপ্ত : সমর্থক—সুশান্ত পাঠক

অন্যান্য প্রস্তাব

ক) মানুষের হাতে জ্ঞান বিজ্ঞান আজ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের অনেক উপাদান তুলিয়া দিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে চলচ্চিত্র, বেতারবার্তা ও রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি এমনি মানুষের কয়েকটি প্রকাশ পথ। দুঃখের বিষয়, প্রায়-ক্ষেত্রেই নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা এগুলি পরিচালিত বা প্রভাবান্বিত হয়, জনগণের স্বাভাবিক শক্তি ও জাগরণকে তাহা উজ্জীবিত করে না।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, দেশের মুক্তি সংগ্রামে ও মানবশক্তির জাগরণে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের মতো এই সবক্ষেত্রেও সহায়তা করিবে। এজন্য এই সম্মেলন চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, বেতার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অধিকারীদের অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা দেশ ও মানব সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে যত্নবান হউন। এই সমস্ত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের নিকটও এই সম্মেলনের নিবেদন এই যে, তাঁহারা আপনাদের অমর ঐতিহ্য ও মানবীয়তাকে এই সব নব নব শিল্পক্ষেত্রেও সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নিজেদের প্রেরণা ও শক্তিকে সার্থক করিয়া তুলুন।

উত্থাপক—নীহার সরকার

সমর্থক—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(খ) এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী অজিত ঘোষ, প্রখ্যাত নট দুর্গাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবি মানকুমারী বসু, সুকবি অজয় ভট্টাচার্য ও খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পালের মৃত্যুতে এই সম্মেলন গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

উত্থাপক—দ্বিতীয় মূল অধিবেশনের সভাপতি

আবদুল মনসুর আহমদ।

[অরণি ৪।২। '৪৪]

পরিশিষ্ট—৬

সোমেন ও সমকালীন সাহিত্য চিন্তা

[শ্রীমতী লীলা রায় চল্লিশের দশকে এ প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য]

Sarat Chandra Chatterjee died in 1938 and Rabindranath Tagore in 1941. These two great figures, Sarat Chandra in an intimate, personal way and Rabindranath with the wide sweep of his universal spirit, so dominated the life of Bengal that their passing was the passing of an age.

War came uninvited in 1939 and the stage was set for further change. Headed by Achintya Kumar Sen Gupta and Premendra Mitra, the Kallol group of writers which had revolted against the influence of Tagore with much youthful exuberance in the early thirties reached maturity. It was upon them and other writers of their age that the responsibility of answering the challenge of the time devolved. Older and younger writers also reacted, each in his own way, for there was excitement and exhilaration in it as well as pain, A senior novelist, Tarasankar Bandyopadhyay, in his presidential address at the Prabasi Banga Sahitya Sammilan at Cawnpore in 1945, sounded a note of hope and warning. "This tremendous war," he said "transforms life into great living···When the times in which we live merge into a new age the face of the world changes with them. The aspect of human life that is revealed during such changes furnishe sustenance for men of subsequent ages···There in need, in

this new perception, of great poetry in literature today. If we have not this awareness, if we lose en masse our clear vision and our sense, our literary efforts may encounter two obstacles. Firstly, in our anxiety to save ourselves we may cling to the old for simple self-preservation ; secondly, in pursuing the new way we may grow confused and agitated, go mad and forego association. Mistaking our objective we may become self-centred and plough a lonely furrow." There is nothing here of the paralysis of will or the ineffectualness that afflicted writers of the same period in England.

The Leftist writing of the thirties, the Anti-Fascist movement and the war-time alliance with Russia did, however, was turned to Leftist writing in general and Russian literature in particular. More classics have been translated from Russian than from any other literature, including English. And the revolutionary ferment in India has given Gorky and other Soviet writers a large body of readers. The Anti-Fascist Writers and Artist's Association, with which many well-known names were associated, was very active throughout the war years. Auden and Spender have left their mark on Bengali poetry just as T. S. Eliot has. It is curious that Eliot, the eminent reactionary, has influenced most Bishnu Dey, the chief of Bengali Leftist poets. The Leftist movement deeply affected the work of writers not directly associated with it also and brought into Bengali literature many milieus hitherto untouched by the pen. The late Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay, presiding over the Modern Bengali Literature Section of the Prabasi Banga Sahitya Sammilan in 1945, spoke appreciatively of it. He said : "For the writer or artist who dwells in man, country and

race cannot be delimited. The best sign in modern Bengali literature is that today it has come out under the broad sky of a greater freedom......I know that among those who advance to do the spade work on this new road many will be stranded on the edge of the desert and die......Yet it is in the sweat of their brows that the dust will be watered and the clear line of a thoroughfare emerge."

In giving literary expression to the Famine of 1943 the Leftists were the most forward. It's first visible effect was a spate of short stories, raw with shock, horror and bewilderment. These have documentary and topical value. Some of the best were collected by Parimal Goswami under the title, Manwantar. Several highly successful plays, notably Nabanna (The Harvest Festival), were produced. With the slackening of the first violent impetus the stream of feeling gained depth and novels appeared, the most memorable being Manwantar by Tarasankar Bandoyopadhyay.

Another effect of the Famine, the full consequences of which have still to be realised, is the apparently total to extinction of the class of wandering minstrels, denominational and secular, who lived upon the alms their singing brought them. With them has been lost a rich treasure of folk song and poetry.

The last and hardest phase of India's struggle for Independence began in 1942. It has little place in the literature of the time. Lamentable as it is, it is nevertheleas a fact that no adequate literary record of the Nationalist struggle exists. The reason is not far to seek ;it is to be found in the harsh lay of arbitrary arrest and indefinite detention without trial. Writers, from Bankim Chandra Chatterjee down,

have been deeply inspired by the struggle for freedom, but they have been compelled to give that inspiration indirect expression, dressing it in historical garb as he did or avoiding explicit reference to it. Bengali writers have become experts in the art of suggestion and oblique reference. Sarat Chandra Chatterjee's 'Pather Dabi' mildas it is, was a proscribed book for many years. Rabindranath Tagore much admitted the young men who were fighting for their country's liberty and in a conversation with Annada Sankar Ray once expressed the deep frustration he felt at not being able to speak out for them or portray them truthfully. He did what it was possible for him to do in Char Adhyay. The first novel to express the spirit of the struggle with full freedom, Jagari, by Satinath Bhaduri, had to wait until Independence was imminent before it could be published. The action takes place in 1942, Much rich and exciting material has now become available to writers on this subject,

A Congress Sahitya Sangha was formed in 1945 on the eve of freedom, Its founder-secretary, Sachindra Nath Mitra, was the first of the four satyagrahis who gave their lives to restore peace to Calcutta in the recrudescence of communal rioting at the end of August 1946, For with Independence came a new menace, Hindu and Muslim enmity. The more prominent writers set their faces against communalism from the first and did all they could, publicly and privately, to stop it. Meetings with mixed programmes were held and peace processions taken out during the Id and Puja celebrations. "The litterateur's and journalist's responsibility in saving the country from the sin of fratricide," wrote four prominent writers in a statement to the press in 1947, "Is not

less than anybody else's. With shame and sorrow we observe how some newspapers and periodicals are playing the murderous physician ·····We condemn this suicidal policy in one voice and......we have made up our minds to have nothing to do with these journals and newspapers... '

The prevailing spirit of chauvinistic patriotism inevitably affected the intellectual life of the two new states and Partition divided the loyalties of many writers. A few weeks of civil strife did what six years of global war could not. Hindus and Muslims were closely interwoven in the fabric of the country's cultural and economic life. The violent tearing apart of the threads resulted in an almost complete cessation of normal activity. Writers in East Bengal are having to fight even for their language, the language of the people, which is being neglected in favour of Urdu, the official substitute for it.

As the economic consequences of Partition made themselves felt economic distress, already rendered acute by the war, sharpened. The big publishing houses are situated in Calcutta and the suspension of trade deprived them of three-fourths of their market. The best book-binders and press machine-men are Muslims, the book-sellers and publishers, Hindus,. For doys and nights together memders of the Publishers' Association kept vigil over the homes of the binders to prevent them from being attacked. Many binders fled to Pakistan for a time and business was at a standstill. Riots and refugees made their appearance in the stories published currently in the press.

Periodicals which had weathered the alarums and shortages of the war (the paper shortage was most serious) capitulated

and went out of print. Others sustained heavy losses. Buddhadeva Bose has kept his little magazine of verse 'Kavita' going with great difficulty, A number of writers have capitulated too, turning to more lucrative employment or taking spiritual refuge as Tarasankar Bandyopadhyay warned them they might do, in the old, the traditional, the orthodox. Kazi Nazrul Islam, the fiery poet and rebel, lost his mind early in the war. The more radical of the young Leftist writers have been or are in prison, arrested as arbitrarily as the Nationalists of the last generation. Two have died. Somen Chanda, a writer of undoubted genius, was brutally assassinated on the streets of Dacca while leading a procession of railway workers in 1942. Sukanta Bhattacharya, a poet of much originality and promise died of t.b. at the age of twenty in 1947, Other writers have retired to ivory towers, turning their faces away from problems that have become too much for them, These find themselves in the intellectual climate of post-war England, confronted with a spiritual abyss, isolated, neurotic, suffering. Buddhadeva Bose speaks for them in an article written for Nine in 1950. He says : "Yet the main trouble is not that the writer cannot earn enough through his vocation—for that has always been the case—but that the vocation itself is lost... He no longer knows—which he did know before the war—whom it is he is writing for ; there is no longer that subtle, silent communication between writer and reader which is so necessary for his continuation as an artist...those troubled by the inescapable urge to utter the authentic word...are carrying on a kind of secret, triumphant toil, without anything to look forward to but a period of progressive deterio-

ration and without anything to fortify themselves with except the bitter patience that comes from the faith that civilisation cannot perish."

The pressure, economic, moral and spiritual, to which Bengali writers have been subjected during these ten turbulent years has been great. Fantastically sensitive, they have been tested again and again as crisis has yielded to crisis. Their personalities have been stripped by the searching light of the challenge flung at them and they have stood silhouetted against a background of devastation. Some have discovered themselves in a way not possible in normal times. Others, unable to face the personal denouement, have succumbed, escaping into comforting shadow. Bengali literature has been largely purged of a certain supercilious cynicism and a rather facetious sophistication which in the past have not infrequently been mistaken for talent. It has gained in depth, seriousness, passion and intensity. How many writers and which writers are able to resolve in their art the agony they have experienced remains for the future to reveal. It is enough now that standards have not been lowered and that their achievement compares favourably with the achievement of other, happier, decades. This is very creditable. The short story has undergone a remarkable development in the hands of many competent writers and is now a major art form. Tarasankar Bandyopadhyay has written his best books, blending the regional wi h the sociological novel. Achintya Kumar Sen Gupta has systematically explored the life of various classes of people. Buddhadeva Bose has concentrated his attention on style, experimenting with numerous forms both in prose and

poetry. Abanindranath Tagore, the famous painter and story-teller, has dictated his delightful memoirs to Rani Chanda. The first long epic-novel in Bengali; comparable with the work of Proust and Jules Romains, has been successfully completed by Annanda Sankar Ray. He has also developed the personal essay, shaping it into a tense, subtle and elastic medium for thought. And he has created a new category of light satirical verse. Kazi Abdul Wadud has emerged as a powerful and noble thinker. Bali Chand Mukhopadhyay has sought to break down barriers of the mind in order to penetrate deeper into into it. Dr. Syed Mujtaba Ali has written a witty and hilarious account of his sojourn in the Afghanistan of Amanullah in 'Deshe Bideshe' Dilip Kumar Roy has poured a steady stream of devotional poems, songs and novels from Pondicherry. And the work of editing and Publishing the finished writings of Rabindranath Tagore has gone forward.

The varied misfourtunes of the forties have, however, considerably hampered the development of new telent. No group of iconoclastic young men has emerged comparable in energy to the 'Sabuj Patra', the 'Kallol' or the 'Parichaya' groups of the twenties and thirties. This does not augur well for the future and is causing much concern.

[শ্রীমতী লীলা রায়ের 'A challenging Decade ; Bengali literature in the forties'নামক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে]।